বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৫১/০

পূর্ণিমা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

নবম বর্ষ।

বাঁশবেড়িয়া,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দে দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পত্রাঙ্ক।
অতৃপ্তি (পদ্য)	...	২৭১
অবৈধ বিবাহ	...	৮০।১২৪
আকাঙ্ক্ষা (পদ্য)	...	৪১৫
আত্ম সমর্পণ (পদ্য)	...	১৪৪
একখানি পত্র	...	২৮৫
একবার তুমি গাওনা (পদ্য)	...	১০৩
এস আসি	...	১৯৬
কবি আলাওলের নূতন গ্রন্থ	...	১৯৮
গ্রন্থ সমালোচনা	...	৩৮৮।৪২৫
চাঁদের কথা	...	৩৪৬
জীবে প্রেম	...	২৬৭
দুই জন কর্ত্তা (গল্প)	...	১৫৪
নব বর্ষে	...	১
নিত্য মহাপূজা (পদ্য)	...	২১৮
নিয়তি	...	২৯১
পরীক্ষিতের সন্দেহ	...	৪২১
পাপের পরিণাম (গল্প)	...	২৫৯
পুস্তক সমালোচন	...	১৬৮
প্রণব উপাসনা		৪১।৭৭।১২১।২৭৯
প্রতীক্ষা (পদ্য)	...	১৮৯
প্রাচীন সাধন সঙ্গীত	...	৪০৯
প্রেমদাসের পদাবলী (পদ্য)	...	১৪
প্যারীমোহন কবিরত্ন	...	৬৭।৩৭৩
ফোক্‌লাদিগম্বর	...	৮৯
ভালবাসা (পদ্য)	...	২৫৭
মশারি	...	৩৪
মা	...	২৩৬
মা (পদ্য)	...	৩৭৬
মানবের সংহারমূর্ত্তি	...	২৮১
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা		৪৬।৮৪।১২৬।১৬৪।২০৩।২৪১।৩০৪।৩৫১।৪২৮
মুখ	...	১০৫
মৃত্যুর পর		২৭।৬০।৯৮।১৪৫।১৯০।২২৮।২৪৯।২৯৮।৩১৩।৩৫৩।৪১৭
যৌনসারী	...	১৬৯।২২১
বশিষ্ঠগঙ্গা ও দরাফ খাঁ	...	৪০১
বঙ্গসাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর	...	৩৬৭
বিজ্ঞানের উপন্যাস	...	১৮৬
বেণীতীর্থে	...	২০৭
সন্ধ্যাগমে শোন নদীর প্রতি (পদ্য)	...	৫২২
সাহিত্য সংবাদ	...	৪৪
সাহিত্য সম্বাদ	...	৩২৪
সোণা বাহিরে	...	১২৯
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত		৬।৮৯।১৩২।২৭৩।২৮৬
হিংসার পরিণাম (গল্প)	...	৩৩২
হিন্দুবৈরাগ্যের ইতিহাস	...	১৭৬
হুগলী কাহিনী	...	১৫।৪৯।১২৬

নবম বর্ষের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার
" আনন্দময় দেববর্ম্মা
" আবদুল করিম
৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" উমেশচন্দ্র মৈত্রেয়
" কামাখ্যামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
" কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,
" নিবারণচন্দ্র মজুমদার
" পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল,
" প্রেমদাস বৈরাগী
" বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
" মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ,
" মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়
" রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,
" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল,
" হরিহর শেঠ
" ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, এম, আর, এ, এস।

বৈশাখ, ১ম সংখ্যা।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

নবম বর্ষ।
সন ১৩০৮ সাল।

নব বর্ষে।

জয় গুরু শ্রীগুরু পাদপদ্ম ভরসা। দয়াময় তোমার কৃপায় আজি ১৩০৮ সালের ১লা বৈশাখ দেখিলাম। ভাল কি মন্দ জানি না; হৃদয়ে একটু আনন্দ আসিতেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও কুচিন্তা। "দেব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হৌক" এই কথা বলিবার শক্তি দিন।

আধ ঘুম অবস্থায় শয্যায় থাকিয়াই অতি প্রত্যুষে শুনিলাম একজন ভদ্রলোক বলিতেছেন "শিগ্‌গির গাড়ী জোত—সময় গেল—ট্রেণ পাব না"। অন্নপূর্ণার নাম করিয়াই ভাবিলাম, হায় যদি সকল লোকে এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিত—সময় গেল, শিগ্‌গির, নহিলে ভগবান পাব না;—তাহা হইলে দুনিয়াটা আর এক রকমের হইত। কে যেন কর্ণে বলিল, খোদার উপর খোদকারীতে কাজ নাই। দুনিয়াটা যে এমন, এটাই বা কাহার ইচ্ছায়?

গঙ্গা দর্শন করিয়া ফিরিতেছি এমন সময় সাধু বন্ধু বলিলেন 'ভাই সূর্য্যোদয় দেখিয়া বড় ভয় হইয়াছে, এমন ফ্যাকাশে সূর্য্য আর কখনও দেখি নাই, ১৩০৮ সাল বড় দুর্বৎসর হইবে।' এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ

দিল 'বাড়ীতে অমুকের উপর মায়ের কৃপা হইয়াছে'। বৎসরের প্রথম সংবাদ এই শুনিলাম। শুধু কি আমারই ?

বসন্ত ওলাউঠা জরজ্বালা বছরের পর বছর সমানভাবে চলিয়াছে। বিরাম নাই বিশ্রাম নাই। দুর্ভিক্ষের নিবৃত্তি কই? প্লেগ যে কলিকাতায় স্থায়ীভাব ধারণ করিল। প্রতিদিন কলিকাতা মহানগরীতে যে শতাধিক লোক এক প্লেগে যমপুরী দর্শন করিতেছে? অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ইহারা যে সকলেই মৌরশ পাট্টা লইল। করি কি? উপায় কি?

আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে গুরু কৃপায় এইটুকু আসিতেছে যে ইহাও জগদম্বার ইচ্ছা। মাতা দুষ্ট ছেলের কর্ণপীড়ন করেন, গণ্ডে চপেটাঘাত দেন, তাহার চৈতন্য হইবে বলিয়া। বুঝিলাম যতদিন আমাদের চৈতন্য না হইবে ততদিন এই দুর্ভিক্ষ-সঙ্গ, এই প্লেগরঙ্গ চলিবে। কলিকাতায় যখন প্রথম প্লেগের বড় হুজুগ তখন কলিকাতা ছাড়িয়া ধনী দীন সবল দুর্বল আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রদেশে ছুটিয়াছিল। কাহারও কথা শুনে নাই, রাজার আশ্বাস-বাক্য শুনে নাই। কলিকাতায় কাজ বন্দ হইয়াছিল। কিন্তু আজ তদপেক্ষা প্রচণ্ড রবে প্লেগ গর্জ্জাইতেছেন কিন্তু কই কেহ ত ভয় খাইতেছে না, নিত কর্ম্মের মত করিয়া লইয়াছে। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া লোকে ভগবানের স্মরণ লইয়াছিল হা হরি যো হরি বলিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিল, উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনিতে চরাচর কম্পিত করিয়াছিল। ভগবানেরও আসন টলিয়াছিল—প্লেগও প্রশমিত হইয়াছিল। তারপর লোকে ভগবান ভুলিল প্লেগও অমনি দেখা দিল বলিল "আমি তোমাদের ভুলি নাই। তোমারও অভ্যাস আমারও অভ্যাস।" চক্ষের উপর যে শিক্ষা হইল তাহার ফল যদি গ্রহণ না কর তবে দুর্ভাগ্য মানব তোমাকে এইরূপেই ভুগিতে হইবে। ধিক্ তোমার হিতাহিত বিবেচনা শক্তিকে! এখন বলুন দেখি, বলিতে হয় কি না, দুর্দ্দৈব আরও বাড়ুক। চরমত্বে না পঁহুছিলে যদি প্রত্যাবর্ত্তন না ঘটে তবে ১৩০৮ সালে দৈব দুর্ব্বিপাক অতি বৃদ্ধি হইলে ধন্য হইব।

এই ত গেল লোকের মনের অবস্থা। ইহাতে সাহিত্যের কতদূর স্ফূর্ত্তি হইতে পারে এবং কিরূপ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে তাহার বিচার করিয়াছেন কি? অমঙ্গল হইতে মঙ্গল আসিতে পারে কি? মঙ্গলময় কি তাই করেন?

আপনারা বিচার করুন আর নাই করুন রাজা কিন্তু লিঙ্কন্-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইংলিসম্যান কাগজে অনেক রাজপুরুষ রীতিমত লিখিয়া থাকেন। এই ইংলিসম্যান সরকারী রিপোর্ট দেখিয়া বঙ্গসাহিত্যের 'সমালোচন করিয়াছেন'। ভাবে বলিতেছেন বঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিফল হইল, কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখকগণ সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, সাহিত্যে আর কিছুই নাই কেবল ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম, সেই পুরাতন হিন্দু ফিলজফি আর সেই পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম, সেই পুরাতন কাসুন্দী। এতটা ইংরেজী যে আমরা পড়াইলাম, এতটা অর্থব্যয় যে আমরা করিলাম এত স্কুল কালেজ করিলাম, এত বাইবেল পড়াইলাম সব ভস্মে ঘৃত হইল, হায় হায়!

গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়।

হেয়ারষ্ট্রীট হইতে এই সকরুণ কাতর বিলাপধ্বনি উঠিয়াছে। মনুমেণ্ট হাড়াইয়া ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কোন্ দিন বঙ্গোপসাগরের ঝঞ্ঝাবাত সবেগে উড়াইয়া বিলাতের আকাশে লইয়া যাইবে। তখন বিলাতের লোকের চমক ভাঙ্গিবে তখন তাহারা ক্লব করিয়া বিচার বিবেচনা আলোচনা গবেষণা নিয়মযোজনা করিতে বসিবেন। জানি না তখন ভারতের ভাগ্যে বিধাতা আবার কি লিখিবেন।

রাজার যখন টনক নড়িয়াছে তখন ব্যাপারটা গুরুতরই হইয়াছে। জানি না পাঠক মহাশয় কি মনে করিতেছেন। আমাদের কিন্তু থল থল হাস্য আসিতেছে, দারুণ অঙ্গভঙ্গী আসিতেছে তাণ্ডব নৃত্য আসিতেছে। মনে হইতেছে মহাপুরুষগণ, আর নিশ্চিন্ত নাই, মনে হইতেছে জগদম্বার সকরুণ কটাক্ষপাত হইয়াছে, পতিত ভারতের যেন গতি-পথ দৃষ্ট হইতেছে, নিরাশা অমানিশার কুচিন্তা কালকাদম্বিনীমণ্ডিতা তমিশ্রাময়ী ঘোরা নিশিথিনী রজনীর সূচীভেদ্য প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভাইরে কোমর বাঁধ।

আমরা ১৩০৫ সালের বৈশাখের আত্মকথায় বলিয়াছিলাম "শাস্ত্র বলিয়াছেন মনুষ্য মধ্যে যাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে এমন বিষয়েই লেখনী সঞ্চালন করিবে, নতুবা কিছু লিখিবে না। দেখিতে পাওয়া যায় বড় বড় সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মব্যতীত অপর কোন বিষয়ে কিছু লেখেন নাই। এ কথা বুঝা যায় বটে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় লেখাই থাকিবে অপর কিছু থাকিবে না।

একারণেই কি বা একারণ অভাবেই বা কি বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে? কথাটা উঠাতে চক্ষের উপর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" দেখিতে পাইতেছি। রোগ জানিলে ঔষধ দেওয়া যায়। পাঠক মহাশয় তবে মিলাইয়া লইবেন। কিন্তু পূর্ণিমা জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা আর তাঁর জানিতে বাকি নাই। মনুষ্যের জীবনের সার বস্তু যদি ধর্ম্ম হয় মনুষ্যের মনুষ্যত্বই যদি ধর্ম্ম হয় তবে মনুষ্য পরিচালিত মাসিক পত্রের ধর্ম্মজীবন কেন না হইবে? ধর্ম্মবিহীন মনুষ্যের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ধর্ম্মবিহীন সাহিত্যের বা সাময়িক পত্রেরও অকাল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—ইহাই সার বাক্য।"

"আকলমন্দকি ইসারা হায়।"—

জানিয়াও কথাটা লিখিয়াছিলাম কিন্তু ভয়ে ভয়ে। তখন কে জানিত কথাটার পোষকতা বা প্রচার কি প্রকারে হইবে? হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল তাই লিখিয়াছিলাম। লীলাময়ের লীলাতরঙ্গের গতি কে বুঝিবে? দেখিতেছেন ব্যাপারটা কোথা হইতে কি প্রকারে কোথা দাঁড়াইয়াছে? বিশ্বাস স্থির থাকিলে অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই। কবে ভারতের সকল ভাষায় ধর্ম্মের বান আসিবে?

নূতন বৎসরের গুরুতর কার্য্যভার পুনরায় মস্তকে লইবার অগ্রে আসুন সকলে মিলিয়া জগদম্বার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করি ও শক্তি কণিকা ভিক্ষা করি।

গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধুনদী,
তথাপি যন্ত্রযোগে সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা, রসনার উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান পরে॥

হৃদয়ে বল স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার জন্য মনে করুন,

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ।

আবার,

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখণি রত্নের নিধান।
শক্তিকণিকা দিবার জন্য আছেন ভারতমহিলা।
রূপবতী সাধ্বীসতী ভারতললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারতললনা।

পুরাতনের সঙ্গে নূতন নাম যোজনা করুন, ভগিনী দুহিতা মাতা আর সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্ম কঠিন বা কার্য্য কঠিন বলিয়া ভয় পাইও না। ধর্ম্মপত্নী স্ত্রী সাহায্য করিলে বল পাইবে, স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী—তাহাকে সঙ্গে লইয়া যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়। বিঘ্নের ভয় নাই রাজা রক্ষা করিবেন।

তবে আসুন সকলে তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একবার প্রাণ ভরিয়া গাহি—

কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয়।

TORN PAGES.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে।

(উনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র, ভবনাথ ও মাষ্টারের মিলন।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা করেন। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এপর্য্যন্ত কাহাকেও কখন দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্রিদিন ভাবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা তিন চারিটার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভার একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটী ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবককে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটীর নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ, চক্ষু দুইটী সাতিশয় উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটী বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্টলোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র! তুই কি বলিস্? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দেখ, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

মাহুত নারায়ণ।

নরেন্দ্র। আমি মনে করব কুকুর ফেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) নারে, অতদূর নয়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দলোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকিতে হয়। বাঘের ভিতরও নারায়ণ আছেন; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। বাঘনারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করিবে।

"একটা গল্প শুন। কোন এক বনে একটী সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটী শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনের মধ্যে গিছিলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো 'কে কোথায় আছ পালাও, একটা পাগলা হাতী যাচ্চে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটী পালাল না। সে জানে যে, হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল; আর নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগলো। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বল্‌চে, 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটী তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একবারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ পরে চেতন হলে ওকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কেন হাতী আস্‌ছে শুনেও চলে গেলে না? সে বল্লে, গুরুদেব যে আমায় বলে দি'ছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হয়েছে। তাই আমি হাতীনারায়ণ আস্‌ছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লেন যে, হাতীনারায়ণ আস্‌ছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুতনারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করিলে না কেন? মাহুত-নারায়ণের কথা শুনিতে হয়।

"শাস্ত্রে আছে আপোনারয়ণঃ—জল নারায়ণ, কিন্তু কোন জল ঠাকুর-সেবায় চলে, আবার কোন জলে আঁচান, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন; কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্টলোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কাহারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কাহারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐ লোকদের কাছথেকে তফাতে থাকিতে হয়।"

একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি দুষ্টলোক অনিষ্ট কর্‌তে আসে বা অনিষ্ট করে, তা'হলে কি চুপ করে থাকা উচিত?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থ ও তমোগুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস কর্‌তে গেলেই দুষ্টলোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট কর্‌বে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"এক মাঠে রাখালেরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। এক দিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আস্‌ছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়! ওদিক দিয়ে যাবেন না। ওদিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বল্লেন, বাবা তা হউক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এদিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আস্‌ছে। কিন্তু কাছে না আসতে আস্‌তে ব্রহ্মচারী যেই একটী মন্ত্র পড়লেন অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা করে বেরাস, আর তোকে মন্ত্র দিব, এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাক্‌বে না। এই বলে সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম কর্‌লে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন। গুরু বল্লেন, এই মন্ত্র জপ করো, আর কাহারও হিংসা করো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্লেন, আমি আবার আস্‌বো।

"এই রকমে কিছু দিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর ড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন া গেছে। একদিন একজন রাখাল তার কাছে গিয়ে লেজ ধরে খুব পাক দিয়ে সাপটাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে উঠিতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। ালেরা মনে কর্‌লে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি ক্ত তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ হয়ে গি'ছিল। নড়বার ক্তি নাই। অনেক দিনের পর যখন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, তখন বাহিরে হারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চর্‌তে আস্‌তো। রাখালদের য় দিনেরবেলা আসিত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর জীবহিংসা করে না। ী, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে, এমন ফল খেয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তো।

প্রায় এক বৎসরের পর ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলেন। এসেই পের সন্ধান কর্‌লেন। রাখালেরা বল্লে, সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর ও কথা বিশ্বাস হলো না। তিনি জানেন, ও যে মন্ত্র নিয়েছে, তাহা ধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তাঁর দেওয়া ম ধরে ডাক্‌তে লাগলেন। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে য়ে এলো ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম কর্‌লে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা লেন, তুই কেমন আছিস? সে বল্লে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী ন, তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন? সাপ বল্লে, ঠাকুর! আপনি দেশ করেছেন কাহারও হিংসা করো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই লে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি। ওর সত্ত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু পর ক্রোধ নাই, সে একেবারেই ভুলে গিছিলো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফলবার জোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, শুধু না খাওয়ার দরুণ এরূপ বস্থা হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দেখ্। সাপ-ার তখন মনে পড়্‌লো যে রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিলো। তখন সে বল্লে, ঠাকুর! এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিলো। তা তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না যে আমার

TORN PAGES.

মনের কি অবস্থা। আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অ
করবো না, তা তারা কেমন করে জান্‌বে? ব্রহ্মচারী বল্লেন, ছি! ত
এত বোকা, তুই আপনাকে রক্ষা কর্‌তে জানিস না; আমি তোকে ক
তাড়াইতেই বারণ করেছি, তোকে ত ফোঁস করতে বারণ করি নাই;
ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?

"তাই বল্‌ছি, দুষ্টলোকের কাছে ফোঁস কর্‌তে হয়, তাদের ভয় দেখা
হয়, পাছে অনিষ্ট করে; কিন্তু তাদের গায়ে বিষ ঢালিতে নাই, তাদের উ
অনিষ্ট কর্‌তে নাই।

লোক ভিন্ন প্রকৃতি।

"ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ, পালা, এই সব আছে
জানোয়ারের মধ্যে ভালও আছে; মন্দও আছে। বাঘের মতন হি
জানোয়ারও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন গা
আছে, আবার বিষ ফল হয় এমন গাছও আছে। তেমনি মনুষ্যের ম
ভালও আছে, মন্দও আছে, সাধুও আছে, আবার অসাধুও আছে, সংসা
জীবও আছে, আবার ভক্তও আছে।

Are all men equal?

"জীব চারি প্রকার,—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজী
যেমন নারদাদি। এঁরা সংসারে থাকেন, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগ
শিক্ষা দিবার জন্য।

"বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থা
ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

"মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কে
মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না।

"মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ নন, যেমন স
মহাত্মারা; যাঁদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যাঁরা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চি
করেন।

"যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা
কখনও জালে পড়ে না, এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই

পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষু
র উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাঙ্‌
ঙ্‌ করে জাল থেকে পালিয়ে যায়, তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত
পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতে পারে
আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের
র ভিতর গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, "আর
ভয় নাই, আর আমরা বেশ আছি।" কিন্তু জানে না যে জেলে হড়্‌
করে টেনে আড়ায় তুল্‌বে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(সংসারী লোক।)

"বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত পা বাঁধা
র মনে করে যে ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর
য়ে থাকবে; কিন্তু জানে না যে এতেই মৃত্যু হবে।' বদ্ধজীব যখন মরে,
তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে?' আবার
মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জ্বল্‌লে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে,
কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয়
লতাবোল ফাল্‌তো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে
আমি চুপ করে থাক্‌তে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময়
না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ করিল।"

একজন ভক্ত। মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ কর্‌তে হয়,
মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে হয়। আর বিচার
হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌তে হয় 'আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও'।

বিশ্বাসের বল।

"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই।
দারের প্রতি) "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে

রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ
কিন্তু হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়
তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।

"বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটী একটি লো
কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দি'ছিলো। সে লোকটী সমুদ্রের পারে য
বিভিষণ তাকে বলেন, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের
দিয়া চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস কর্‌বে, অমনি ডুবে য
লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়া চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার
ইচ্ছা হ'ল, যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দ্যাখে।
দেখে যে কেবল রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি
রামনাম একটি লেখা রয়েছে। যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে গো, ব্রাহ্ম
হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে সে সব ভারি ভারি
থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ ক
না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

মহাপাতক ও নামের মাহাত্ম্য।

"এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন,

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দিনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(নরেন্দ্র।)

নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের সম্বোধন করে ঠাকুর রা
বল্লেন—"এই ছেলেটীকে দেখছ, এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে ব
কাছে যখন বসে যেন জুজুটী; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন আর
মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না।
বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সং

আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না, এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়্‌লেই ডিমটা পড়্‌তে থাকে কিন্তু এত উচ্চ যে অনেকদিন থেকে ডিম পড়্‌তে থাকে। ডিম পড়্‌তে পড়্‌তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়্‌তে থাকে। পড়্‌তে পড়্‌তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে সে পড়ে যাচ্চে, আর মাটীতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। সভা মধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) দ্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে পড়া-শুনায় সবতাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিল। কেদারের কথা গুলো কচ্ কচ্ করে কেটে দিতে লাগল। (মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে?

মাষ্টার। হাঁ, ইংরাজীতে Logic (ন্যায়শাস্ত্র) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন,—

"একরকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছান। যেমন, সব মানুষ মরে যাবে।
পণ্ডিতেরা মানুষ।
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে॥

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছান; যেমন,— ও কাকটা কালো;
ও কাকটা কালো;
(আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো;

অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এরকমে সিদ্ধান্ত কর্‌লে ভুল হতে পারে; কেন না, হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত —যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরও এক দৃষ্টান্ত,—

এ মানুষটির বত্রিশ দাঁত আছে।
ও মানুষটির বত্রিশ দাঁত।

(আবার) যে কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে।

"অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে। এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্রে আছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

প্রেমদাসের পদাবলী।

সুর—কেন এত ফুল তুলিলি সজনি।

কেন এত ক্রীকেট খেলিলিরে ভাই
হাড়গোড় ভেঙ্গে পড়াশুনা ছেড়ে
সেই দেখি তোর কাছা খুলে যায়
সাহেব যখন আসে ঘুঁসি নিয়ে তেড়ে।

রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর
তুমি চাও লোকে বলে যো হুজুর।
পাতড়া পড়িলে পাঁদাড়ে কুকুর
চেটে চেটে খাও লেজ নেড়ে নেড়ে।

ভারত উদ্ধার কাগজে কলমে
কবিতা লিখিয়া দর্পিত মরমে
পাহারাওয়ালা দরজায় দেখে (বল)
আমি লিখি নাই লেখে ভেড়ের ভেড়ে।

কংগ্রেস মণ্ডপে পাগড়ী মাথায়
বক্তৃতার চোটে গগণ ফেটে যায়।
জুয়াচুরি ফোটে কথায় কথায়
মার গ্রাসের ভাত খাও তুমি কেড়ে।

দেশহিতৈষিতা—রায় বাহাদুরী
ধর্ম্মের ভণ্ডামি—গাড়ী বাড়ী জুড়ী
স্বার্থপরতা ভরিয়াছে ভুঁড়ী
হ্যাট্ কোট্ পৈতা টিকি দাড়ীনেড়ে।

হুগলী কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রাম।

"From an historical point of view the district possesses as much interest as any in Bengal or indeed in India".—*W. W. Hunter.*

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। কালে সবই লয় হয়। পরম সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম নগরী কালে বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যরাজী, সুবিশাল প্রাসাদ সমূহ, অগণ্য পণ্যবীথিকা সকল বিদ্যমান ছিল, আজ তাহা কালের কঠোর নিষ্পেষণে হিংস্রজন্তু সমাকুল দুষ্প্রবেশ্য ভীষণ অরণ্যানি। যে বিপুল কায়া বেগবতী সরস্বতী নদীর উপর দিয়া নানা দেশের এমন কি যবদ্বীপ হইতে প্রাচীন য়োনক রাজ্য* পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের পণ্যপূর্ণ বহুনিজ্যপোত সকল যাতায়াত করিত, আজ কালবশে সেই স্রোতস্বতী সরস্বতী ক্ষুদ্রকায়া, সূক্ষ্ম রজত রেখার ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবহমানা। যে স্থানে একদিন অগণ্য জনসমাগমে কল কল ধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইত, আজ সে স্থান জনমানব শূন্য, নিস্তব্ধ, কালের অনন্তক্রোড়ে সুষুপ্ত। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

সপ্তগ্রাম পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বানিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এ প্রদেশের ধনবান বনিকগণ সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। য়ুরোপীয় বণিকগণের সপ্তগ্রামে অনেকগুলি কুঠী ছিল।† সহরটী অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। নিম্নবঙ্গের শাসন

---

*Saatgong was known to the Romans, by the name of *Ganges Regia*. It is a famous place of worship and was formerly the residence of the kings of the country and is said to have been of an immense size. See Asiatic Researches, 8vo edit. Vol V. p. 278.

†Saatgong or Sattagong, now an inconsiderable village, on a small creek of the Hoogly river about four miles to the north west of Hoogly, was in 1566, and probably later, a large trading city, in which the

কর্ত্তার* অবস্থান হেতু সপ্তগ্রাম দ্বিতীয় রাজধানীর ন্যায় শোভমানা হইয়াছিল। সেকালের রাজধানীর শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক এখানে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম মুসলমানদিগের করতলগত হয়। প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তার নাম ইজা উদ্দিন। রাজধানী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া সুযোগ পাইলেই সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইতেন, সেজন্য আকবরের সময়েও সপ্তগ্রাম বুলগক্ (বিদ্রোহ) খানা রূপ দুর্গামে অভিহিত হইত। ভারত সম্রাট আকবরের সময় সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন তিপ্পান্নটী মহল ছিল তাহার সদর রাজস্ব ছিল ১৬,৭২৪,৭২০ মুদ্রা তন্মধ্যে সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে বাণিজ্য শুল্ক, ১,২০০,০০০ মুদ্রা আদায় হইত। আইন আকবরী† হইতে মহলগুলির নাম দেওয়া গেল—বেনোয়া, কুতওয়ালী, ফরাশেতগড়, আকড়া, আনোয়ারপুর, এরশাদ তোয়ালী, সাত গাঁ, আকবারপুর, বোধেন, বেওয়ান, সেলিমপুর, পুরা, বীরমাহীরা, মানিকহাটী, বীলগাঁ, বালিন্দা, বাগোয়ান, বঙ্গবাড়ী, বালিয়া, পেলগাঁ বীরমুদ্দুতি, তুরতেরিয়া, হাবলী সহর, হাসেনপুর, হাজীপুর, বারবাকপুর, ধলিয়াপুর, রাণীহাট, সাদঘাটী, সাকোতা, শিরন, রাজপুর, সাতগাঁবন্দর, সাঘাট, কাতশাল, ফতেপুর, কলিকাতা, মেকুমা,

European merchants had their factories. At that time, Saatgong river was capable of bearing small vessels; and I suspect that its then course, after passing Saatgong, was by way of Adampur, Omptah and Tamluk and the river called the *Old Ganges* was a part of its course, and received that name whilst the circumstance was fresh in the memory of the people."—Major Rennel's Memoir of the Map of Hindoostan.

*"In the early period of the Mahometan rule Satgaon was the seat of the governors of Lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance. In consequence of the silting up of the Saraswati, the *river* on which Satgaon was situated the town became inaccessible to large ships"—Encyclopedia Brittanica, 9th. Ed. Vol XII. p 148.

†Ayeen Akbery—Tukseem Jumma of the Soobah of Bengal.

বাকপুর, খড়ে, খুন্দলা, গিলারা, মাকোয়ারা, মিতারী, মেদনিমহল, মোজাপুর, মুদাগাছা, মাইহাটী, নদীয়া, সাতেনপুর, সেলকি, হাতিকান্দা, গড়। এই সকল মহলগুলির বর্ত্তমান নাম কি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।*

ার সপ্তগ্রাম হইতে ৬০০০ পদাতিক ও ৫০ অশ্বারোহী সেনা সরবরাহ তে হইত। সপ্তগ্রামে একটী টঙ্কশালা ছিল।

কথিত আছে যে কাণ্যকুব্জাধিপতি প্রিয়বস্তের সপ্তপুত্র সরস্বতী তীরে টি গ্রামে অবস্থান করিতেন। উক্ত গ্রামগুলি সমষ্টি করিয়া নামকরণ াছে "সপ্তগ্রাম"। তাঁহারা সকলেই ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের অভিশাপে ামে কুশ জন্মে না, এইরূপ প্রবাদ আছে।†

*এই ৫৩টী মহলের মধ্যে একাদশটীর বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। গুলি সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলিতে পারিলাম না। বাঁশবেড়িয়া বংশের বহু পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাঘব ১২ই রুবি, ১০৬৬ হিজরীতে (১৬৪৯ খৃঃ অঃ) মোগল সম্রাট সাহজহাঁর ট এক সনন্দ দ্বারা নিম্নলিখিত ২১টী পরগণা ও মহল্কের জমীদারীসত্ত্ব হন—আর্শা, হল্‌দা, মামদানীপুর, পাঞ্জনোর, বোরো, জাহানাবাদ, ন্তানগর, সাহানগর, রায়পুর কোতওয়ালী, পাণ্ডুনান, খোশালপুর, বন্দর, পাইকান, আমিরাবাদ, জঙ্গলীপুর, মাইহাটী, হাবলীসহর, াফারপুর, হাতীকান্দে, সেলিমপুর। ইহার মধ্যে শেষোক্ত পাঁচটী মহল ার সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ১০৯০ হিজরীতে (১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে) বাঁশভুয়ার রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় দিল্লির সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের নিকট ত এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, তদনুসারে নিম্নলিখিত ১২টী মহলের জমীদারীলাভ করেন—কলিকাতা, বালিন্দা, হায়াগড় (হাতাগড় ?) আনোয়ারপুর, দনীমল, মাকোয়ারা (মাগোয়ারা ?), ধার্শা, খালোড়, মামপুর, সুলতান কুজপুর এবং কাউনিয়া। উপরোক্ত প্রথম ছয়টী মহল সপ্তগ্রাম সরকার । উক্ত মহলগুলির মধ্যে আইন আকবরীর লিখিত হায়াগড়ের বর্ত্তমান হাতিয়াগড় পরগণা (২৪ পরগণার অন্তর্গত) এখনও বাঁশবেড়িয়া রাজষ্টেট্ । কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে হাথ্যাগড় বলিয়া উল্লেখ আছে।

†One of the Puranas states, that Pryabasta, King Kanouj, had seven sons who were *rishis*, and who ed in Satgaon, and whose names are given to seven lages, viz, Agnidra, Romanaka, Bhopisanta, Saurânan, Bara, Sabana and Dutimanta. *Kusa* grass is id not to grow in Satgaon, as it was cursed by the

TORN PAGES.

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কিম্বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছিল। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুই প্রথম সপ্তগ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত করিয়া যে বেগবতী সরস্বতী প্রবাহিত হইত, তাহা ক্ষীণ শরীরা হইয়া আসিতেছিল, সেজন্য বানিজ্যপোত সকল সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আসা দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছি দ্বিতীয়তঃ পর্ত্তুগীজ বণিকেরা ইতঃপূর্ব্বে হুগলীতে আসিয়া বাণিজ্য আ করিয়াছিল।* তাহারা হুগলীকেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল করিবার স করিল। লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রামের বাণি লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল কাজেই সপ্তগ্রাম ক্রমে হীন শ্রী পড়িল। বাণিজ্যপ্রধান স্থানের বাণিজ্যের হ্রাসে অবনতি অবশ্যম্ভা দিন দিন হুগলীর উন্নতি ও সপ্তগ্রামের অবনতি ঘটিতে লাগিল। সপ্তগ্রাম মহানগরী হইতে পল্লীগ্রামে পরিণত হইল। মোগল রাজপুরু ও বিচারালয়াদি সপ্তগ্রামেই রহিল কিন্তু বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হ গেল। সপ্তগ্রাম শ্রীহীন হইবার আরও অনেক কারণ ছিল। সপ্ত অনেকবার শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১ খৃষ্টাব্দে পাঠানরা সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া বহুধন রত্ন লুণ্ঠন ও নগ নানাস্থান ধ্বংস করে।† সপ্তগ্রাম আরও কয়েকবার লুণ্ঠিত হইয়া তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

seven *rishis*. Hunter's Statistical account of Beng Vol III. p 309.

*Satgong—There are two emporiums, a mile d tant from each other one called Satgong and the oth Hoogly, with its dependencies; both of which are in possession of the Europeans. Satgong is famous pomegranates.

Ayeen Akbery, Gladwin's Translation. Vol Part I. pp 305.

†"In the meantime some exactions having be made from the Afghans who by the treaty of pea had been allowed to retain their jaigirs they again r belled and having advanced into Bengal plundered t

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হুগলীতে পর্ত্তুগীজ বণিক।

গ্রাম লয়ে হুগলীর অভ্যুদয়। হুগলীর অভ্যুদয়ের কারণ পর্ত্তুগীজ ন। কোন দিন বা তারিখে পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে প্রথম আগমন করে র সঠিক সংবাদ পাওয়া দুষ্কর। কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর ত হইবে। জগদ্বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কডেগামায় অর্ণবযান শা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া ভারতোপকূলে কালিকাট সহরের তীরে খৃষ্টাব্দে প্রথম নঙ্গর করিয়াছিল। জলযানে ভারতবর্ষে য়ুরোপবাসীর থম আগমন। ভাস্কডেগামার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া র্জ্জন; তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি বহু অর্থোপার্জ্জন দুই বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারতের কপাল । গামার স্বদেশবাসীগণ শুনিল ভারত সোণার রাজ্য যে যত পারে পারিলেই হইল। তাহারা স্বর্ণ লোভে ভারতে আসিবার জন্য ইল। এক দুই করিয়া জলযানে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ভারতে আসিতে করিল। প্রথমে বাণিজ্যব্যপদেশে সূচ হইয়া প্রবেশ করিল। ক্রমে ল্প করিয়া ভূমি ক্রয় করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার জন্য দুর্গও নির্ম্মাণ । দেখিতে দেখিতে তাহাদের রাজ্য লাভের বাসনা হইল। সুযোগ কয়েক স্থান অধিকার করিয়া লইল। গোয়া, সিংহল, মলক্কা, , পর্ত্তুগীজ করতলগত হইল। এই সকল অধিকারে আনিলেন, দিগের ক্লাইভ্ আলফন্সো আলবুকার্ক। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর পাঠান সেনাপতি শের সা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় সাহায্যের জন্য র পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন করেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের য্যার্থে বঙ্গদেশে নয়খানি রণতরী প্রেরণ করেন কিন্তু রণতরী পৌঁছিবার ই মামুদ পরাভূত হইয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ াছিলেন। বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজদের এই প্রথম সেনা প্রবেশ, ১৫১৭ খৃঃ র পূর্ব্ব হইতে ব্যবসার জন্য পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্যপোত বাঙ্গালায় আসিত

al port of Satgong in the vicinity of the town now ed Hoogly." Stewart's History of Bengal p. 186.

বটে কিন্তু কখনও রণপোত প্রবেশ করে নাই।* রণতরী সমূহের [illegible] সাম্প্রিয় যখন হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন সম্রাট হুমায়ুন [illegible] সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।† পর্ত্তুগীজরা অনেক দিন হইতে উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য ব্যগ্র ছিল সুতরাং এরূপ সুবর্ণসুযোগ পা করা বিধেয় নহে স্থির করিয়া সাম্প্রিয় স্থান নির্ব্বাচনে ব্যাপৃত হই হুগলীই অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত স্থান বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। হুগ একটী কুঠী স্থাপিত হইল। এখানে সাম্প্রিয় অধিক দিন অবস্থান নাই। তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গোয়া। তথায় তিনি বাহুবলে শাসনকর্ত্তার আসন পরিগ্রহ করেন। অধিক দিন তাঁহাকে শাস পরিচালনা করিতে হয় নাই। পর্ত্তুগীজরাজ নুনীয় নামক পর্ত্তুগী পুরুষকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সাম্প্রীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ লিস্‌বনে প্রেরিত হন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্ ডি ক্যাষ্ট্রো পর্ত্তুগীজ শা নিযুক্ত হন। ইহার সময়ে পর্ত্তুগীজদিগের প্রবল প্রতাপে সমুদ্র জনপদ সমূহ সর্ব্বদাই প্রকম্পিত হইত। ক্যাষ্ট্রোর শাসনগৌরব

*In the History of Faria de Souza, it is rel that the unfortunate monarch had made applicatio assistance to Nuno de Cuna, the Governor-Gener the Portuguese settlements in India, who sent a s dron of nine ships to his aid; but they did not a in Bengal till after the surrender of the city. was the first introduction of the Portuguese in Be as a military power, although some of their ship entered the Ganges as early as A.D. 1517.—Stew History of Bengal footnote p. 121.

†"V. P. De Samprayo, the commander of the vessels, which entered the Ganges in 1537-38, did neglect so favourable an opportunity of establish settlement in Bengal (an object for which the P guese had been long anxious) during the time Shere Shah was engaged in his contest with the peror Homayon."—Stewart's History of Bengal. p. footnote.

[illegible] জন্য তাৎকালিক পর্ত্তুগীজ কবি ক্যামিয়েন্স স্বজাতিপ্রেমে অন্ধ হইয়া [illegible] ছিলেন—(ইংরাজী অনুবাদ)

"O'er Indus's banks, o'er Ganges' smiling vales,
No more the hind his plunder'd field bewails.
O'er every field, oh' Peace! thy blossoms glow,
The Golden blossoms of thy olive bough;
Firm based on Wisdom's laws great Castro crowns,
And the wide East the Lusian Empire owns."

কবির কল্পনা চিরপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে গুরুতর করিতে [illegible]রেন। কোথায় সিন্ধুনদ আর কোথায় গঙ্গা। এত বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার দেশবাসীগণ কোথায় পাইল? আটক হইতে কটক তখন সম্রাট আক- [illegible]রের রাজ্যভুক্ত। পর্ত্তুগীজরা সমুদ্রোপকূলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল [illegible]ট কিন্তু তাহা পশ্চিম উপকূলে। ক্যামিয়েন্সের ন্যায় সৌজা (Souza) [illegible] দেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে চীন উপকূল পর্য্যন্ত [illegible] পর্ত্তুগীজরাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে এটা সম্ভব ব্যবসা বানিজ্যের জন্য উক্ত স্থান সমুদায়ে পর্ত্তুগীজদিগের [illegible]যাতায়াত ছিল। আবুল ফাজল্ বলেন সম্রাট আকবার খৃষ্টধর্ম্মবিষয় অব- [illegible]গত হইবার জন্য ব্যগ্র হন। সেজন্য ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী বড়লফ্ একোয়া- [illegible]ভিভা আকবরের নিকট গমন করেন। অপর দুই জন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

হুগলী এতক নগণ্য অবস্থাতেই ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। চণ্ডীতে গঙ্গার পূর্ব্বকূলের গোরীপুর হালি- সহর প্রভৃতির ও পশ্চিমকূলের সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, হুগলীর উল্লেখ নাই কেন? আর যদি পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে আসিয়া উক্ত সময় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিত কবিকঙ্কন নিশ্চয় তাহার উল্লেখ করিতেন। হিজলীর পথে ফিরিঙ্গির দেশ বলিয়া চণ্ডীতে উল্লেখ আছে আর হুগলীর উল্লেখ থাকিবে না, ইহা সম্ভবপর নহে। খুব সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বিংশ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। আইন আকবরী প্রণেতা কহেন যে হুগলী এবং সপ্তগ্রাম ফিরিঙ্গি- দের অধীন ছিল, তন্মধ্যে শেষোক্ত স্থান হইতে রাজস্ব আদায় হইত। ১৫৮৫

TORN PAGES.

খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) নামক ভ্রমণকারী হুগলীতে ...হের করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে হুগলী পর্ত্তুগীজদের এক প্রধান ...ন স্থান (chief keep of the Portuguese). ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ...হতে মোগল সৈন্য বিদ্রোহী হয় সে সময় হুগলী পর্ত্তুগীজদিগের অধীন ...গ পা প্রকাশ। বর্দ্ধমানের নিকট সলিমাবাদ নামক স্থানে মোগল সে...পৃত হই মির নাজাৎ পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ...ল। হুগ পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকবার নামা...স্থান লিপিতে উক্ত শাসনকর্ত্তার নাম বারতব্বর ফিরিঙ্গী বলিয়া উল্লেখ আছে। উপরোক্ত ঘটনাবলী হইতে অনুমান করা যায় যে পর্ত্তুগীজরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।

হুগলীর নামকরণ কবে হইল? ফেরিয়া ডি সৌজার পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে* (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়) হুগলীর নাম গলিন (Golin) বলিয়া উল্লেখ আছে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাটনা হইতে হিউজ এবং পার্কার সাহেব (Messrs. Hughes and Parker) যে পত্র লেখেন তাহাতে উল্লিখিত আছে যে নিম্নবঙ্গে পর্ত্তুগীজদের দুইটী দুর্গ আছে, একটী পিরপুল্লীতে (সম্ভবতঃ পিপ্‌লী) আর একটী গলির বা গলিন নামক স্থানে। ডাচ্ শাসনকর্ত্তা ব্রাউচ্ (Van Brouche) ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে হুগলীর নাম ওয়েগ্‌লী (Oegli) বা হোয়েগলী (Hoegli) বলিয়া লিখিয়াছিলেন। ডি লেইটের (De Lait) ইণ্ডিয়া ভেরা (*India Vera*) নামক পুস্তকে উগেলী (Ugeli) বলিয়া উল্লেখ আছে। উপরোক্ত নাম গুলির সহিত হুগলীর অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। টিপু সুলতানের পাঠাগারের গ্রন্থ সমূহের ৩৭নং বিস্তারিত তালিকার পরিশিষ্টে হুগলীর উৎপত্তি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু কোন সময় স্থাপিত হয় তাহা নির্দ্দেশ করা নাই সুতরাং ইহার সঠিক মীমাংসা হওয়া দুষ্কর।

*El Asia Portuguesa.

†Blochman's *Notes* appended to Hunter's Statistical account of Bengal. Vol I.

...রতে পর্ত্তুগীজ রাজত্বের প্রধান রাজধানী ছিল, গোয়ানগরে, তথায় ...তিনিধি বাস করিতেন। অন্যান্য স্থানে উচ্চকর্ম্মচারী বা প্রতিনিধি ...থাকিতেন। বঙ্গদেশে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি ...র কুঠীতে অবস্থান করিতেন।

...সপ্তগ্রাম এতকাল পর্য্যন্ত রাজকীয় বন্দর ছিল। পর্ত্তুগীজরা হুগলীকেই ...প্রদেশের প্রধান বন্দররূপে পরিণত করাই স্থির করিল। নূতন সৌষ্ঠবে ...লী সপ্তগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইল। সপ্তগ্রামের প্রতি ভাগ্য-...বিরূপ হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সরস্বতী নদীর জল শুষ্ক ...য়ায় বৃহৎ জলযান যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং পর্ত্তুগীজ-...গর মনস্কামনা সিদ্ধির বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ হুগলীর ...দ্ধি ও সপ্তগ্রামের অধঃপতন হইতে লাগিল। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ...অভ্যুদয় ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। হুগলীর উন্নতির পথে ...নিক্ষেপ করিবার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ...জরা প্রমাদ গণিল। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। হুগলী ...ক্ষিত করিবার জন্য পরিখা খনন ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। হুগলীর প্রথম ...গীজ শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গোয়া হইতে নিযুক্ত ...নও ব্যক্তি উক্ত কার্য্য করিয়া থাকিবেন। আর তিনি যিনিই হউন ...হার ক্ষমতা সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। হুগলীতে খৃষ্টোপসনা করিবার জন্য ...কাল কোনও ধর্ম্মমন্দির ছিল না। এই অভাব দূরীকরণ মানসে ষোড়শ ...ব্দীর শেষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী সুন্দর উপাসনালয় ও মঠ নির্ম্মিত হয়। ...৩২ খৃষ্টাব্দে যখন হুগলী অবরুদ্ধ হয় সেই সময় উক্ত গির্জ্জা মোগলসেনা ...ক কোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গির্জ্জাটী পুনঃ-...র্ম্মিত হয়। গির্জ্জা প্রবেশের দ্বারে একখানি প্রস্তরফলকে সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা ...র্ম্মাণের তারিখ ১৫৯৯ বলিয়া অঙ্কিত আছে। বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন ...সর ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে গির্জ্জাটীর কয়েক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, পর বৎসর ...হার সংস্কার করা হয়।

...কালের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া ...ছিল। যদিও তাহারা মোগলসম্রাটের অধীন বলিয়া স্বীকার করিত ...ন্তু তাহা নামে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহারাই হুগলীর সর্ব্বময় প্রভু ও

TORN PAGES.

অনেকে মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন। দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—

[নির্লিপ্ত সংসারী]

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারো মাথায় দুমণ বোঝা আছে, আর বয়ে যাচ্চে, মাথায় বোঝা তবুও সে দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাক্‌লে হয় না।

"যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌটী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

[নির্লিপ্ত হইবার উপায়]

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে গেলে, কিছু সাধন করা চাই। দিনকতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিন মাস হোক, বা এক মাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা কর্‌তে হয়, সর্ব্বদা তাঁহাকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর্‌তে হয়। আর মনে মনে বল্‌তে হয়, আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দুদিনের জন্য, ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, হায়! কেমন করে তাঁরে পাব।

"ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আর আটা লাগে না।

"সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্তে হয়। দই পেতে মাখম তুল্‌তে হয়। মাখম তুলে যদি জলে রাখ, তা'হলে জলে মিশ্‌বে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতন নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কর্‌বো। আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে বল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না।

জনকরাজা হেটমুণ্ড হয়ে, উর্দ্ধপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেটমুণ্ড বা উর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার কর্‌তে হয়। দই নির্জ্জনে পাৎতে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি কর্‌লে দই বসে না।

"জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটি নাম বিদেহ—কি না দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

"জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

[সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান]

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটিও জ্ঞান, উটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাকিতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগিবে।

"মাখম তুলে যদি নূতন হাঁড়ীতে রাখ, তা হলে মাখম নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়ীতে রাখ, তা হলে সন্দেহ হয়।

"খই যখন ভাজা হয়, দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্ টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান লাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মতন দাগ শূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাক্‌লে একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হতে পারে। জনক রাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়, তখন স্ত্রীপুরুষ বলে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

#2310 89. FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE, FILMING IS NOT POSSIBLE.

"যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

[জ্ঞানের পর কর্ম্ম লোক সংগ্রহার্থ]

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীরপুরুষ।

"হাওয়াতে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটি পাখী বস্‌লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমনকি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

"নারদাদি আচার্য্য এই বাহাদুরি কাঠের মত, এই ষ্টিম্ বোটের মত।

"কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয় আর আপনিও খায়। নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান-লাভের পরও ভক্তি নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তিযোগ—যুগধর্ম্ম কথাপ্রসঙ্গে]

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে যাকেতাকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে।

একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন পথ সে জান্‌তো না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিয়েছিল। পথ ভুলে ছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা কর্‌তো। তারা বলে দিল, 'এ পথ নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করিল। না জান্‌লেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিছ্‌ল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

[ঈশ্বর সাকার না নিরাকার]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন কর্‌তে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখিতে লাগ্‌ল জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ওধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌ল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। পুনর্ব্বার দণ্ড এধার থেকে ওধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌ল। তখন সন্ন্যাসী বুঝিল, যে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার।

কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানারূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না কর্‌তে পার্‌লে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

একজনের এক গামলা রঙ্ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্ করতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা কর্‌তো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও।' একজন হয় তো বল্লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন হয়তো বল্লে, আমার হলদে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি

ছুপিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার হলদে রঙ্‌।' নীল রঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে, যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যাঁর গামলা, সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে?' তখন সে বল্লে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)।

"একজন বাহ্যে গিয়েছিল—দেখ্‌লে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্লে, 'ভাই! অমুক গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটি বল্লে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রং হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্‌।' আর এক জন বল্লে, 'না না, সে সবুজ হতে যাবে কেন, সে যে হলদে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্লে, বেগুনি নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি। তোমরা যা, যা বল্‌চো, সব সত্য, সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল, কখন হলদে, আরও সব কত কি হয়। আবার কখন দেখি, কোন রঙই নাই।'

"যে ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ (The Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ্‌, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

"তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কুল কিনারা নাই। ভক্তিহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত (Personal God) হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠলে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্ত (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর আমি আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (The Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (the unknown and the unknowable)।

"তাই বলে ভক্তি—চন্দ্র, জ্ঞান-সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আট্‌কে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার কর্‌তে চাও, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই, জ্ঞানসূর্য্যে বরফ গলে যাবে—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল।

(কাঁচা আমি ও পাকা আমি; ভক্তের আমি)

"জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হলে, আমিটামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

"গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ (তুমি তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয়।

"যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা, আমি দাস তুমি প্রভু', তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যাস্, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। (সকলের হাস্য)।

"সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে, দাস আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

"দাস আমি', 'বিদ্যার আমি,' 'ভক্তের আমি', এরই নাম 'পাকা আমি'।

"কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে? এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধর্‌তে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিষপত্র কেড়ে নেয়, তারপর উত্তম মধ্যম মারে, তারপর পুলিশে দেয়! বলে, 'কি! জানে না, কার চুরি করেছে।'

(বালকের আমি)

"ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি' ও 'পাকা আমি'। বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি কর্‌লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। আবার রজোগুণের বশ নয়। এই খেলাঘর পাৎলে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইলো। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পড়ে বেড়াচ্চে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় করে বেড়াচ্চে।

"যদি ছেলেটীকে বল, 'বেশ কাপড়খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েচে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড়খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েচে, না, আমি দোব না।' তারপর ভুলিয়ে একটি পুঁতুল কি একটি বাঁশি যদি হাতে দাও, তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানি তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু বাপমার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন

খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়্‌লো। পুরাণো খেলুড়েদের একরকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো এক পাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগোপোঁদে খাবে। আবার লোক-লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে, দেখ্‌দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না?

"আবার 'বুড়োর আমি' আছে (ডাক্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেক গুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিষয় বুদ্ধি, পাটোয়ারি কপটতা। যদি কারুর উপর আকোচ হয়, তো সহজে যায় না, হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিন যায় না। তারপর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার; এই সব 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি।

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। চার পাঁচ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এসব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছে, দেখ্‌তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর করে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বর লাভ; ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়)

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রীগৌরাঙ্গ উৎকলে গিয়াছিলেন। আবার উৎকলে জগন্নাথ চিরকাল সুতরাং সেখানে বিন্দুধারী, অতিবড়ী, বিরকত, অভ্যাহত, নিহঙ্গ কালিন্দী, কবিরাজী প্রভৃতি যে অনেক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব থাকিবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে তিলকের আকার অনুসারেও নাম হইয়াছে। সৎকুলী অনন্তকুলী—ইহারা কায়স্থ গৃহস্থ বৈষ্ণব। উৎকলের বিরকত (বিরক্ত) অভ্যাহত (অভ্যাগত) নিহঙ্গ (নিসঙ্গ) বৈষ্ণবরা সকলেই উদাসীন। উৎকলে অপর বৈষ্ণবদের নাম জাতি অনুসারে হইয়াছে, যথা, ব্রাহ্মণ খণ্ডৈত, করণ গোপ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব অর্থাৎ হাড়ি মুচী চামার প্রভৃতি ইতর জাতীয় বৈষ্ণব। বাঙ্গালায় যেমন জাতিভেদ নাই অথবা কেবল মাত্র ব্রাহ্মণদের আছে ইহাদের সেরূপ নহে। উৎকলে "যোগী", গিরি, বৈষ্ণব বলিয়া যে দুইটি শ্রেণী আছে বাঙ্গালার যশোহর প্রভৃতি স্থানেও তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গকে মন্ত্র দেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কথিত আছে গৌরচন্দ্র ঈশ্বরকে বলেন আমি স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছি, তুমি শ্রবণ কর। ঈশ্বর তাহা শুনিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। আবার ঈশ্বরের নিকট তস্য গুরু মাধবও গ্রহণ করিলেন। গিরিপুরী ইহারা শঙ্করের মঠের দশনামীয় সন্ন্যাসীর অন্তর্গত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা বৈষ্ণব হইয়া উদাসীনই রহিলেন। এইরূপে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব হইল। মান্দ্রাজেও এইরূপ শাক্ত বৈষ্ণব আছেন। তেমিকর নামক জনেক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ কাঞ্চীপুর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক। বড়গল ও তিঙ্গল। প্রথম দল বিষ্ণু ও তাঁহার শক্তির উপাসনা করেন; শেষোক্তরা জীবাত্মার মুক্তিদান বিষয়ে শক্তির শক্তি স্বীকার করেন, কিন্তু উপাসনা করেন না। তবে বোম্বাই প্রদেশে একদল শাক্ত বৈষ্ণব আছেন, তাঁহারা বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীর উপাসনা করেন। যাহারা গৈরিক ধ্বজা উড়াইয়া ভিক্ষা করে তাহাদের নাম ওয়ারেকরি।

ভীমাতীরে পান্ঢারপুরে বিল্বলদেবের মন্দির আছে। ইনি বিষ্ণুর নবমাবতার বা বুদ্ধ দেব; নামান্তর পাণ্ডুরঙ্গ বা বিল্লোরা। জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় এই স্থানে জাতিভেদ নাই। খৃঃ অব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পুণ্ডলিক

সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ভক্ত বিজয়, পাণ্ডুর মাহাত্ম্য, হরি বিজয় ইহাদের গ্রন্থ। ইহারা বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও বৌদ্ধদের ন্যায় মহাজনের পদাঙ্ক পূজা করেন।

চরণদাসী। ইহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। দিল্লীর বণিক চরণদাস আলমগির (২য়) বাদসাহের সময় দল্ল সৃষ্টি করেন। ইহাদের নীতি ভাল আর শ্রীকৃষ্ণই সব। ভাগবত ও গীতা গ্রন্থ। চরণদাস "সন্দেহসাগর ধর্ম্মজাহাজ" রচনা করেন। ইহার ভগ্নী সহজীবাই "সহজ প্রকাশ" ও "যোলহজৎ নির্ণয়" গ্রন্থ রচনা করেন। দিল্লীতে ইহাদের ৫।৬টা মঠ আছে।

মার্গী। দ্বারকা অঞ্চলের কৃষি উপজীবী ও ব্যবসায়ী গৃহস্থ বৈষ্ণব।

পল্টুদাসী। নির্গুণ উপাসক। গোবিন্ সাহেবের শিষ্য পল্টু অযোধ্যার নবাব সহাদৎ আলীর সময় দল সৃষ্টি করেন (১৭৯৮ খৃঃ অঃ) নির্গুণ উপাসক হইলেও তিলক মালা কৌপীন টুপি ব্যবহার করেন। কেশরক্ষা না করিলেও চলে। রাম মন্ত্র। "সত্যরাম" অভিবাদন। ইহারা যোগী ও ষট্‌চক্র ভেদ বুঝেন। ইহারা কামিনীকাঞ্চনের বিরুদ্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ইহাদের উপাধি দাস বা সাহেব।

আপাপন্থী। নির্গুন ও রাম মন্ত্রের উপাশক। পল্টুদাসীর ন্যায় মঠ। মুন্নাদাস স্বর্ণকার দলকর্ত্তা। অযোধ্যার নিকট মাড়বায় ইহাদের গদী আছে। ইহারাও যোগী ও শুক্র সঞ্চালনাদি ক্রিয়া করেন। মুন্নাদাসের একটি বচনের অনুবাদ এই "শুক্রের জাতিশাঁতি নাই। ভেক কৌপীন নাই। কোন চিহ্ন নাই। গো ইন্দ্রিয় (লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারের মধ্যস্থান) ইহার বিক্রয় স্থান; ঐখানে বিক্রয় হয়। হীরার ঝাড়ে (সহস্রার) মতি (শুক্র) লাগিয়াছে। মুন্না তাহা টানিতেছে, নির্গত হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধ দিকে ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে আকর্ষণ করিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখ।" মোহন্তরা গলদেশে সেলি (ঊর্ণসূত্রের বস্ত্র) ব্যবহার করে। ইহাদের ফকিরেরা "গায়ত্রী ক্রিয়া" করেন। নিজ মলমূত্র ও শুক্র পান করেন। তাহাদের সাঙ্কেতিক নাম আছে—বীজ মণিরস=শুক্র, অজর্=মল, রামরস=মূত্র। এই দুই ও সৎ-নামী সম্প্রদায়ে প্রকৃত ভাল লোক অনেক আছেন।

সৎনামী। পল্টু ও আপাপন্থীর মত সব। ঈশ্বরকে "সৎনাম" বলেন। জগজীবন দাস ক্ষত্রিয় দলকর্ত্তা (১৭৭৫ খৃঃ অঃ) ইহাদের গদী আছে। জ্ঞান প্রকাশ, মহাপ্রলয়, প্রথম গ্রন্থ, প্রভৃতি গ্রন্থ। গায়ত্রী ক্রিয়া করেন। রাম মন্ত্র। এই তিন দলই মদ্যমাংস মৎস্যাদি ব্যবহার করে না।

বীজমার্গী। শুক্র হইতেই জগৎ সৃষ্টি, অতএব শুক্রই সব। ইহারা এই জন্যই শুক্রের পূজা করেন। নির্গুণ উপাসক। রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক গীতও করেন। ইহাদের মতে এই দেহেই সব আছে। মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করেন না। গির্ণার পাহাড়ে কাটিবারদেশে ইহাদের আবাস। পূজার জন্য কোন উদাসীন বা মোহান্তের শুক্রই প্রশস্ত। সেই শুক্র পাইবার জন্য বাটীর স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হয়। শুক্লচতুর্দ্দশীতে চক্র করিয়া ইহারা তাহা পূজা করেন। অনেক ভাল লোক সম্প্রদায়ভুক্ত আছেন। তুলসীমালা ধারণ করেন।

স্বামী নারায়ণী। গুজরাট দেশের এক চর্ম্মকার দলকর্ত্তা, একজন বৈষ্ণব উদাসীনের মৃত্যু হইলে তাহার নিকট চর্ম্মকার একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হয় সেই গ্রন্থেরই পূজা করে। ঐ গ্রন্থের পূজায় ভগবানের পূজা হয়। ভক্ত ভগবান ভাগবত সবই যে এক। ভগবানকে "স্বামী নারায়ণ" বলেন। শব লইয়া যাইবার সময়ও ঐ কথা বলেন।

হরিশ্চন্দী। হরিশ্চন্দ্ররাজা ডোমগৃহে ছিলেন তাই তাঁর নামানুসারে ডোমেরা এই সম্প্রদায় পশ্চিমাঞ্চলে করিয়াছে।

সন্নপন্থী। সন্ন একজন ব্যাধ। একজন উদাসীন দত্ত শালগ্রামশিলা পাইয়া অতীব ভক্তি সহকারে পূজা করেন ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এক দিন এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার নিকট রতিকামনা করে। তিনি বলেন একজনের কণ্ঠচ্ছেদ না হইলে হইবার নয়। তাহাতে কথা না বুঝিয়া নারী তাহার স্বামীকে বধ করে। সন্ন নারীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। নারী রাজ-দ্বারে নালিশ করাতে সন্নের দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তিত হইল। এদিকে নারী স্বামীর সহমরণে গমন করিল। সন্ন বলিয়াছেন "স্ত্রীর চরিত্র কাহারও জ্ঞেয় নহে, স্বামী বধ করে ও আবার সতী হয়"।

মাধবী। ভক্তমালে যে মাধোজির বৃত্তান্ত আছে তাঁহা হইতে। তিনি একজন উদাসীন। এই দল বলিয়ান নামক যন্ত্র বাজাইয়া গান করে।

চূহড়পন্থী। 'নাথজী' নামক বিগ্রহ আগরায় স্থাপন করিয়া এক বণিক দল সৃষ্টি করে। এই নাথজীর প্রকৃত মন্দির কিন্তু গুজরাটে। কৃষ্ণনাম জপ ও গানই উপাসনা। স্ত্রীপুরুষ একত্রে নৃত্যও করে।

কুড়াপন্থী। হাত্রাস সহরের একজন অন্ধ বণিক (নাম তুলসীদাস)

দলকর্ত্তা। এক কুণ্ডে খাবার দ্রব্য দিয়া সকলে একত্রে আহার করে বলিয়া নাম হইয়াছে। ইহারা যোগ অভ্যাসও করে। কোন বিগ্রহ পূজা করে না। চক্র করিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ নৃত্য ধর্ম্মসঙ্গীত ও যোগাভ্যাস করাই সব। গুরু উপস্থিত থাকেন। স্ত্রীগমন সম্বন্ধে ইহাদের মত উদার। সে গূঢ় রহস্যের কথা। ইহাদের গুরুভক্তি অতীব প্রবলা। গুরুকে চলিতে দেয় না, শিষ্য স্কন্ধে করিয়া লয় বা ঘোটকের মত হইয়া বহন করে।

হিন্দুস্থানে তিলক ভেদেও অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে। হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, চতুর্ভূজী ও লস্করী।

বৈরাগী। শৈব উদাসীনকে লোকে সন্ন্যাসী বলে, বৈষ্ণব উদাসীনকে "বৈরাগী" বলে। এক্ষণে দাদূপন্থী কবির পন্থী, রামানন্দী দলের উদাসীনগণ এই নামেই খ্যাত হইয়াছেন। কাহারও মতে রামানন্দের শিষ্য শ্রী আনন্দ বৈরাগী দলকর্ত্তা। রামাৎরা ধাতুনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক সদৃশ বস্তু গলায় দিয়া যজ্ঞোপবীত গাঁথিয়া দেয়। ইহাদের মালার নাম সুমরণী (স্মরণী) আঠারটি মালা থাকে বড়টির নাম সুমেরু। তুলসীর ১০৮ মালাও আছে। বক্ষ-বস্ত্রের নাম 'অচলা' ঊর্ণা বা কার্পাসের। বাহুতে অনন্তব্রতের দিন রজ্জুবদ্ধ করিয়া এক বৎসর রাখে। ইহারা মৃগচর্ম্ম ও অলাবুর কমণ্ডলু ব্যবহার করে। লোহের চিম্‌টাও ব্যবহার করে ও তীর্থ ভ্রমণ করে।

বৈরাগীরা ভগবান পাইবার জন্য শরীরকে নানাবিধ ক্লেশ দিয়া থাকেন। অনেকে ঊর্দ্ধবাহু দেখিয়া থাকিবেন; সেইরূপ। এই ক্লেশ হইতে নানাবিধ নাম ও শ্রেণী হইয়াছে যথা, ফরারী, দুধাধারী, বাণশয্যী, মৌনব্রতী, ঠাড়েশ্বরী, পঞ্চধূনী, কাঠিয়া (কাষ্ঠের কৌপীন), লোহিয়া (শিকলধারী) খোকী (ভস্মলেপনকারী)।

ভিক্ষানুসারেও নাম আছে। বাঁক কাঁদে করিয়া যাহারা ভিক্ষা করে—কামধেন্বী। হাঁড়া মাথায় করিয়া ভিক্ষাকারী—মটুকধারী। প্রথম দল ধনুস্‌ধারী রাম নাম উচ্চারণ করে কিন্তু দ্বিতীয় দল দ্বারস্থ হয় না কতকটা রাতভিখারীর ন্যায়।

শৈবদিগের ন্যায় বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণব পরমহংসও আছেন। বাল বৃদ্ধও কুলভেদে ব্রহ্মচারী তিন প্রকারের। বিবাহ না করিয়া সংসার ত্যাগ-কারীরা বাল ব্রহ্মচারী। শেষজীবনে ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণকারী বৃদ্ধ ও কুলটুট্ মন্ত্রে

যাহারা ব্রহ্মচারী হয় তাহারা কুলব্রহ্মচারী। এরূপ ব্রহ্মচারীরা নাম বদলাইয়া গুরুদত্ত নাম গ্রহণ করে ও অচ্যুৎ গোত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া (যে কোন সম্প্রদায় হৌক না কেন) পরমহংস-বৃত্তি অবলম্বন করেন ও আমি বিষ্ণু, আমি অচ্যুত এইরূপ বলেন। "পটল ও পদ্ধতি" পুস্তকে ইঁহাদের নিত্যক্রিয়ার বিবরণ আছে। ইঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। যোগসাধন দ্বারা সাযুজ্য মুক্তি লাভই ইঁহাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভগবানে লীন হইয়া যাওয়া।

শ্রীসম্প্রদায়ের যাহারা ব্রহ্মচর্য্য বা গার্হস্থ্য আশ্রমের পর সন্ন্যাস লয়, তাহারা বৈষ্ণব দণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। ইঁহারা শাস্ত্রানুসারে কায় মন ও বাক্যকে দণ্ডদানে সমর্থ। বেদপাঠ করেন অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না। কমণ্ডলু ধারণ করেন। মৃত্যুর পর দেহ দগ্ধ হয়।

নাগা। ইহারা অস্ত্রধারী উলঙ্গ বৈষ্ণব। নারায়ণ সরোবর, পম্পা সরোবর, বিন্দু সরোবর ও মানস সরোবর ইহাদের তীর্থ। স্নান উপলক্ষে ঐ সকল স্থানে মেলা হয়। হরিদ্বারে ও প্রয়াগে ও কুম্ভমেলায়ও ইহারা স্নান করিতে আসেন।

যাঁহারা বিষ্ণু উদ্দেশে স্তুতি করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে ভাট বা ভাঁট বলে। চারি সম্প্রদায়েরই ভাঁট আছে।

গন্ধর্ব্ব সাধন। একটি দল হইয়াছে, সুর ব্রহ্ম। জ্ঞানাৎ পরোতরো নহি গানাৎ পরোতরো নহি। অতএব নৃত্যগীত দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হয়। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। জাতিভেদ নাই। শালিগ্রাম নামক এক ব্যক্তি নেতা। আগ্‌রা প্রধান স্থান।

পরমহংস শিষ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনেক কথাই বলিয়াছি। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ। হুগলি জেলার জাহানাবাদের কামার পুকুরে জন্ম গ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে থাকিতেন। সকল সাধনের সমন্বয় করেন। তাঁহার শিষ্যগণ বেলুড়ে মঠ করিয়াছেন ও তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করেন। আট জন প্রধান শিষ্য তন্মধ্যে বিবেকানন্দ সর্ব্ব প্রধান। ইনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন ও অনেককে স্বমতে আনিয়াছেন। ইঁহারা যোগসাধনাও করেন।

একবার তুমি গাওনা!

একবার তুমি, গাওনা— ?
যে সুরে গাহিতে, যমুনা পুলিনে,
"অয়ি ব্রজবালা আওনা!"
শুনিতে তোমার, বিশ্বরূপ ভরা,
ভুবন ভুলান, মধুর অধরে,
অতল হৃদয়, পীযূষ পুরিত,
সৃজন জুড়ান, বাঁশরী স্বরে!
হৃদয় আমার, বড়ই ব্যাকুল—
অকূল পিপাসা, উথলে প্রাণে!
ভবের বিরহ, মুছিতে হরি হে!
গাও একবার, প্রেমের তানে!
হৃদয় স্রোতস্বী, নিদ্রিত মায়ায়—
আবেগ জাগ্রতা, উথলি ধীরে
প্রেম বরষার, পরাণ কদম্ব,
ফুটুক ভাবের, পরাগে ঘিরে!
জ্ঞানানীল সুপ্ত, জীবন আকাশে,
উঠিবে জাগিয়া, মলয় বহি!
প্রাণের প্রভাতে, পরমাত্মারুণ,
কিরণ হাসাবে, মানসমহী!
বাসনার তৃষা, তমসা রজনী,
বিপদ্ সঙ্কুল, সংসারময়!
পারি না ঘুমাতে, জাগাও হরি হে!
হৃদয় নিকুঞ্জে হ'য়ে উদয়!
সুমধুর মন্ত্রে, মোহিত পরাণে,
বিস্মৃতি আবেশে, শৃঙ্খল দ্বারে,
মৃদুল আনন্দে, ধীরে ধীরে, আমি,
চলে যাই, শান্তি বাঁশী হেরিবারে!
গাও দীননাথ! রাখ দীন কথা!
বড় সাধ, শুনি, চরণ তলে,
গল লগ্ন বাসে, যুক্ত করে বসি!
যদি গুরুদত্ত—নয়নজলে!
ভাব পুষ্পতোরা, চামরে ব্যজন,
করিবে প্রবৃত্তি, তোমার গায়!

জগত সুরভি, ঢালিবে প্রকৃতি !
ও চরণ পদ্ম, বিমুগ্ধ যায় !
সৃজন পালন— প্রলয় কারণ,
ত্রিগুণ সঙ্গীত, বাসনা আমার !
কেন হে গঠিলে, নশ্বর জঙ্গম ?
কেন তাহে, ঘন প্রলেপ মায়ার ?
মায়া যদি দিলে হোক্ সে নীরস,
পুন ভালবাসা, তাহায় কেন ?
তাও যদি হ'ল, কোন পাপে বল
মাখাইলে তাহে, বিরহ হেন ?
যে পতি চরণ, নারীর সর্ব্বস্ব !
সে নিজস্ব বিনা, জীবনে কি ফল ?
যে পুত্র বদন, অতুল সংসারে—
সেই পুত্র শোক – কি বিধান বল ?
তুমিই যখন, ত্রিগুণ কারণ,
ভাঙ্গিছ—রাখিছ—গঠিছ তুমি—
বাড়াতেছ পাপ, ঢালিতেছ তাপ,
চারি যুগে রাখি, মানব ভূমি !
পালনেরি তরে— মায়া যদি জীবে ?
মরণে কেন না, সে মায়া লয় ?
ইন্দ্রিয়ের সুখে, যদি ভালবাসা ?
প্রাণ কেন, তাহে, মিশায়ে রয় ?
ধর্ম্ম কার্য্য তরে, যদি এ সংসার ?
উপভোগ আশা, কেন বা ফলে ?
সবই যদি মিছা— মিছার মাঝারে,
কেন জীব এত, আশায় চলে ?
বুঝিতে পারি না এ দুর্জ্ঞেয় কিবা—
বুঝাও হরি হে ! এ তব জ্ঞান !
একবার তুমি, ডাকহে আমায় !
অনাথ করো না, অনাথ প্রাণ !
কেহ মোরে ভবে, ডাকে নাই কাছে !
তাই বলি, তুমি গাওনা !
যে সুরে গাহিতে, যমুনা পুলিনে,
"অয়ি ব্রজবালা আওনা !"

মুখ।

অদ্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, আজ মেঘদূতের জন্মদিনে, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া অতি প্রত্যুষেও ঠাণ্ডার সময় একটু সুস্থ হইতে পারিতেছি না, কেবল পূর্ণিমা মনে পড়িতেছে। শয্যা ত্যাগ করিয়া একবার চারিদিক দেখিলাম, "যেন বপ্র ক্রীড়া হেতু ধাইল অমনি"। মেঘ তুমি মেঘদূতের জন্মদিন পালন করিতে বসিয়াছ। কালর উপর কাল, স্তরের উপর স্তর, নব নব ভ্রমরকৃষ্ণ নীরদরাজি, সেনাপতির আদেশের পর সৈন্যগণের ন্যায় আপন আপন সজ্জায় আপন আপন স্থানে দাঁড়াইতেছে। ঘন ঘন ভেরী চলিতেছে; বায়ুর কাজ বাড়িয়া গিয়াছে—ছুটাছুটি করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিতেছে—গ্রীষ্মের সঙ্গে যে যুদ্ধ হইবে। যক্ষ তুমি কোথা? কালিদাসের আত্মার আজ কি আনন্দ?

প্রাণ তর হইয়া গেল—দৃশ্যে; ধীর স্থির প্রভাতী বায়ুর এই কি পূর্ব্বরাগ? প্রেমের ঝটিকা বহিতে আর কত বিলম্ব? কি করিব বুঝিতে না পারিয়া আবার শয়ন করিলাম, কিন্তু সুখে স্থির হইতে পারিলাম না, আবার সহসা মনে পড়িল পূর্ণিমা। এমন সময়ে চক্ষু খুলিয়া দেখি একখানি মুখের মাঝে একজোড়া চক্ষু। দেখিলাম মুখ আর চক্ষু – চক্ষু আর মুখ। ভাবের উৎস ছুটিল, বাহিরে মেঘেরও প্রেমের উৎস যে ছুটিয়াছে। আজ কি দেখিতেছি—মুখদূত না চক্ষুদূত? এদেরও একটা আষাঢ় আছে না কি?

আমার—এই ত মানুষের মুখ। ঐ ত মানুষের মুখ—আমার ঝি; ঐ ত মানুষের মুখ, আমার চাকর; সেই ত মানুষের মুখ আমার বন্ধু; আবার রোষকষায়িতলোচন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, সেও ত মানুষের মুখ, আমার শত্রু। মেঘরে তুই প্রেমে গলিয়া পড়িতেছিস্ আমি ও ভাবে ঢলিয়া পড়িতেছি। ঢাল ঢাল প্রেমধারা ঢাল, আমি সুখে পূর্ণিমার কলেবর বৃদ্ধি করি।

ওদিকে—শ্রাবণ বারিধারা মেঘ-নয়ন ঝরিছে
এদিকে—প্যারী কমলমুখী মানে মজেছে

আমি তুলনায় পূর্ণিমার কথা ভাবি। মানের মুখ আলাপের মুখ; রাগের মুখ; অনুরাগের মুখ; দুঃখের মুখ সুখের মুখ, কান্নামুখ হাসিমুখ; বিড়ম্বনার মুখ, সোহাগের মুখ। ওঃ তাই বা কেন? কপালের মুখ, চোখের মুখ, নাক

কানের মুখ, গাল গলার মুখ, ভ্রূ রগের মুখ, মুখ মুখ, মুখ, সেই সবই ত এক, সেই সব, সেই সব অথচ এ আবার কি, সব মুখই ভিন্ন সবই তফাৎ। হাঁগা বলিতে পার জগদম্বার এ কি খেলা? হাঁগা তোমরা বলিতে পার আপনার মুখ আপনি কেন মানুষ দেখিতে পায় না? হাঁ গা বলিতে পার মানময়ী, মানময়ী মানের মুখ কেন দর্পণে দেখে না?

বড় বড় লোকারণ্য দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আমার জীবনে প্রথম লোকারণ্যের মুখ দেখি আমাদের গ্রামে—রথের সময় রথ হইত, দোলের সময় দোল হইত। নিকটবর্ত্তী গ্রামে শনি ও মঙ্গলবারে যে হাট হইত—পাঁচের হাট আর তিনের হাট, রথ খানা ও দোলের আসবাবটা বাদ দিলে এ জমায়েৎ সেই হাটেরই অনুরূপ। বেশীর ভাগ লাল পাগ্‌ড়ী-ওয়ালা দুই চারি জন কুপণথেলা ধরিতে আসিয়া বসিয়া বসিয়া ঐ খেলাই দেখিত। আরও বেশীর ভাগ সজ্জা-শোভনা ইতর জাতীয়া গ্রাম্য যুবতীর মুখ। আল্‌তা সিঁদুর কড় কালমিশমিশে হাত দুখানিতে দোদুল্যমান পুঁটে রূপার পৈঁছে তাবিজ আর লালপেড়ে সাড়ি খানিতে এদের এত "মিষ্টি" দেখায় কেন? বাল্যস্মৃতি যতটুকু আছে অত অপরিচিত মুখ দেখিয়া মনে হইত তত লোক কোথা হইতে আসিল আর ইহারা রাত্রিতে শুইবে বা কোথা? কিন্তু সাজ্‌টা যেন ঠেকিত একই রকমের।

কৈশোরে প্রথম লোকারণ্য দেখি শিবাদহে গ্যাসের কারখানার নিকটীন সাহেব যখন বৃহৎ বেলুনে আরোহণ করেন। পল্লীগ্রামের লোকারণ্যের তুলনায় সাগরকল্লোলের মধ্যে মুণ্ডলহরী ভাসিতেছে মনে হইয়াছিল। মনে হয় বিকলাঙ্গ বিকৃতাঙ্গ আর বহুসংখ্যক অঙ্গহীন ব্যক্তি দেখিয়াছিলাম। স্মৃতি-স্তরে এই ফসিলটিই পড়িয়া আছে। প্রৌঢ় সঙ্গীকে জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম যে তাহারা অনেকেই মুসলমান ও নিকট সম্পর্কীয়া নারী বিবাহে ও হিন্দুর অভক্ষ্যভক্ষণে তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

তারপর অনেক মুখমিলন, মুখারণ্য, মুখার্ণব, মুখমহার্ণব দেখিয়াছি—টাউনহলে সভা, কংগ্রেস সভা; রাজপুত্র আগমনে মুণ্ডমালিনী কলিকাতা; রথে মাহেশ, যোগে ত্রিবেণী, অর্দ্ধোদয়ে লোকোদয় এই সব দেখিয়াছি কিন্তু একই ভাব, একই কথা মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। এই মুখ, এই মুখ, এই মুখ, এই মুখ; সেই নাক, সেই কান, সেই চোখ, সেই গাল—একই মুখে

এই সবই আছে অথচ একখানি মুখ আর একখানির মত নহে কেন? এক নামের এই চারিখানি মুখ দেখুন না। ভাবনায় মস্তিষ্ক মুহ্যমান হইয়াছে, কখনও নিরাশায় অন্ধকূপে পড়িয়াছি, দিনে তারা দেখিয়াছি; কখনও বা আশার বেলুনে উঠিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছি, কখনও হাসিয়াছি, কখনও কাঁদিয়াছি; কখনও নাস্তিক সাজিয়াছি কখনও আস্তিক সাজিয়াছি; কিন্তু শেষে মন বলিয়াছে, কে সে গড়নদার এমন কারিগরী যার? দুইটা গরুর—দুইটা পশুর—মুখও এক নহে।

একদা একজন চিত্রকরকে আমার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমরা কেমন করিয়া মানুষ দেখিয়া মানুষের মুখের ছবি আঁকিয়া দাও, আবার দুইটা মানুষের দুইটা বিভিন্ন মুখ হয়, অথচ সেই মুখের মধ্যে নাক কান চোক সবই আছে?" উত্তরে চিত্রকর বলিয়াছিল যে আমরা একটা হিসাব করি, এই রকম চোখ এক নম্বরের, এই রকম চোখ দুই নম্বরের, এইরূপ চোখ পঞ্চাশ নম্বরের। সেইরূপ নাক কান ভুরু গাল গোঁপ ইহাদেরও নম্বর করিয়া রাখি। একটা মানুষের মুখ পাইলেই হিসাব করিয়া দেখি, কোন্ নম্বরের চোখ্, কোন্ নম্বরের কান, কোন্ নম্বরের নাক। একটু মনোযোগসহ দেখিয়া ঠিক করিয়া নি ৫ নং চোখ, ৮ নং গাল, ৩ নং ভুরু, ৪ নং কান আর ফস্ করিয়া টানিয়া দিয়া দেখি যে ঠিক মুখ হইয়া গিয়াছে, যদি চোখ নাকের নম্বর ধরিতে ভুল হয় তবে মুখ ঠিক হয় না।" বন্ধুর মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা উড়িয়া গেল, শুধু মুখের রকম ভাবিতেছিলাম এ যে আবার চোখ নাক কানের প্রকারের ব্যাপার! তখন বিশ্বশিল্পীর অনন্ত গুণপণায় মন একেবারে মোহিত হইয়া গাহিয়াছিল—

"তোমায় দেখ্‌ব কেমন গড়নদার, গুরুদেব আমার।
আমায় গড়ে দাও উৎকৃষ্ণ পয়ণা কৃষ্ণভক্তির রত্নহার।"

এই মুখের মুখ, এই বিরাট ব্যাপারের মুখ, আবার ভালবাসা ডিপার্টমেণ্টে আমারই নয়ন দিয়া দেখিতে হইবে, তবে অমৃত উঠিবে। কিন্তু ব্যাপার বড়ই গুরুতর বড়ই গভীর। আমার চোখে যে মুখখানা হদ্দ কুৎসিৎ সেই মুখখানাই আবার আমার স্ত্রী বা ভ্রাতা বা বন্ধুর চোখে সুন্দর সুঠাম বড় সুশ্রী। নিজের মুখ কেহ মন্দ দেখে না। আবার যত বড় কুৎসিৎ মুখই হোক না কেন তাহাকে সুনজরে প্রেমচক্ষে দেখিবার জন্য একজন সৃষ্ট হইয়াছে। সেই

গণ্ডের একটি তিলের জন্য একজন সমরখণ্ড বোখারার সমস্ত ধনসম্পত্তি বলিদান দিতে প্রস্তুত। সেই মুখের কেশকদম্ব মধ্যে এক গাছি কেশ দেখিয়া আবার একজনের এত প্রেম এত ভালবাসা, এত ভাব উদয় হয় যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের স্বয়ং ভগবান দেখিয়াও সেই টুকু হয় না বা তত্ত-টুকুর কাছাকাছিও যাইতে পারে না। এ সব কথা ভাবিলে যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হয়, এসব কথার কি কোন মীমাংসা আছে? পূর্ণ মাত্রায় মীমাংসা না হোক কি কথায় হৃদয়ে শান্তি লাভ হইতে পারে?

ভাবিলাম সিদ্ধপুরুষ বা সাধকের গানে এ সম্বন্ধে কিছু আছে কি? প্রথমেই মনে পড়িল রামপ্রসাদ। যেভাব প্রসাদে নাই, তাহাতে আত্ম-প্রসাদ লাভ বড়ই সুকঠিন। যাহাহোক মনে পড়িল—

জংলা। একতালা।

মায়ের এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি অবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে ওরে মিছামিছি সার ভেবে সাহসে বাঁধিছ বুক।
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে ওরে কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব সুখদুখ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক।
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে দেখরে আপন মুখ॥

প্রসাদের আরও একটি গান মনে পড়িল সেটিও আগে শুনাই।

প্রসাদীসুর। একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু শূন্যেতে পাঁচ পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটি।
গর্ভে যখন যোগী তখন ভুমে পড়ে খেলাম মাটী।

ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ী কিসে কাটি।
রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
তুমি যাহা ইচ্ছা তাই কর মা তুমি ত পাষাণের বেটি।

আরও একটি গান এইখানে বলা উচিৎ—

প্রসাদীসুর। একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গ্‌ব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে॥
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে॥

যে মীমাংসা আমরা খুঁজিতেছিলাম, প্রসাদ এই গান গুলিতে তাহা করিয়াছেন, যে শান্তি আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম প্রসাদ এই গান গুলিতে তাহা বদ্ধ জীবকে দান করিয়াছেন। প্রসাদ বলিতেছেন এই সংসার একদিন আমার চক্ষে ধোঁকার টাটি ছিল কিন্তু এখন আর তাহা নয়, এখন আমি প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছি তাই এখন আমি পৃথিবীকে আনন্দবাজার দেখিতেছি ও আনন্দবাজারে আনন্দ লুটিতেছি। একদিন আমার চক্ষে প্রকৃতি স্থূলা ছিল। আমি অহঙ্কার বশত মনে করিতাম জীব লক্ষ কোটী আমার গর্ভধারিণী এক জন, খুড়ীমা আর এক জন, পিসীমা স্বতন্ত্র একজন, পাড়ার রামের মা সেও স্বতন্ত্র আর একজন—জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে—কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে সে কেবল সরার জলে সূর্য্যছায়া। হাজার খানি সরায় জল দিয়া সূর্য্যকিরণে বসাইয়া দাও, দিয়া দেখ। কোন সরায় বাস্তবিক সূর্য্য আসেন নাই কিন্তু প্রত্যেক সরার জলে আমরা স্বভাবের সূর্য্য ঠিক দেখিতেছি। দেহ কিছু পরমাত্মা নহে কিন্তু জীবদেহে পরমাত্মার ঠিক প্রতিভাত হইয়াছে। একথা যদি একবার বুঝিতে পারি তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম যে এতগুলি জীব কেহই স্বতন্ত্র পদার্থ নহে সবই এক, সেই পরমাত্মার নিত্যসত্তা আত্মারূপে পাইয়া জীবত্বের অহঙ্কারে ছুটাছুটি করিতেছি। সব এক সব এক তবে দেখিতে ভিন্ন যেন সরার জলে সূর্য্য ছায়া।

যখন সাধকের এই ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তখন কি সাধক আপনার পূর্ব্বকৃত কামজ রঙ্গরস স্মরণ করিয়া বলিবে না, রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে বিষের বাটী আগে ইচ্ছাসুখে পান করে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি? যাক্ ও কথা, শেষ কথাটা আজ আমাদের সমালোচ্য নহে। আমরা এই পর্য্যন্তই আজ বুঝিয়া রাখি যে মা বিরাজে ঘরে ঘরে। জগদম্বা না চিতিরূপে, কি ছার জীব, সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন? তবে না আমরা আসল কথাটা বুঝিলাম—যে কথা সৃষ্টির প্রাক্কালে, প্রলয়ের পর বটপত্রশায়ী ভগবান, যোগমায়ার যোগনিদ্রা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বলিয়াছিলেন, যাহা বহু মন্বন্তর পূর্ব্বে শ্রুতি (বেদ) উচ্চৈঃস্বরে ভারতে ঘোষণা করিয়াছেন,—আমি বহু হইব?

এখন পাঠক পাঠিকা একবার মায়া অবলম্বনে ভগবানের বহু হওয়াটা বুঝিলেন কি? মায়ার ছায়াবাজীর মশারি তুলিয়া একবার দেখিবেন কি? লীন সাহেবের বৃহৎ বেলুনে উঠিবার সময় ঐ যে মুণ্ড রাশি সমবেত হইয়াছে ওগুলি কি? মহারাণীর পুত্রগণের আগমনে যে বারে বারে লোকের লোকারণ্য হইয়াছিল তাহা কি সব ফাঁকি? সেই যে অর্দ্ধোদয় যোগের সময় পঙ্গপালের ন্যায় হিন্দুললনা ত্রিবেণীসঙ্গমে আসিয়াছিল তাহারা কে ও কি করিতে আসিয়াছিল? তাহা কি এক বেটিরই খেলা? তবে কি কমলাকান্ত ঠিক গাহিয়াছিলেন?—

"জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥

আবার, কখনও পার্ব্বতী কখনও শ্রীমতী, কখনও রামের জানকী হয়।
আবার, আপনার মায়ায় হইয়ে বদ্ধ যতনে ভব যাতনা সয়॥

তবে কি মা আমার আপনার পূজা আপনি করিয়া পাঁচজন আপনাকে শিক্ষা দিতেছেন? হরি হরি বড় গোলযোগ হইল যে। তবে কি অঘ্‌রার মার সঙ্গে বিন্দি কামারের সম্মার্জ্জনী তাড়নায় ঝকড়াটা মিথ্যা? একটা ফৌজদারী হইয়া বিন্দি কামারের যে দশ টাকা জরিমানা হইয়াছিল? যে বিচার করিল ও যাহারা উভয় পক্ষে সাক্ষী দিল তাহারা সকলে কি করিল? তাহাদের জোবানবন্দীর যে ফলিও কাগজে জাবেদা নকল লওয়া হইয়াছে? আবশ্যক হইলে যে আবার আদালতে দাখিল হইবে? এ সব কি মিথ্যা

হইতে পারে? কখনই নহে। এই গতকল্য নিশিথিনী রজনীতে যে অট্টালিকার শিখরদেশে শয়ান হইয়া নিদারুণ গ্রীষ্মের বৃশ্চিকদংশনে কাতর হইয়া একেবারে অনন্যোপায় হইয়া, পবন সঞ্চালনের জন্য সমস্ত পবনস্তুতি বিফল হইলেও যে শেষে মৃতকল্পজিহ্বায় সপ্ত জন ঘোরতর কলহকারিণীর নাম করিতেছিলাম ও নাম করিবামাত্র দিক্ দক্ষিণ হইতে পবনের মৃদু নিশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা কি সব অশ্বডিম্ব? রক্তমাংসের কলহকারিণীগণ কি কেবল ছায়াময়ী কল্পনা? এই অসংখ্য দেহরাশি ও মুণ্ডরাজি কিছুই কি কিছু নয়?

মায়ার চক্ষে সব, জ্ঞানের চক্ষে কিছু নয়। পাঠক মহাশয় যাহা বলিলাম তাহা ছেব্‌লামি নয়। গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনার আরম্ভে বা শেষে কখনও কখনও শ্লেষ ও ব্যঙ্গ আসিয়া থাকে। শেক্ষপীর বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে তাহা অনির্ব্বার্য্য। যে প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছি তাহার সদুত্তর এই যে মায়ার পক্ষে সব, কিন্তু জ্ঞানের চক্ষে কিছুই কিছু নয়। তাই রামপ্রসাদ জীবকে সাবধান করিয়াছেন, বলিয়াছেন সংসার সংসার করিয়া সর্ব্বদা ঘুরিয়া মরিও না একটু তলাইয়া বুঝিও সুখ পাইবে, তোমাতে ভগবান আছেন, রামে আছেন, শ্যামে আছেন, কৃষ্ণে আছেন, আমাতে আছেন। তবে আমিই ত সব—আমি ভিন্ন আছে কেবা? কে করে কার সেবা? প্রসাদ তাই বলিলেন—

মায়ের এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি অবদ্ধ জনে লুটে সুখ।

অনেকে কিন্তু কথাটা বুঝিলেও বুঝে না, ছাড়িয়া দেয়, যেন হাঁপাইয়া উঠে। দীপজ্বেলে আঁধার ঘরে দ্রব্য যদি পায় করে তখনি নির্ব্বাণ করে না রাখেরে একটুক। তাই উপদেশ দিতেছেন—মহাসিদ্ধ পুরুষ মহাগুরুর উপদেশ স্মরণ রাখিও ফল পাইবে—প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ, রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে দেখরে আপন মুখ।

সুন্দর সুন্দরীর যে সাধারণ ভালবাসা তাহা মায়ার কার্য্য তাহা কামজ তাহা ইন্দ্রিয়জ, তাহা নাম রূপের বিকার। ঐ যে দাড়িম্বতুল্য যুগ্ম স্তন, যুবতীর উরসের লাবণ্যসাগরের দুইটি শৈল উহাতে কেবল রক্ত আর মেদ, রাত্রির মধ্যে পুঁজ হইতে পারে। "মাংসময়ী নারী ছিছি বিবাহ করিব?"

ইতালীর পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যা নিত্য নূতন উপপতি করিয়া প্রকাশের ভয়ে শেষ রাত্রিতে তাহাকে বিষ প্রয়োগে শমনসদনে প্রেরণ করিত। তাই বলি জড় ছাড় সূক্ষ্মে উঠ, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে নানা গোলযোগ ঘটিবে, জগদম্বাকে নিশাচরী রাক্ষসী জ্ঞান হইবে চিনিতে পারিবে না, ঠকিয়া যাইবে, রাম-প্রসাদের উপদেশ শ্রবণ কর তুমি মশারি তুলিয়া আপনার মুখ আপনি দেখ, তাহা হইলেই সব বুঝিবে সব পাইবে আর কিছু চাহিতে হইবে না।

কি করিব? আপনার মুখ দেখিব। তবে দর্পণ আনয়ন করি। রাম-মোহনের কথা "কত আর দর্পণেতে সুখে মুখ নিরখিবে" ভাসিয়া গেল? না, দর্পণে হইবে না, পারা মিশ্রিত কাচের দর্পণে হইবে না। জড়ের দর্পণে হইবে না। আপনার হৃদয়-দর্পণে আপনাকে দেখিতে হইবে। শুনিয়াছি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন বীর্য্য ধারণ কর সে পারার কাজ করিবে, হৃদয়-কাচে তখন দর্পণ হইবে ও সেই দর্পণে আত্মা দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। হৃদয়দর্পণে যে ঐরূপ দর্শন হয় বা হইতে পারে সেটা না হয় বিশ্বাস করিয়া লইলেন। মহাজনের কথা বিশ্বাস করিতে ক্ষতি কি আর অবিশ্বাস করিবার কারণই বা কি আছে?

সাধনায় কতকটা অগ্রসর হইলে, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, সাধক হৃদয়কমলে আপনার মুখ আপনি দেখিতে পান। আপনার মুখ আপনি দেখিবার এই ব্যবস্থা জগদম্বা করিয়াছেন বলিয়াই কি মানুষ এরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে যে সে আপনার মুখ আপনি দেখিতে পায় না। যাহাহৌক ব্যবস্থা এইরূপ হইয়াছে ও সাধকেরা তাহার প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন।

এখন একবার বুঝুন ভগবান সৃষ্টি মধ্যে আপনাকে লুকাইবার জন্য কত ব্যাপার করিয়াছেন। অহরহ প্রজা বৃদ্ধি হইতেছে। মানুষের না হয় একটি সন্তান হয়, গরুর না হয় একটি সন্তান হয় কিন্তু ইতর জন্তুরা একেবারে সহস্র সহস্র সন্তান প্রসব করে। অধিক বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই পাঠক মহাশয়. বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্ছার ও মাছের ডিম ফুটার বিষয় চিন্তা করিবেন। কিন্তু বুঝিতে হইবে ইহা সব ফাঁকি, ভগবান কেবল বহু হইতেছেন।

কিন্তু কেহ বলিতে পারেন, বহুতে আমার প্রয়োজন কি? আমি একা আমি আর একটি মাত্র প্রাণী লইয়া আছি। সেই প্রাণীটি আমার সেই

মুখখানি; সেই প্রাণীটি আমার নগেন্দ্রের সূর্য্যমুখী শ্রীশচন্দ্রের কমলমণি; গজপতি দিগ্‌গজের আশমানী। সেই মুখখানির অভাব হইলে কেহ কেহ উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম লিখিয়া থাকে; আর অদ্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে সেই মুখ খানিই যক্ষবধূ।

বটে বটে ভালকথা কিন্তু ভাই তুমি উপর দেখিয়া ত সকল সময়ে ভুল না। অজ্ঞাত কুলশীলকে কি আশ্রয় দাও, না জেরা করিয়া আদি অন্ত জানিয়া থাক? আলু পটল কিনিতেও ত ব্যাপারীকে বিশ্বাস কর না। ছুরি বাহির করিয়া কেন রাজহাটের আমটাও কাটিয়া দেখ? কেন চাকলাটা জীবের উপর ফেলিয়া দাও? তাই বলি তোমার ঐ মুখখানিকে একটু দেখিবে না? তুমি ভাই বসুদের ন-বউকে কি দেখ নাই?—সেই সে দিন তাহার পুত্রের অন্নপ্রাসনের সময় কেমারসী সাটী পরিয়া সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া পুত্রধন কোলে করিয়া স্বামী সকাশে সোহাগের মৃদুমন্দ হাসি হাসিতেছিল আর বিপিন বাবু সহধর্ম্মিণীর সেই ছবি দেখিয়া গোমুখীতে গঙ্গা হইতেছিলেন? দেখ নাই কি?—যদি না দেখিয়া থাক ত ফটো দেখিও—সে দিন ফটো লওয়া হইয়াছিল। আহা কি সুন্দর দেখিয়াছিলাম যেন নন্দরাণী শ্রীনন্দ-নন্দনকে ক্রোড়ে করিয়া শোভা পাইতেছিলেন। অপরূপ দৃশ্য। তারপর ভাই সংবাদ রাখ কি? অন্নপ্রাসনের তৃতীয় দিনের রাত্রিতে কি হইয়াছিল। সপুত্র প্রসূতী দারুণ বিসূচীকায় আর মরধামে নাই। চল দেখি আজ এক-বার বিপিন বাবুর অঙ্কশায়িণীকে দেখিয়া আসি। গ্রামের ঈশানকোণে ঐ অশ্বত্থ বট গয়া খেজুর গাছে আবৃত ঐ কর্-পুকুরের পাহাড়টি দেখিতেছ। তুমি ত জান ঐটি গ্রাম্যশ্মশান—বড় বিভিষিকাময় স্থান। দিনেও অবাধে শৃগালেরা বিচরণ করিতেছে, শকুনি গৃধিণী এখনও যে একটা মৃত বালকের দেহ লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। ঐ শূন্য কলসীটার দক্ষিণে ঐ জর্জ্জর বংশখণ্ডের উত্তরে ঐ ছেঁড়া হুলাবাহির বালিসটার পার্শ্বে ঐ যে মৃণালধবল মুণ্ডটি দেখিতেছ ওটি কি জান? এখন কি চিনিতে পার ওটি স্ত্রী কি পুরুষের? ওটি সেই বিপিন বাবুর প্রণয়িণী। আর সেই দিন রাত্রিতেই পুত্রের দেহ গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালেরা ভক্ষণ করিয়াছিল। ঐ যে দন্তশ্রেণী দেখিতেছ, ঐখানে একদিন হাসির লহরী খেলিত, ঐ যে দুইটি ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতেছ ঐ ঐ স্থানে কর্ণ ছিল যে কর্ণের মাকড়ীর দল দল দোল দেখিলে

বিপিন বাবু ও অপরের মস্তিষ্ক দুলিত। একদিন ঐ মুণ্ডে বিপিন বাবু স্বর্ণ-মুকুট পরাইয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন—

যেই শিরে বাঁধ সোণার পাগড়ী
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।

এই ত পরিণাম, তাই বলিতেছি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। মানুষ হইয়াছ, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি পাইয়াছ, পশু নও যে আহার নিদ্রা ও নির্দ্দিষ্টকাল মৈথুনে জীবন শেষ করিবে। দেখিবে না আমি কে, আমার মুখের ভিতর কি আছে? আমার মনের কথা কি? দেখিবে না তুমি কে? তোমার পুত্র কে, তোমার প্রণয়িণী কে আর ঐ দ্বারস্থ কুষ্ঠগ্রস্থ ভিক্ষুকই বা কে? মনুষ্যজীবন বিফলে যাইবার জন্য হয় নাই, গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—অতি অল্প ধর্ম্মই মহতী ভয় হইতে জীবকে ত্রাণ করিয়া থাকে। সাধনা আরম্ভ কর, যতটা করিবে ততটাই থাকিবে কিছুই বিফলে যাইবে না। যোগভ্রষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি নাই। একবার আরম্ভ কর করিয়া দেখ কত সুখ পাইবে। আপনি কে বুঝিতে পারিলে সকল বুঝিবে দুনিয়া বুঝিবে সৃষ্টিরহস্য বুঝিবে, ভগবানকে পাইবে, দেব কমলাকান্ত বলিয়াছেন, "সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহা হইতে হয়, সে হবে তোমার অধীন।"

সময় ফিরিয়াছে, মহাপুরুষগণ কৃপা করিতেছেন, বৃথা রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া বৃথা সংসারভ্রম ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য অগ্রসর হও। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এই হইয়াছে। এখন আমরা কে জানিতে চেষ্টা হইয়াছে। ভাই ভাল করিয়া জান জানিলে তোমার নিজের মঙ্গল পরিবারের মঙ্গল দেশের মঙ্গল। তাহা হইলে তুমি ভারতের সুসন্তান হইবে ও তোমা হইতে ভারতের দুঃখ দূর হইবার উপায় হইবে। ভারতের দুঃখ দূর হইবার আর কোন উপায় নাই, কেবল এক ধর্ম্ম-চর্চ্চা ব্যতীত—ধর্ম্ম যে ভারতের প্রাণ! একটি আত্মারও সদ্গতি হইলে ভারতলক্ষ্মী সুখ-শান্তি পাইবেন।

* * *

সেই চক্ষু দুইটা আর মুখখানি আবার ফিরিয়া আসিল মাকড়ী দুলিল। বিপিন বাবুর কথা মনে করিয়া চমকাইতে যাইতেছি এমন সময় বলিল—গোয়ালা টাকা লইতে আসিয়াছে, হিসাব করিয়া দেখিলাম ৫৫৲ টাকা হইয়াছে। বাক্স খুলিয়া দেখিলাম ১৷৷/১০ মজুদ। তত্ত্বজ্ঞান এতক্ষণে হইল।

শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা।

হুগলী কাহিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রাম সরকার।

রাজা টোডর মল্ল বঙ্গদেশের জরীপ জমাবন্দী করিয়া, রাজস্বের সুবন্দোবস্ত ও তৎ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন ও আশ্‌লি জমা তুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টী সরকার ও ৬৮৯টী মহলে বিভক্ত করেন। টোডর মল্লের আশ্‌লি জমা তুমার হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আবুল্ ফজ্‌ল্ রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য আইন আকবরীতে লিপিবদ্ধ করেন। রাজা টোডর মল্লের রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থা প্রায় ৭৬ বৎসর প্রচলিত ছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বঁঙ্গদেশের সুবাদার সুলতান সুজার আমলে আশ্‌লি জমা তুমারের কতক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল কিন্তু মূলতঃ বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। কয়েকটী নব অর্জ্জিত প্রদেশ বঙ্গদেশভুক্ত হওয়ায় বঙ্গদেশ ৩৪টী সরকার ও ১৩৫০টী মহলে বা পরগণায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। জাফর খাঁ বা মুরশীদ কুলী খাঁর জমাই কামিল তুমারে রাজা টোডর মল্লের আশ্‌লি জমা তুমারের আমূল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ইংরাজ অধিকারের ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে মুরশীদ কুলী খাঁর নূতন বন্দোবস্তে বঙ্গদেশ ১৩টী চাকলা ও ১৬৬০টী পরগণায় বিভক্ত করা হয়। টোডর মল্লের আশ্‌লি জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭৲ আকবরসাহী টাকা রাজস্ব আদায় হইত। সুলতান সুজার আমলে রাজস্ব দাঁড়াইয়াছিল ১৩,১১৫,৯০৭৲ টাকা। আর মুরশীদকুলী খাঁর আমলে ১৪,২৮৮,১৮৬৲ টাকা। নদীর সংস্থান অনুসারে পূর্ব্বে প্রদেশ বিভক্ত করা হইত।* রাজা টোডর মল্লের ১৯টি সরকারের মধ্যে ১১টী গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। ৪টী ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং অবশিষ্ট ৪টী গঙ্গার পশ্চিম ভাগীরথীর সঙ্গম স্থানের নিকট তন্মধ্যে

*হিন্দু রাজাদিগের আমলেও নদীর গতি অনুসারে বঙ্গদেশের ভৌগলিক বিভাগ করা হইয়াছিল। (১) রাঢ়, ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে। (২) বাগরী, গঙ্গার সঙ্গম স্থানে। (৩) বারেন্দ্র, পদ্মার উত্তরে এবং করাতোয়া ও মহানন্দের মধ্যভূভাগে (৪) বঙ্গ, সঙ্গম স্থানের পূর্ব্বে এবং (৫) মিথিলা, মহানন্দের পশ্চিম প্রদেশে।

সপ্তগ্রাম একটি। (ভাগীরথীর পশ্চিমে কতকগুলি পরগণা সপ্তগ্রাম সরকার-ভুক্ত ছিল।)

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের অনেকাংশ পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন ছিল। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বর্দ্ধমান বিভাগ।		রাজা টোডর মল্লের সরকার।
১। মেদিনীপুর	...	জালেশ্বর এবং মাদারণ।
২। হাওড়া ৩। হুগলি		সপ্তগ্রাম, মাদারণ, সলিমাবাদ, এবং সরিফাবাদ।
৪। বর্দ্ধমান	...	সপ্তগ্রাম, সলিমাবাদ, এবং সরিফাবাদ।
৫। বীরভূম	...	মাদারণ, সরিফাবাদ এবং আদমবর।
৬। বাঁকুড়া	...	বঙ্গদেশভুক্ত ছিল না।
প্রেসিডেন্সি বিভাগ।		
১। ২৪ পরগণা এবং কলিকাতা	...	সপ্তগ্রাম।
২। নদীয়া		সপ্তগ্রাম, সলিমাবাদ, খালিফাতাবাদ এবং মামুদাবাদ।
৩। যশোহর	...	খালিফাতাবাদ এবং মামুদাবাদ।
৪। সুন্দরবন	...	রাজস্ব আদায় হইত না।

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের সহিত টোডর মল্লের ৮টী সরকারের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইত। আইন আকবরীতে লিখিত আছে,* "সরকার বারবাকাবাদভুক্ত কাজিহাটা নামক স্থানে গঙ্গা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটী পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত

*Near the place Kazihata, in *sarkar* Barbakabad, the Ganges divides into two parts,—one goes eastward, and flows into the ocean near Chatgaon, and in this separation the stream is called Padmavati; the other goes southwards, and divides again into three parts, one being called the Saraswati, the other the Jon (or Jamuna), the third Ganga. The three are called in Hindi, Tribeni and are held in veneration. The third (*i e* the Ganga, the modern Hugli) becomes, near Satgaon, a thousand channels, and then joins the sea. The Saraswati and the Jamuna also flow into the ocean.—Mr. Blochman's edition of the Ain-i-Akbari p 388.

হইয়া চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে—এই পূর্ব্বমুখী স্রোতস্বী পদ্মাবতী নামে খ্যাত। অপরটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (১) সরস্বতী, (২) যন (যমুনা), (৩) গঙ্গা—বর্ত্তমান হুগলী বা ভাগীরথী। এই তিনটি নদীর সম্মিলন স্থান পুণ্যভূমি ত্রিবেণী। গঙ্গা সপ্তগ্রামের নিকট সহস্রমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। সরস্বতী ও যমুনাও সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে।" ডি ব্যারোর* বঙ্গদেশের মানচিত্রে (১৫৪০ খৃঃ অঃ) সরস্বতী ও যমুনা গঙ্গার বৃহৎ শাখানদীরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ভ্যান্ ডেন ব্রুকের† মানচিত্রে (১৬৬০ খৃঃ অঃ) যমুনা একটি সামান্য খালরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু সরস্বতী সুপ্রসস্ত নদীরূপে অঙ্কিত করা আছে। ত্রিবেণীর সন্মুখস্থ চড়া ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিল। ডিব্যারোর মানচিত্রে চড়াটি স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে সরস্বতী ক্ষীণকায়া খালমাত্র। পুরাতন তীরভূমি অদ্যাপি বর্ত্তমান, সরস্বতী কত বৃহৎ নদী ছিল তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা টোডর মল্লের আশ্‌লি জমা অনুসারে ৫৩টি মহল বা পরগণা সপ্তগ্রাম সরকারভুক্ত ছিল। রাজস্ব ছিল বার্ষিক ৪১৮,১১৮৲ টাকা। সপ্তগ্রাম বন্দর ও হাটের আয় ছিল ৩০,০০০৲ টাকা। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে আয় ২৯৭,৭৪১৲ টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে।‡

সরকার সপ্তগ্রাম বহুদূর বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে সাগর দ্বীপপুঞ্জের নিকট হাতিয়াগড়, উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কবাতক হইতে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বস্থ ভূভাগ লইয়া অবস্থিত ছিল। সপ্তগ্রাম সরকারের অধিকাংশ মহল ভাগীরথীর পূর্ব্ব দিকে বর্ত্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণাভুক্ত ছিল। মুরশীদ কুলী খাঁর নূতন চাকলা বিভাগে রাজা টোডর মল্লের সরকার বিভাগের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের কতকাংশ বর্দ্ধমান ও কতক হুগলী চাকলাভুক্ত করা হইয়াছিল।

রাজা টোডরমল্লের আশ্‌লি জমা অনুসারে সপ্তগ্রাম সরকারের মহল গুলির নাম ও বর্ত্তমান স্থান নির্দ্দেশ নিম্নে করা গেল।

*Joao de Barros—*Da Asia* Vol IV. pt 2.

†Van den Broucke.

‡Grant's Analysis of the Bengal Finances.

১। বেনোয়া (আমবোয়া), বেনোয়া কালনার দক্ষিণে। রেনেল সাহেব বিশেষরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভ্যানডেন্ ব্রুকের মানচিত্রে আমবোয়া বলিয়া অঙ্কিত আছে।

২। কোতওয়ালী, রায়পুর পরগণাভুক্ত। কালনাও উক্ত পরগণার অন্তর্গত। গ্র্যাণ্ট সাহেব কোতওয়ালীকে "রায়পুর কোতওয়ালী সাতগাম্" বলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে রায়পুর পরগণার রাজস্ব হইতে সপ্তগ্রামের শাসন বিভাগের (কোতওয়ালী) ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত ছিল।

৩। ফরাশেতগড়, কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৪। আকড়া বা উখরা, রেনেল আউকেরা নাম দিয়াছেন। আকড়া একটি বৃহৎ পরগণা। এক্ষণে কতক অংশ ২৪ পরগণা, কতক নদীয়া তৌজীভুক্ত। নদীয়াভুক্ত অংশ নগর উখরা নামে পরিচিত। মুরশীদ কুলী খাঁর তৌজীতে সপ্তগ্রাম সরকারের কানুনগু ভবানন্দ মজুমদারের জমীদারী বলিয়া উল্লেখ আছে।

৫। আনোয়ারপুর, ২৪ পরগণার সামিল বারাশতের অন্তর্গত একটি বৃহৎ পরগণা। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ আছে।

৬।৭। এরশাদ তোয়ালী (আর্শা) এবং সাতগাঁ, আর্শা মুরশীদ কুলীর তৌজীতে রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে।*

৮। আকবরপুর, কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৯। বৌধেন (বুড়ান), ২৪ পরগণার মধ্যে সাতগাঁরার উত্তর পশ্চিমে একটি বৃহৎ পরগণা।

১০।১১। বেওয়ান (পাওনান) এবং সেলিমপর, পাওনান আর্শা পরগণার পশ্চিমে, সেলিমপুর উত্তরে অবস্থিত। এই দুইটী পরগণা রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

১২। পুরা, এক্ষণে পরগণা নহে। যমুনার নিকট উত্তর বাসুর হাটে "পুরা" বলিয়া একটি স্থান আছে।

১৩।১৪। বীরমাহিরা (ব্রহ্মত্তর?) এবং মানিকহাটী, কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

*Blochman's notes appended to Hunter's Statistical account of Bengal Vol I. p 363.

১৫। বীলগাঁ (বেলগাঁও), পলাশীর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র পরগণা।

১৬। বালিন্দা, ২৪ পরগণার মধ্যে। এই পরগণায় দুইটী বৃহৎ পল্লি ছিল, হারুয়া ও বালিন্দা। হারুয়া সাধু গোরাচাঁদের সমাধি স্থান বলিয়া খ্যাত। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

১৭।১৮। বাগোয়ান এবং বঙ্গবাড়ী (পাট্‌কাবাড়ী), বাগোয়ান নদীয়া ও পাট্‌কাবাড়ী মুরশীদাবাদভুক্ত। এই দুইটী পরগণা সপ্তগ্রাম সরকারের উত্তরের শেষ সীমা।

১৯। বালিয়া, ২৪ পরগণায়। যমুনার পশ্চিমে। বশীরহাট বালিয়াভুক্ত।

২০। পেলগাঁ (ভালুকা), দক্ষিণ সাতক্ষীরায়, এই মহলের কতকাংশ সরকার খালিফাতাবাদভুক্ত ছিল।

২১। বীরমুদ্ধুতি (বরিদহাটী), ২৪ পরগণায়, কলিকাতার দক্ষিণ ও ডায়মণ্ডহারবারের পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

২২। তুরতেরিয়া, কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

২৩। হাব্‌লীসহর, হুগলী ও চন্দননগরের অপর পারে। এক্ষণে এই পরগণার কতক নদীয়া আর কতক ২৪ পরগণাভুক্ত। অপর নাম হালীসহর। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত ছিল।

২৪। হাসেনপুর, ২৪ পরগণায়। কালারোয়ার (৪০) সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহার কতকাংশ সরকার সুলেমাবাদভুক্ত ছিল। ১৫০৩নং তৌজীভুক্ত রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্।

২৫।২৬। হাজীপুর এবং বারবাকপুর, বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ডায়মণ্ডহারবারকে তত্রত্য লোকে হাজীপুর বলে।

২৭। ধুলিয়াপুর, ২৪ পরগণার দক্ষিণ পূর্ব্ব যমুনা এবং কালিন্দীর মধ্য স্থলে। ইহারই নিকটে ঈশ্বরপুর—সুন্দরবনের বীর প্রতাপাদিত্যের আবাসস্থান।

২৮। রাণীহাট, শান্তিপুরের অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে একটি বৃহৎ পরগণা।

২৯। সাদঘাটী, সম্ভবতঃ পলাশীর উত্তর সাদথালী।

৩০-৩৪। সাকোতা, শিরনরাজপুর (শ্রীরাজপুর), সাঘাট, কাতশাল, ফতেপুর, এই কয়টির নিদর্শন পাওয়া যায় না। শ্রীরাজপুর সম্ভবতঃ সরফরাজপুর এক্ষণে বশীরহাটের উত্তরে, ২৪ পরগণার সামিল একটি পরগণা।

৩৫-৩৭। কলিকাতা, মেকুমা (বেকুয়া?) এবং বারবাকপুর, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর নাম আইন আকবরীতে প্রথম উল্লেখ আছে। অপর দুইটী মহলের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই তিনটি মহল হইতে ২৩৪০৫৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রথমোক্ত মহলের কতকাংশ রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

৩৮।৩৯। খড়ে (খারার?) খুন্দলা (কান্দেলিয়া), কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৪০। গিলারা (কালারোয়া), হাসেনপুরের [২৪] সহিত মিলিত হইয়াছে। কতক নদীয়া ও কতক ২৪ পরগণাভুক্ত।

৪১। মাকোয়ারা (মাগুরা), কলিকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগণায়। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

৪২। মিতারী (মতিয়ারী), নদীয়া জেলায়।

৪৩। মেদনিমল (ময়দানমল), কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব। পোর্টক্যানিং যাইতে রেলের ধারে।

৪৪। মোজাফারপুর, হাওড়া জেলায়, ভাগীরথীতীরে, বোট্যানিক্যাল উদ্যানের নিকটে। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

৪৫। মুদাগাছা (মুনরাগাছা), ২৪ পরগণায়। ডায়মণ্ডহারবার ও হুগলী পইণ্টের নিকট।

৪৬। মাইহাটী, ২৪ পরগণায়। বুড়ানের দক্ষিণ এবং বয়রাবিলের পূর্ব্ব। কতকাংশ রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত আর কতক সতিরাম নামক এক জমীদারের ষ্টেট্‌ভুক্ত বলিয়া মুরশীদ কুলীর তৌজীতে উল্লেখ আছে।

৪৭।৪৮। নদীয়া এবং সাতেনপুর (শান্তিপুর)।

৪৯। সেলকি [হিলকি], ২৪ পরগণার সাতক্ষীরা সব্‌ডিবিজনের উত্তর পশ্চিমে।

৫০। হাতিকান্দা, এখনও একটি পরগণা, হুগলী জেলার ভাগীরথী তীরস্থ সুখসাগরের অপরপারে অবস্থিত। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত ছিল।

৫১। হাতিয়াগড়, সপ্তগ্রাম সরকারের দক্ষিণ দিকের শেষ সীমা। ডায়মণ্ডহারবার হইতে সাগরদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ পরগণা। রাজা রঘুদেবের ষ্টেট্‌ভুক্ত।

৫২।৫৩। সাতগাঁ বন্দর ও হাট।

প্রণব উপাসনা।

(৩)

বিশ্ব ও তৈজসের বিলক্ষণতা।

যেমন বিশ্বের সাত অঙ্গ ও উনিশ মুখ, সেইরূপ তৈজসেরও সাত অঙ্গ ও উনিশ মুখ। কিন্তু বিশ্বের অঙ্গ ও মুখ ঈশ্বর রচিত। আর তৈজসের ইন্দ্রিয়দেবতা বিষয়রূপ ত্রিপুটি ও মস্তকাদি অঙ্গ মনোময়।

তৈজসের ভোগ সূক্ষ্ম। সুখ ও দুঃখের জ্ঞানকে ভোগ বলে। ভোগ যদিচ স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম হইতে পারে না, তথাপি বাহ্য শব্দাদি বিষয়ের সম্বন্ধ দ্বারা যে সুখ ও দুঃখের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে ভাষার ব্যবহারে স্থূল বলা যায় এবং মানস শব্দাদির সম্বন্ধ দ্বারা যে ভোগ হয়, তাহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়।

এই জন্য, বেদে বিশ্বকে স্থূলের ভোক্তা বলে এবং তৈজসকে সূক্ষ্মের ভোক্তা বলে। তৈজসের ভোগ্য শব্দাদি বিষয় মানস অতএব সূক্ষ্ম। তাহার অপেক্ষায় বিশ্বের ভোগ্য বাহ্য শব্দাদি বিষয় স্থূল।

বিশ্ব বহিঃপ্রজ্ঞ। তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ। বিশ্বের অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ প্রজ্ঞা বহির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে। অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা বাহিরের পদার্থ অনুভব করি। তৈজসের অন্তঃকরণবৃত্তি বহির্দ্দেশ গমন করে না।

তৈজস, হিরণ্যগর্ভ ও উকারের অভেদ চিন্তন।

যেমন বিশ্ব ও বিরাটের মধ্যে অভেদ সেইরূপ তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের মধ্যে অভেদ। তৈজসের সূক্ষ্ম উপাধি। হিরণ্যগর্ভেরও সূক্ষ্ম উপাধি। এই জন্য দুয়ের একতা জানিবে। তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের একতা অবধারণ করিয়া পরে ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা উকারের সহিত তাহাদিগের অভেদ চিন্তা করিবে। আত্মার চারি পাদের মধ্যে দ্বিতীয় পাদ তৈজস। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ। ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার। দ্বিতীয়তা তিনের সমান ধর্ম্ম। এই জন্য তিনের একতা চিন্তন করিবে।

প্রাজ্ঞ, ঈশ্বর ও মকারের অভেদ।

প্রাজ্ঞকে ঈশ্বররূপে জানিবে। প্রাজ্ঞের কারণ উপাধি। ঈশ্বরেরও কারণ উপাধি। ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়ই তৃতীয় পাদ। ওঁকারেরও তৃতীয়

মাত্রা মকার। তৃতীয়তা তিনের সমান ধর্ম্ম। এই জন্য তিনের একতা চিন্তা করিবে।

প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞান ঘন। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল জ্ঞান, সুষুপ্তি অবস্থায় তাহা ঘন হইয়া এক অবিদ্যারূপ হইয়া যায়। এই জন্য প্রাজ্ঞকে প্রজ্ঞান ঘন বলে। শ্রুতিতে প্রাজ্ঞকে আনন্দভুক্‌ও বলিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত আনন্দ ভোগ করে।

তৈজস ও বিশ্বের ভোগ ত্রিপুটি দ্বারা হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রাজ্ঞের ভোগেও ত্রিপুটি আছে। চেতনের প্রতিবিম্ব সহিত অবিদ্যার বৃত্তি, অধ্যাত্ম। অজ্ঞান দ্বারা আবৃত স্বরূপানন্দ অধিভূত। ঈশ্বর অধিদৈব।

এই রীতি অনুসারে, বিশ্ব বহিঃপ্রজ্ঞ, তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ, ও প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞান ঘন।

উপাধিকৃতভেদ ও বাস্তব অভেদ।

পূর্ব্বে যে ভেদ বলা হইয়াছে, তাহা উপাধি কর্ত্তৃক। বিশ্বের স্থূল, সূক্ষ্ম ও অজ্ঞান এই তিন উপাধি। তৈজসের সূক্ষ্ম ও অজ্ঞান এই দুই উপাধি। প্রাজ্ঞের এক অজ্ঞান উপাধি। উপাধির ন্যূনতা ও অধিকতা অনুসারে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞের ভেদ। কিন্তু পরমার্থতঃ, ইহাদিগের স্বরূপের অভেদ।

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনের অনুগত যে চেতন আছেন, তিনি পরমার্থতঃ তিন উপাধিরই সম্বন্ধ হইতে রহিত।

এই তিন উপাধির যিনি অধিষ্ঠান, তিনি তুরীয়। তুরীয় বহিঃপ্রজ্ঞ নহে, অন্তঃপ্রজ্ঞ নহে, প্রজ্ঞান ঘন নহে। তুরীয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, বুদ্ধির বিষয় নহে, কোনও শব্দের বিষয় নহে। তুরীয় পরমাত্মার চতুর্থ পাদ।

ঈশ্বর সাক্ষী ও শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ।

এই রীতি অনুসারে আত্মার দুই স্বরূপ। এক পরমার্থরূপ, এক অপরমার্থরূপ। তিন পাদ অপরমার্থরূপ। এক পাদ তুরীয় পরমার্থরূপ। যেমন আত্মার দুই স্বরূপ, সেইরূপ ওঁকারেরও দুই স্বরূপ। অকার, উকার ও মকার এই তিন মাত্রারূপ বর্ণ অপরমার্থরূপ। আর এই তিন মাত্রার ব্যাপক, "অস্তি ভাতি প্রিয়"রূপ অধিষ্ঠান চেতন পরমার্থরূপ। ওঁকারের পরমার্থরূপকে শ্রুতিতে "অমাত্র" বলে। পরমার্থস্বরূপে মাত্রার বিভাগ নাই, এই

জন্য তাহাকে অমাত্র বলে। দুই স্বরূপবিশিষ্ট ওঁকার, দুই স্বরূপবিশিষ্ট আত্মা হইতে অভিন্ন।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চ সহিত বিশ্ব ও বিরাট্ অকার হইতে অভিন্ন। আত্মার চারি পাদের মধ্যে বিশ্ব আদি, ওঁকারের মাত্রার মধ্যে অকার আদি। এই জন্য দুই এক। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সহিত হিরণ্যগর্ভরূপ তৈজসকে উকার রূপ জান। তৈজস দ্বিতীয়, উকারও দ্বিতীয়। কারণ উপাধি সহিত ঈশ্বররূপ প্রাজ্ঞকে মকাররূপ জান। যেমন ঈশ্বররূপ প্রাজ্ঞ তৃতীয়, সেইরূপ মকারও তৃতীয়। এই তিনে অনুগত, পরমার্থরূপ তুরীয়, ওঁকারের তিন মাত্রায় অনুগত পরমার্থরূপ অমাত্র। যেমন বিশ্বাদিতে তুরীয় অনুগত, সেইরূপ অকারাদিতে অমাত্র অনুগত।

এইরূপে একতা অনুভব করিয়া, লয় চিন্তন করিবে।

লয় চিন্তনের প্রকার।

বিশ্বরূপ অকার তৈজসরূপ উকার হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু উকার রূপই। এইরূপ চিন্তনকে লয় বলে। অকারকে উকারে লয় করিয়া, তৈজসরূপ উকারকে প্রাজ্ঞরূপ মকারে লয় কর। তাহার পর প্রাজ্ঞরূপ মকারকে তুরীয়রূপ অমাত্রে লয় কর। স্থূলের উৎপত্তি সূক্ষ্ম হইতে, ও স্থূলের লয় সূক্ষ্মে। সেই জন্যই বিশ্বরূপ অকারের তৈজসরূপ উকারে লয় হয়। সূক্ষ্মের উৎপত্তি ও লয় কারণে হয়। এই জন্য তৈজসরূপ উকারের প্রাজ্ঞরূপ মকারে লয় হয়।

বিশ্ব আদি দ্বারা এখানে সমষ্টি বিরাট্ আদি ও ত্রিপুটি সকলও গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাজ্ঞরূপ মকারকে তুরীয়রূপ অমাত্রে অবশেষে লীন করিতে হয়। তুরীয় ব্রহ্মরূপ। শুদ্ধ ব্রহ্মে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ দুই-ই কল্পিত। যে যাহাতে কল্পিত হয়, তাহাই তাহার স্বরূপ। এই জন্য প্রাজ্ঞরূপ মকারের অমাত্রে লয় সঙ্গত।

তাহার পর আমিই সেই অমাত্র, একাগ্রচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিবে। স্থাবরজঙ্গমরূপ, অসঙ্গ, অদ্বয়, অসংসারী, নিত্যমুক্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মরূপ ওঁকারের পরমার্থ স্বরূপ—সে আমিই, এইরূপ চিন্তা দ্বারা জ্ঞানের উদয়

হয়। ওঁকারের নির্গুণ উপাসনা জ্ঞান দ্বারা মুক্তি ফল প্রদান করে। এই জন্য ইহা সর্ব্বোত্তম উপাসনা।

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
হ্যুকারক স্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞমকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং নতু তত্ত্বতো ভবেৎ॥
বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়ে
দুকার মধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয় বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমম্॥
মকারমপ্যাত্মনি চিদ্বনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তিম
দ্বিজ্ঞানদৃঙ্মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ॥

অবৈধ বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হিন্দু শাস্ত্রে

মনুমতে বিবাহ নিষেধ।

মাতৃসপিণ্ডা (৭ পুরুষ), পিতৃগোত্রজা বিবাহ করিবে না। জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূন্য, বেদ পাঠ বর্জ্জিত, কন্যাপ্রসবকারী, দীর্ঘ বহুল নামযুক্ত, অর্শো রোগগ্রস্ত, রাজ-যক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র, মন্দানল ও কুষ্ঠরোগযুক্ত—এই দশটী বংশের কন্যা বিবাহ্যা নহে।

লোমশূন্যা, বহুলোমযুক্তা, বহু পরুষভাষিণী, পিঙ্গলাক্ষী, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প, দাস ও ম্লেচ্ছ—এই সমস্ত নামে নামিতা কন্যা বিবাহ করিবে না।

ব্যাসমতে—যে বংশে সাংক্রামিক রোগ বা দোষ আছে তাদৃশ বংশ-জাতা, পণগ্রহণ দোষে দূষিতা, সমান-প্রবরা, মাতৃসপিণ্ডা, পিতৃসপিণ্ডা,

অন্যপূর্ব্বা, স্থূলাঙ্গী, দুর্লক্ষণা, ও যাহার পিতৃপিতামহাদি দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত নহে, এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

শাঙ্খমতে—সমান প্রবরা, স্বগোত্রজা, মাতৃপক্ষের পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা বিবাহ করিবে না।

লিখিত মতে—যাহার সহোদর বা বৈমাত্রেয় নাই পিতাও জ্ঞাত নহে, তাহাকে বিবাহ করিবে না।

রঘুনন্দন মতে—

(পিতৃপক্ষ)

১। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ও তৎপিতা ইহাদিগের প্রত্যেকের সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে না।

(মাতৃপক্ষ)

২। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ ইহাদিগের প্রত্যেকের পঞ্চমীকন্যা বিবাহ করিবে না।

(পিতৃবন্ধু)

৩। পিতার পিসতুত ভাই, মাসতুত ভাই ও মামাত ভাই ইহাদিগের অধস্তন গণনায় সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে না।

(মাতৃবন্ধু)

৪। মাতার মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই ও মামাত ভাই ইহাদিগের অধস্তন গণনায় পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করিবে না।

৫। মতান্তরে পিতৃপক্ষে পঞ্চমী ও মাতৃপক্ষে তৃতীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না।

৬। বিমাতার ভ্রাতার কন্যা ও সেই কন্যার কন্যাকেও বিবাহ করিবে না।

৭। উক্ত নিষিদ্ধ কন্যা ত্রিগোত্রাপ্তরিতা হইলে বিবাহ করিতে পারে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

পুণ্য, পৌষ ১৩০৭। বহুদিন পূর্ব্বে হুতুম বলিয়াছিলেন যে বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারিষ লূচীর ময়দা। এখন বেদের সেই অবস্থা। যখন বেদের অনুবাদ হয় নাই তখন এ সব বালাই ছিল না। এখন ইংরেজী অনুবাদ আবার রমেশের বাঙ্গালা অনুবাদ স্ত্রী শূদ্র বালক সকলেই এখন বেদজ্ঞ সুতরাং বেদ এখন ছড়াছাঁড়ি। পুণ্যে আবার কল্পনার ভিয়ান চড়িয়াছে, মাসের-উৎপত্তি অগ্নির অর্থ কি, এ সব হইয়া গিয়াছে, এখন পিতৃগণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। "অগ্নি বা অগ্ন্যুপাধিক ঋষিদিগের অধিকাংশই প্রায় পিতৃসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন" আর লেখক সেই সময় দোতালার জানালা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছিলেন। কস্মাৎ? "তাই তর্পণের প্রধান মন্ত্রে অগ্নি স্থাপনা পূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহণ করিবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়" য়ুরোপ খণ্ডে পূর্ব্বে কেবলই প্রাতঃকাল ছিল, মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ প্রভৃতি ছিল না। তাই আজিও য়ুরোপ বাসীর (অবশ্য টর্কি ছাড়া) পরস্পরের দেখা হইলে গুড মর্ণিং বলিয়া থাকেন। পুণ্য যদি এইরূপ বেদমন্ত্রের যা-ইচ্ছে তাই মানে করেন, তবে ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবেন। আপনিই ভুগিবেন। সাহিত্যে ব্যভিচারের দণ্ড রোমরাজ্যে ছিল, আমাদের নাই তাই দুকথা বলিতে হয়, আর বুড়া জ্যেঠারই এই সব অধিকার। "এই বিশাল জগতের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের প্রাণের মধ্যে শান্তি ছড়াইতেছে—যে মহান্ ছন্দে গ্রথিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রেরা নীরবে নিঃশব্দে নিজের কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, সেই শান্তিময়ী ছন্দোময়ী ধ্বনির নামই গান" কিছুই বুঝিলাম না—শেলির পোইট্রী ইহা অপেক্ষা সহজ। যদি Music of the Sphere লেখক মনে রাখিয়া থাকেন তবে সব ভাসিয়া গিয়াছে। "বাল্যবিবাহের অশুভ ফল" আমেরিকার নজীরের উপর। লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রবন্ধ ২৫ ছত্র। শোভাবাজারের রাজবাটীতে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে একবার একটি সভা হইয়াছিল। জজ গুরুদাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অমৃতলাল রায়, মনোমোহন বসু, গোপাল-চন্দ্র মুখো, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো, বিষ্ণুপদ চট্টো প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেন।

৺গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় সপুত্র উপস্থিত ছিলেন। কে একজন ইংরেজী-নবিশ বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ একটা কটাক্ষ করেন। গঙ্গাচরণ বাবু উঠিয়া বলিলেন "আমি একজন বাল্যবিবাহকারী আর ফলের কথা কি আর বলিব? আমার পুত্র শ্রীমান অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাবাজী এই আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন" সভায় একটা হো হো হাসি পড়িয়া গেল। দেখিতেছি একটু আদরে, একটু পুণ্যে ছেলেটির মাথা ঘুরিয়াছে। সংক্রামক মাসিক সাহিত্য সমালোচন রোগ পুণ্যকে ধরিয়াছে আর পুণ্য একেবারে কেউটে ধরিয়াছে। সমালোচন করিয়াছেন নব্যভারত, সাহিত্য, "অন্তঃপুরে"র রন্ধ-নের কথা প্রকাশ হইয়াছে। পুণ্য সমালোচনায় বলিতেছেন "অন্তঃপুরে লিখিত প্রণালী অনুসারে পেয়ারার জেলি প্রস্তুত করিতে গেলে কখনই কৃত-কার্য্য হইবেন না।" কেন? বীচি ফেলায় একটু গজগজানি। এবার সম্পাদিকায় সম্পাদিকায়—আমরা তফাৎ কি জানি যদি নারদের নাম আসিয়া পড়ে।

অন্তঃপুর, চৈত্র। চৈত্র মাসের বাকী এক ফর্ম্মা বৈশাখে যাইবে। বনলতা আর নাই। এখন হেমন্তকুমারী চৌধুরী সম্পাদিকা। সম্প্রদায়ের খাতিরে যাহাই হোক, চৌধুরী বলিলে সম্পাদক আর সম্পাদিকা বলিলে চৌধুরাণী বলা কি সঙ্গত নয়? যাহাহোক পুণ্য-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিনাম "সম্পাদিকায় সম্পাদিকায়" তাহার একটু ভুল বাহির হইয়াছে। জনৈক অন্তঃপুর পাঠিকা "সমালোচন খাটি নয়" বলিয়া পুণ্য-সমালোচনার সমালো-চন করিতেছেন। দেখি আমাদেরই কথা। শুনিবেন "* * কখনই কৃত-কার্য্য হইবেন না" পুণ্য সম্পাদিকা কেন যে এরূপ দম্ভের সহিত বলিয়াছেন, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করিলেন না। সুতরাং সম্পাদিকার ভুল সংশোধন করিয়া দিতে পারিলাম না।" আবার বীচি ফেলিবার সম্বন্ধে "প্রশ্ন এই যে পুণ্য সম্পাদিকা কি বলিতে চাহেন যে পেয়ারার জেলি প্রস্তুত করিতে বীচিগুলিরও প্রয়োজন হইয়া থাকে? * * আলুর দমের বিষয় লিখিতে গিয়া আলুর খোসার দ্বারা যে সুখাদ্য চড়চড়ি বা ভাজা হইতে পারে, তাহার বিষয় লিখিতে হইবে।" "কাগজে লিখিয়া যাঁহারা পাচিকা-রূপে সুপরিচিতা হইতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট রন্ধনকার্য্য বড়ই একটা মহাব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের

পক্ষে তাহা নহে।” আমি বলিলাম, এরূপ ভাল নহে। আসীন বন্ধু বলিলেন “রও—স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা দিয়াছ, মেয়ে-প্রভাকর ও মেয়ে-গুড়গুড়ে নেবে না? বাধা দিওনা, যে দারুণ গ্রীষ্ম আমাদের ত সম্বল চাই।” আমি নিরুত্তর—“ভালবাসা” (এমন সময় আর কি করি?) বেশ বলিয়াই নিষ্ক্রান্ত।

সাহিত্য, চৈত্র। এবারকার সাহিত্য নরমসুরে জংলা। আসামের রঙ্গপুর, মন্দির-পথে, রাণাড়ে এ সব এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া যায়। মাসিক পত্রের একটা গাম্ভীর্য্য আছে—সংবাদ পত্রে তাহা নাই। সেটার অভাব হইলে মাসিক পত্রের যেন হাল্ থাকে না। বিচিত্রতার অভাব মিটাইতে অপর দোষ বর্ত্তায়। সংবাদ পত্র জজ রাণাড়ের কথা লিখিয়াছেন। মাসিকে রাণাড়ের কথা আলোচনা করিতে গেলে গভীর আলোচনা করিতে হইবে। একবার অহিন্দুর চোখে দেখিতে হইবে, একবার হিন্দুর চোখে দেখিতে হইবে কেন না শেষ দশায় তিনি সমাজ সংস্কার করিবার জন্য কংগ্রেসের লাঙ্গুল ধরিয়া বেড়াইতেন। যিনি বাল্যবিবাহ মন্দ, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতা ভাল বলেন, আমরা হিন্দুর চক্ষে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি—মনে করি তিনি না জানিয়া না বুঝিয়া হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। ইহাতে গোঁড়ামির কথা কিছুই নাই। সাবিত্রীর রাজ্যে কখনও বিধবাবিবাহ হইতে পারে? আমরা একজন মলভারীকে উপেক্ষা করিতে পারি কিন্তু রাণাড়েকে উপেক্ষা করিতে পারি না। একজন হিন্দুর আচার রাখেন নাই আর জন হিন্দুর আচার রাখিয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলেন।

ভারতী, চৈত্র। এবারকার ভারতী ভাল। অনেকগুলি ভাল প্রবন্ধ আছে। মানুষের ক্ষুদ্রত্ব, নারীজাতির অধিকার, পাঠান প্রজা, নাম করিলাম। “আমাদের দেশে স্ত্রীলোক ব্যবসা করিতে পারেন। * * কাব্যকার ও গদ্যলেখিকা হইতে পারেন, দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।” এই গুলা লাগে।

সোণা বাহিরে।

পূর্ণিমার রামপ্রসাদের উপর টান দেখিতে পাই তজ্জন্য এই কয় ছত্র পূর্ণিমাতেই প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিলাম।

এখন একটা ফ্যাসান হইয়াছে, বিদেশীয় ভাষা হইতে অনুবাদ করা। কেবলমাত্র এইটাই যে ফ্যাসান আর অপর কিছু নাই তাহা বলিতেছি না। এই এখনকার ফ্যাসান হইতেছে, কোন কাজ না থাকিলে মাসিক পত্র প্রকাশ করা; আরও কাজ না থাকিলে পরের কাগজ সমালোচন করা; আরও ফ্যাসান যে কোন প্রকারে একটি ছোট গল্প লেখা; আর যে কোন লেখাই হৌক না কেন তাহার মধ্যে “অনূদিত” আর “মুখরিত” কথাটা লাগান—তা কোকিলকুহরে মুখরিতই হোক আর মতের মার ঝাঁটার সপ্-সপানিতেই হোক।

বিদেশী ভাষার বিদেশী লেখকের উৎকৃষ্ট লেখা হইতে ভাবানুবাদ যে একেবারে মন্দ তাহা বলিতেছি না। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, রেবঃ লালবেহারী দের “বেঙ্গল ম্যাগাজিন” নামক ইংরেজী মাসিক পত্র ১৮৭২ সালে বাহির হয়। তাহাতেই এই ব্যাপারটার বিশেষরূপে অনুশীলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তখন সেই কাগজে লিখিতেন। তিনিও এইরূপ অনুবাদ করিতেন; কিন্তু তরুদত্ত অরুদত্ত দুই ভগিনী যেরূপ অনুবাদ-কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, সেরূপ আর কোন কবি করেন নাই। তাঁহারা পিতার সঙ্গে অনেক দিন ফ্রান্সে বাস করিয়াছিলেন, ইতালী ও জার্ম্মানিতেও গিয়াছিলেন। ইঁহারা ফরাশিশ, ইতালীয় ও জার্ম্মান ভাষার বড় বড় লেখকের লেখা হইতে কবিতায় অনেক মর্ম্মানুবাদ ও ভাবানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা মনে করি বর্ত্তমান সময়ে এই প্রথাটা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অগ্রে দেশীয় দ্রব্যাদিতে ঘর সাজাইয়া তবে ত বিদেশীয় দ্রব্য বৈঠকখানায় আনিতে হয়। ঢিল ছুড়িবার পাঁচটা যন্ত্র থাকে তবে ত একটা বুমারাং আনা যাইতে পারে। আমাদের ভাষায়, গবেষণা দ্বারা এখন জানা গিয়াছে যে, চারি শত বৎসরেরও পুরাতন লেখা আছে ও অনেক দিনের পুরাতন গদ্য লেখাও আছে। এখন দিন দিন নূতন নূতন লেখকের নাম

TORN PAGES.

শুনিতেছি। এই সে দিন বনমালীদাসের "জয়দেব চরিত" পাঠ করিয়া একেবারে মুগ্ধ ও অবাক্ হইয়াছিলাম। তাই বলিতেছি যে আগে ঘর সারা উচিৎ। উদাহরণস্বরূপ আজ একটি কথা বলিব—

রামপ্রসাদ "কালীকীর্ত্তন" "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিন্তু সাধারণ্যে সে সকলের তত প্রচার নাই, এমন কি অনেক সাহিত্যানুরাগীও নাম মাত্র শুনিয়াছেন কখনও দেখেন নাই বা পাঠ করেন নাই। আমিও এতদিন ভাল করিয়া পাঠ করি নাই। সে দিন কালীকীর্ত্তন পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম ও যথেষ্ট আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। সেই আনন্দের ছিটাফোঁটা পাঠক পাঠিকাকে দিবার জন্য অদ্য এই আয়াস। আমি সমালোচন করিতে গিয়া মাটী করিব না, কেবল বলিয়া রাখি স্বাভাবিক স্বর্গীয় পবিত্র চিত্রটি একটু মনোযোগসহ দেখিবেন। ভক্তির শেড্ বড় গাঢ়। বার বার পড়িলে বার বার নূতন রসের নূতন ভাবের অনুভূতি হয়। বাস্তবিকই প্রসাদের ভাষায় "ভবজলধি নিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-করণ-কারণ ভুবনপালিকা কালিকার লীলা বর্ণন।"

বাল্যলীলা।

[গৌরচন্দ্রী]

গিরিবর আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগণে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসি গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটী শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥
প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে বারে ডাকে রাণী, জননি জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি,
আগত ভানু রজনী চলে যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিবায়॥
উঠ উঠ প্রাণ গৌরি, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি, [উঠ গো]
উদয়তে দিনকৃতী, নলিনী বিকশতি,
এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি॥
সুত মাগধবন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়ন্তি,
নিদ্রাং জহিহি জহিহি জহিহি,
গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণ দৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশ।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান্ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন* সঙ্গে তিন চারিটি ব্রাহ্ম ভক্ত। পরমহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইঁহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। রবিবারেই বেশী লোকসমাগম হয়। যে সকল ভক্তেরা একান্তে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহারা প্রায় অন্য দিনেই আসেন।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট। বিজয়, বলরাম, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা, পশ্চিমাস্য হইয়া, তাঁহার দিকে মুখ করিয়া, কেহ মাদুরের উপর, কেহ শুধু মেজের উপর, বসিয়া আছেন। তাঁহারা, ঘরের পশ্চিম দিকের দ্বারমধ্য দিয়া, ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন। শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী। দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারান্দা, তৎপরেই পুষ্পোদ্যান, তার পর পোস্তা। পোস্তার পশ্চিম-গায়ে পুণ্যসলিলা কলুষহারিণী গঙ্গা, যেন ঈশ্বর-মন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে যাইতেছেন।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে গরম কাপড়। বিজয়, শূলবেদনায় দারুণ যন্ত্রণা পান; তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ-সেবনের সময় হইলে খাইবেন। বিজয়, এখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন বেতনভোগী আচার্য্য। সমাজের বেদীর উপর বসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে হয়। তবে এখন সমাজের সহিত নানা বিষয়ে মতভেদ হইতেছে। কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন—স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা বা কার্য্য করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অদ্বৈত গোস্বামীর বংশে

*অগ্রহায়ণ, শুক্লাচতুর্থী তিথি। বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ সাল।

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতগোস্বামী জ্ঞানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন; আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি, ভগবান্ চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহারা হইতেন যে, নৃত্য করিতে করিতে পরিধান-বস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন; কিন্তু মহাভক্ত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীঅদ্বৈতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল; শরীর মধ্যস্থিত হরি-প্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ, কেবল কাল-প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি, ভগবান্ রামকৃষ্ণের দেবদুর্ল্লভ হরি-প্রেমে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধুরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরি-প্রেমে বালকের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন, বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন। একটী ছোক্‌রা, নাম বিষ্ণু, এঁড়েদয়ে বাড়ী, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছে; প্রথমে আজ তাহারই কথা হইতেছিল।

(সংস্কার ও শেষ জন্ম।)

শ্রীরামকৃষ্ণ।—(বিজয়, মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) দেখ, এই ছেলেটী শরীর ত্যাগ করেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হ'য়ে রয়েছে। এখানে আস্‌তো, স্কুলে পড়্‌তো, কিন্তু বল্‌তো—সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল—সেখানে নির্জনে, মাঠে, বনে, পাহাড়ের কাছে সর্ব্বদা ব'সে ধ্যান ক'র্‌তো। ব'লেছিল যে, কত কি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কর্‌তো।

"বোধ হয়—শেষ জন্ম। পূর্ব্বজন্মে অনেক কাজ করা ছিল, একটু বাকী ছিল, সেইটুকু বুঝি এবার হ'য়ে গেল।

"পূর্ব্বজন্মের সংস্কার মান্‌তে হয়। শুনেছি—এক জন শব-সাধন ক'রছিল, গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা কর্‌ছিল। কিন্তু সে অনেক বিভীষিকা দেখিতে লাগ্‌লো; শেষে তাকে বাঘে নিয়ে গেল। আর এক জন, বাঘের ভয়ে, নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে, শব ও অন্যান্য পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে, নেমে এসে আচমন ক'রে শবের

উপর ব'সে গেল। একটু জপ কর্‌তে কর্‌তে, মা সাক্ষাৎকার হ'লেন ও ব'ল্লেন, 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, তুমি বর নাও।' সে ব্যক্তি মার পাদপদ্মে প্রণত হ'য়ে ব'ল্লে 'মা, একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়েছি। যে ব্যক্তি, এত খেটে, এত আয়োজন ক'রে, এতদিন ধ'রে তোমার সাধন করছিল; তা'কে তোমার দয়া হলো না! আর আমি, কিছু জানিনা-শুনিনা, ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার উপর এত কৃপা হ'লো।' ভগবতী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন 'বাছা তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নাই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা কর্‌ছিলে, সেই সাধন-বলে তোমার এরূপ জোট্‌পাট্ হয়েছিল, তাই আমার দর্শন পেলে। কি বর চাও।'

(মুক্তপুরুষ ও শরীর-ত্যাগ।)

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা করেছে শুনে, ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা, মহাপাপ। ফিরে ফিরে সংসারে আস্‌তে হবে, আর এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে থাকে, আর তা হ'লে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে শরীরত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পরও কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটীর ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটীর ছাঁচ রাখতেও পার, আবার ভেঙ্গে ফেল্‌তেও পার।

"অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আস্‌তো, উমের কুড়ি বছর হবে। যখন এখানে আস্‌তো, তখন এত ভাব হতো যে, হৃদয় ধ'রতে হতো, পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোক্‌রা, একদিন ব'ল্লে, আর আমি আসতে পারবো না, তবে আমি চল্লুম। কিছুদিন পরে শুন্‌লুম যে, সে শরীর ত্যাগ ক'রেছে।

(মুক্তজীব ও বদ্ধজীব।)

"জীব চার থাক ব'লেছে—১। বদ্ধজীব, ২। মুমুক্ষুজীব, ৩। মুক্তজীব, ৪। নিত্যজীব।

সংসার যেন জালের স্বরূপ, জীব যেন মাছের স্বরূপ, ঈশ্বর (যাঁর মায়া এই সংসার) তিনি যেন জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলা

জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষু জীব বলা যায়। যারা পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে তারা সকলেই পালাতে পারে না। দুই চারটা মাছ ধপাঙ শব্দ ক'রে পালায়। তখন লোকেরা বলে,'ঐ মাছটা বড় পালিয়ে গেল!' এই দু'চারটা লোক—মুক্তজীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবতঃ এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসারজালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে; অথচ এ বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মর্‌তে হবে। তারা, জালে পড়েই জালশুদ্ধ চোঁচা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকাবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই, বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব। যাতে এরা আছে, মনে করে—'আমরা হেথায় বেশ আছি।' বদ্ধজীব, সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্কসাগরে মগ্ন হ'য়ে রয়েছে; কিন্তু মনে করে যে, বেশ আছি। যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না, তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সে রকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।

(বদ্ধজীবের লক্ষণ।)

"বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

"উট্ কাঁটাঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়া রক্ত দর্‌দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটাঘাসই খাবে, কোন মতে ছাড়বে না। দেখ, সংসারীলোক এত শোকতাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী ম'রে গেল, কি অসতী হ'লো, তবু আবার বিয়ে ক'রবে। ছেলে ম'রে গেল, কত শোক পেলে, কিন্তু কিছু দিন পরেই বাপ-মা সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, সেই আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধ্‌লো, গয়না পর্‌লো, ভাল কাপড় পর্‌লো। মেয়ের বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হ'লো, আবার বছরে বছরে মেয়ে-ছেলে হতে লাগ্‌লো। মোকদ্দামা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দামা করে। যা ছেলে হয়েছে, তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্‌তে পারে না; আবার বছরে বছরে ছেলে হয়।

আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও পারে না, আবার উগ্‌রাতেও পারে না। বদ্ধজীব হয় ত বুঝ্‌ছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটী আর চামড়া। তবু ছাড়্‌তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

"কেশব সেনের খুড়া, পঞ্চাশ বছর বয়স—দেখি তাস্ খেল্‌ছে! যেন ঈশ্বরের নাম কর্‌বার সময় তখনও হয় নাই!

"বদ্ধজীবের আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, যদি সাধুসঙ্গে রাখা যায়, তাহলে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার, বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখো, তাহলে মরে যাবে।

(তীব্র বৈরাগ্য।)

বিজয়। মহাশয়, বদ্ধজীবের—সংসারীজীবের—মনের কি অবস্থা হ'লে মুক্তি হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি ঈশ্বরের কৃপায় কা'রও তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহ'লে এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। তবেই এই সংসার থেকে মুক্তি হ'তে পারে। (বিজয়ের প্রতি) তীব্র বৈরাগ্য কা'কে বলে? হ'চ্চে, হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক; এ সব মন্দ বৈরাগ্য, যার তীব্র বৈরাগ্য, তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল; মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান বৈ আর কিছু চায় না; সংসারকে পাতকুয়া দেখে; মনে হয় বুঝি ডুবে গেলুম। আত্মীয়দের কাল্‌-সাপ্ দেখে, কাছথেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও। বাড়ীর বন্দোবস্ত করি, তারপর ঈশ্বরচিন্তা ক'রবো—একথা ভাবেই না, ভিতরে খুব রোক্।

"তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে একটা গল্প শোনো। একদেশে অনাবৃষ্টি হ'য়েছে। চাষারা সব, খানা কেটে দূর থেকে জল আন্‌ছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রলে—যতক্ষণ না জল আসে, যতক্ষণ না খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান ক'রবার বেলা হ'লো। চাষার গৃহিণী মেয়ের

হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে ব'ল্লে 'বাবা বেলা হ'য়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল। সে ব'ল্লে 'তুই যা আমার এখন কাজ আছে'। তারপর, বেলা দুই প্রহর ১টা হ'লো, তখনও চাষা মাঠে কাজ ক'চ্চে। স্নান ক'রবার নামটী নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে ব'ল্লে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল কর্‌বে, কি খেয়েদেয়েই ক'র্‌বে।' গালাগালি দিয়ে, চাষা, কোদাল হাতে ক'রে তাকে তাড়া কল্লে, আর ব'ল্লে—তোর আক্কেল নেই, বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হ'লো না, এবার ছেলেপিলে কি খাবে? না খেয়ে যে সব মারা যাবে! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—মাঠে আজ জল আন্‌বো তবে নাওয়া খাওয়ার কথা কবো।' তার স্ত্রী গতিকগাতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা বরাবর সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে, সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ ক'রে দিল। তখন একধারে ব'সে দেখ্‌তে লাগ্‌লো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল ক'রে আস্‌চে। তার মন তখন শান্ত ও আনন্দে পূর্ণ হ'লো। তখন বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বল্লে 'নে এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ'। তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে নেয়ে খেয়ে, সুখে ভোঁস্ ভোঁস্ করে নিদ্রা যেতে লাগ্‌লো। চাষার এই রোক্ তীব্র বৈরাগ্যের উপমা।

"আর একজন চাষা সেও মাঠে জল আন্‌ছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বল্লে 'অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই; তখন সে, বেশী উচ্চবাচ্য না করে, কোদাল রেখে স্ত্রীকে ব'ল্লে 'তুই যখন বল্‌ছিস তো চল্ (সকলের হাস্য)। সে চাষার আর মাঠে জল আনা হ'লো না। এটী মন্দ বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক্ না হলে, চাষার যেমন মাঠে জল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না।

(দাসত্ব ও কামিনী।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) তুমি বল্‌চ আমি স্বাধীন নই। কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্য পরের দাসত্ব ক'রতে হয়। স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের মত কাজ কর্‌তে পার না।

"জয়পুরে গোবিনজীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তারা

তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই। বলেছিল 'রাজাকে আস্‌তে বল'। তারপর রাজা আর পাঁচজনে, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য আর কাহাকেও ডাকাতে হলো না। নিজে নিজেই সব গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ, আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছি, ধারণ করুন্'। কাজে কাজেই আস্‌তে হয়; আজ ঘর তুল্‌তে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ ছেলের হাতে খড়ি, এই সব।

"বারশো ন্যাড়া আর তেরশো নেড়ী, তার সাক্ষী উদম্ সাঁড়ী' এ গল্প তো জান। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো ন্যাড়াশিষ্য ছিল। তারা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল, তখন বীরভদ্রের ভয় হলো। তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন 'এরা সিদ্ধ হলো; লোক্‌কে যা বল্‌বে তাই ফল্‌বে; যে দিক দিয়ে যাবে সেই দিকেই ভয়; কেন না লোক না জেনে যদি অপরাধ করে, তাদের অনিষ্ট হবে'। এই ভেবে, বীরভদ্র তাদের ডেকে বল্লেন, 'তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে এস।' ন্যাড়াদের এত তেজ যে ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁস নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে, তবু ধ্যান ভাঙ্গে না। তেরশোর মধ্যে একশো বুঝেছিল—বীরভদ্র কি বল্‌বেন, গুরুর বাক্য লঙ্ঘন কর্‌তে নাই, তাই তারা স'রে পড়্‌লো, আর বীরভদ্রের সঙ্গে দেখা কল্লে না। বাকী বারশো দেখা কর্‌লে। বীরভদ্র বল্লেন 'এই তেরশো নেড়ী তোমাদের সেবা কর্‌বে। তোমরা এদের বিয়ে কর।' ওরা বল্লে যে আজ্ঞা; কিন্তু আমাদের মধ্যে একশো জন কোথায় চলে গেছে।' ঐ বারোশোর এখন প্রত্যেকের সেবাদাসী সঙ্গে থাক্‌তে লাগ্‌লো। তখন আর সে তেজ নাই, সে তপস্যার বল নাই। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকাতে আর সে বল রহিল না; কেন না সে সঙ্গে স্বাধীনতা লোপ হয়ে যায়। (বিজয়ের প্রতি) তোমরা নিজে নিজে তো দেখ্‌ছো পরের কর্ম্ম স্বীকার করে কি হয়ে রয়েছ? আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরাজী পড়া পণ্ডিত, সাহেবের চাকরী স্বীকার করে তাদের বুট জুতোর গোঁজা দুবেলা খায়। এর কারণ কেবল "কামিনী" বিয়ে করে নদেরহাট বসিয়ে, এখন আর তোলবার যো নাই, তাই অত অপমান, দাসত্বের যন্ত্রণা!

(কামিনী ও ঈশ্বর লাভ।)

যদি একবার এইরূপ তীব্র বৈরাগ্য হয়ে ঈশ্বর লাভ হয়, তাহলে আর মেয়েমানুষে আশক্তি থাকে না—আর মেয়েমানুষের ভয় থাকে না। যদি একটা চুম্বকপাথর খুব বড় হয় আর একটা সামান্য হয়, তাহলে লোহাকে কোনটা টেনে লবে? বড়টাই টেনে নেবে। ঈশ্বর বড় চুম্বুকপাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বুকপাথর কি কর্‌বে?

একজন ভক্ত। মহাশয় মেয়েমানুষকে কি ঘৃণা কর্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তিনি কামিনীকে আর অন্য চক্ষে দেখেন না যে ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) তুমি মাঝে মাঝে আস্‌বে, তোমাকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা করে।

(আচার্য্য ও আদেশ; lecture.)

বিজয়। আমি স্বাধীন নই, ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্‌তে হয়, তাই সদা-সর্ব্বদা আস্‌তে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) দেখ আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, সে উপদেশ লোকে শুন্‌বে না, সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে বা যে কোনরূপে হো'ক ঈশ্বরকে লাভ কর্‌তে হয়, তারপর আদেশ পেয়ে lecture দিতে হয়। অমনি অমনি lectureএ কি ফল হবে?

"ওদেশে একটী পুকুর আছে, নাম হালদারপুকুর। তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে করে রাখ্‌ত পরদিন সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো তাঁরা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল কর্‌তো। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হতো না—আবার তার পরদিন সেই পাড়ে বাহ্যে। শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটীস টাঙ্গিয়ে দিল যে 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ কর্‌তে পাবে না, যদি কর তবে শাস্তি হবে।' এই কোম্পানীর নোটীসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো না।

তখন তার আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও lecture দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায় সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্য্যের কর্ম্ম করতে পারে।

"একজন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দামা করেছিল। তখন বুঝতে হবে যে ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান্ লোক আছে। হয় তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দামা চালাচ্চে। মানুষও সামান্য জীব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না।

"বিজয়। মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে যে lecture উপদেশাদি হয় তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

(সচ্চিদানন্দগুরু ও মুক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের কি সাধ্য যে অপরকে সংসারবন্ধনথেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে জীবের ভব-বন্ধন মোচন করে।

"আমি একদিন পঞ্চবটীর* কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনে গেলুম যে একটা কোলাব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে।

*দক্ষিণেশ্বরে রাশমনীর কালীবাড়ীর ভিতরে পঞ্চবটী।

অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আস্‌ছি তখনও দেখি ব্যাঙ্‌টা খুব ডাকছে। একবার উকিমেরে দেখ্‌লুম কি হয়েছে, দেখি যে একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়্‌তেও পারছে না, গিলতেও পারছে না, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা ঘুচ্ছে না। তখন ভাবলাম, ওরে যদি জাতসাপে ধর্‌তো তাহলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো; এ একটা ঢোড়ায় ধরেছে কি না তাই সাপ্‌টারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।

"যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহলে জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না। কাঁচাগুরুর পাল্লায় পড়্‌লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

বিজয়। মহাশয়, কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না?

(অহংকার ও মায়া।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকারেই সব আবরণ করে রেখেছে। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল! তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং বুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"দেখ না, আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বর। মধ্যে সীতারূপী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পান নাই।

"এই দেখ, এই গামছা খানা দিয়ে আমি মুখের সাম্‌নে আড়াল্ কর্‌ছি। আর আমায় তোমরা দেখ্‌তে পারছো না। তবু আমি এতো কাছে। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবুও এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখ্‌তে পারছো না।

(অহংকার ও উপাধি; 'the Philosophy of Clothes.')

"জীব তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

এক একটি উপাধি হয় আর জীবের স্বভাব বদ্‌লে যায়। যে কাল্লা-পেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখ্‌বে তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে। আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ী, এই সব এসে জোটে। রোগালোকও যদি বুটজুতা পরে, সে অমনি সিস্ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে সে অমনি একটা কাগজটাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে টান্ দিতে থাকবে।

(অহংকার ও টাকা।)

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়। আর সে মানুষ থাকে না।

TORN PAGES.

"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া কর্‌তো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছু দিন পরে আমরা কোন্নগরে বেড়াতে গিছ্‌লুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নাম্‌ছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে, বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বল্‌ছে 'কি ঠাকুর! বলি আছো কেমন।' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বল্লুম, 'ওরে হৃদে, এ লোকটার টাকা হয়েছে তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাস্‌তে লাগল।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ত্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছ্‌ল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল আর বল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে আমার ডিঙ্গিয়ে যাস্!' টাকার এতো অহংকার।

(অহংকার কখন যায়; ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।)

"জ্ঞান লাভ হলে অহংকার যেতে পারে। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।

বেদে আছে যে সপ্তম ভূমিতে মন গেলে তবে সমাধি হয়, সমাধি হলেই তবে অহং চলে যেতে পারে। মনের সচরাচর বাস কোথায়? প্রথম তিন ভূমিতে। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি সেই তিন ভূমি—তখন মনের আসক্তি কেবল সংসারে, কামিনীকাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন হয়, তখন সে ব্যক্তি জ্যোতি দর্শন করে বলে, এ কি! এ কি! তারপর কণ্ঠ। সেখানে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুন্‌তে ইচ্ছা হয়। কপালে ভ্রূমধ্যে মন গেলে, তখন সচ্চিদানন্দ-রূপ দর্শন হয়, সেই রূপের সঙ্গে আলিঙ্গন স্পর্শন করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু পারে না। লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শন হয়। ছুঁই ছুঁই বোধ হয় কিন্তু ছোঁয়া হয় না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে। সহস্রারের স্থান সপ্তম-ভূমি। সেখানে মন যখন যায়, তখন অহং আর থাকে না—সমাধি হয়।

বিজয়। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিবার পর যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন মানুষ কি দেখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সপ্তমভূমিতে মন পঁহুছিলে কি হয়, মুখে বলা যায় না।

"জাহাজ একবার কালাপানীতে গেলে আর ফেরে না। জাহাজের

খপর আর পাওয়া যায় না। সমুদ্রের খপরও জাহাজের কাছে আর পাওয়া যায় না।

"নুনের ছবি (লবণপুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছ্‌ল। কিন্তু সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে গেছে। সমুদ্র কত গভীর কে খপর দিবে, যে দেবে সে মিসে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয় আর সমাধি হয়, কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না।

(বজ্জাৎ 'আমি'।)

যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে সেই 'আমি'ই খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে এই 'আমি' মাঝখানে আছে বলে। জলের উপর যদি একটা লাটী ফেলে দেওয়া যায় তাহলে দুটা ভাগ দেখায়। বস্তুতঃ এক জল। লাটীটার দরুণ দুটা দেখাচ্চে। 'অহং'ই ঐ লাটী। লাটী তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে। বজ্জাৎ 'আমি' কাকে বলে? যে 'আমি' বলে আমায় জানে না, আমার এতো টাকা, আমার চেয়ে কে বড়লোক আছে? যদি চোরে দশ টাকা চুরী করে থাকে, প্রথমে টাকা কেড়ে লয়, তারপর চোরকে খুব করে মারে, তাতেও ছাড়ে না আবার পাহারাওয়ালা ডেকে পুলিসে দেয় ও ম্যাদখাটায়। বজ্জাৎ 'আমি' বলে, জানে না, আমার দশ টাকা নিয়েছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা।

('অহং' কিন্তু যায় না।)

বিজয়। যদি অহং না গেলে সংসার আসক্তি যাবে না, সমাধি হবে না, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ অবলম্বন করাই ভাল—যা'তে সমাধি হয়। আর ভক্তিযোগে অহং থাকে, তবে জ্ঞানযোগই ভাল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই একটী লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে। কিন্তু প্রায় অহং যায় না। হাজার বিচার কর 'অহং' ফিরে ঘরে আবার এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ী বেরিয়েছে।

(দাস 'আমি'।)

"একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শ্যালা 'দাস আমি' হয়ে! হে ঈশ্বর তুমি প্রভু আমি দাস, এই ভাবে থাকো। 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই। মিষ্ট খেলে অম্বল্ হয় কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।

"যেমন জলের রাশির উপর বাঁশ না রেখে একটী রেখা কাটা হয়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। দাস 'আমি' কি 'ভক্তের আমি' কি 'বালকের আমি' যেন 'আমি'র রেখা মাত্র।

আত্মসমর্পণ।

আসে কেবা সিমন্তিনী পরি নীলাম্বর,
হীরক মুকুট শীরে মরি কি উজর!
আধ কাল আধ রাঙ্গা গগন প্রাঙ্গণ
আলোক আঁধার যেন মিলিয়া দুজন,—
বলিছে মরম কথা জড়াজড়ি করি,
নাহি যেন দেখা শুনা কতযুগ ধরি।
একত্রে আলোক আঁধা' কত মনোহর!
সহমৃতা সতী যথা পরি রক্তাম্বর—
চলিলে পতির পাশে পশিতে চিতায়,
ধন্যবাদ হাহাকার একত্রে মিলায়—
তেমনি এ নব ছটা উজলি ভুবন
দেখাইছে স্বর্গে মর্ত্তে পূত সম্মিলন।
ধরণী নবীন সাজে সাজিল মধুর
বাজিল চৌদিকে শঙ্খ মাতানিয়া সুর।
বাজিল দেবতালয়ে কাংস করতাল,
ভকত মধুর স্তোত্র পঠিছে রসাল।
দিবা-শ্রমে ক্লান্ত প্রাণ ল'য়ে ধীরে ধীরে
চলিলা রক্তিম রবি নীল সিন্ধু তীরে।
হেন কালে সন্ধ্যাসতী দিলা দরশন,
সাদরে করিয়া রবি স্নেহ আলিঙ্গন—
সঁপি তাঁর করে প্রিয় রাজ্যখানি সুখে,
শান্তি আশে দিলা ঝাঁপ নীল সিন্ধু-বুকে।
সাগরের নীল জল করে ছল্‌ছল্‌,
আত্মসমর্পণ বিশ্ব গাহিল কেবল।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পরমহংস। নাস্তিকতা হইতে খৃষ্টধর্ম্ম এক সময়ে ভগ্নাংশ পরিমাণে হইলেও আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। ধর্ম্মের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। রাষ্ট্রবিপ্লব অরাজকতার সময়ে ধর্ম্মবিপ্লবও যে ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আবার খৃষ্টধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় না হইলে দেশের বার আনা লোক খৃষ্টান হইয়া যাইত। এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করেন রাজা রামমোহন রায়। যাঁহারা তাঁহার জীবনী পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিবেন। ইনি বেদ মানিতেন এবং উপনিষদ প্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সমসাময়িক অনেক লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও ধর্ম্মটা পোষাকী ছিল। আট-পৌরে দুর্গাপূজা ব্রাহ্মদের বাড়ীতে হইত। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায় উভয়েই বিলাত গমন করেন এবং উভয়েরই তথা মৃত্যু হয়। দ্বারকা-নাথের পর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের উপর ধর্ম্মরক্ষা করিবার ভার পড়িল। ইনিও সবল ও সতেজ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হু হু করিয়া ব্রাহ্মের দল বাড়িতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য চারি জন লোক পাঠান। তাহার ফল এই হইল যে বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া যে ব্রাহ্মদের বিশ্বাস ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেল। ব্রাহ্মেরা স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই ধর্ম্মপালনে সমান অধিকার দিলেন ও আপনাদের স্বতন্ত্র একটি বিবাহপদ্ধতি প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের দলভুক্ত ছিলেন। পরে কেশবচন্দ্র সেন নূতন একটি দল করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম হইল "আদি সমাজ" আর কেশবের সমাজের নাম হইল "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"। কেশবের ভাঙ্গাদল যোড়াশাঁকো হইতে উঠিয়া বেণেটোলা অঞ্চলে গেলেন। তবুও দেবেন্দ্রনাথ কেশবের ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মাণ জন্য কয়েক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। আদি সমাজে ছিল বেদের প্রাধান্য কেশবের সমাজে হইল বাইবেলের প্রাধান্য। তারপর আবার কেশব বাবুর কন্যার কুচবেহারের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ উপলক্ষে কেশবের দলও ভাঙ্গিয়া

গেল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি লোক কেশবের দল ত্যাগ করিয়া একটি নূতন দল করিলেন। তাহার নাম হইল "সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ"। এখনও এই তিনটি সমাজ চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মনে হয়, আদি সমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; কেশব সমাজের নেতা, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সাধারণ সমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী। যাহা হৌক কেশবচন্দ্র সেনের সহিত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ ও কথোপ-কথন হইয়াছিল। অন্নদাচরণ মল্লিক দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পঞ্চবটীতে রামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখিয়া আসিয়া কেশবের নিকট গল্প করিয়াছিল। কেশব স্বচক্ষে সমাধি দেখিয়া অবাক হইলেন; পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। পরমহংস বুঝাইয়া দিলেন যে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও বহুদূরে স্থিত বলিয়া ছোট দেখায়। আর অনন্তের বর্ণ হইতেছে 'কাল', অনন্ত আকাশের বর্ণ কাল, অনন্ত সমুদ্রের জল কাল; তাই চৌদ্দ পোয়ার ভিতর জীবের বুঝিবার সুবিধার জন্য মা "কালী" হইয়া আছেন। পরমহংসের সহিত মিলনের এই ফল হইল যে কেশবচন্দ্র "নববিধান" বলিয়া ব্রাহ্মদের একটি স্বতন্ত্র মত প্রচার করিলেন। কেশব বাবু স্বীয় আলয়ে পরমহংসদেবকে লইয়া গিয়া পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, পরমহংস-দেবের অপার করুণার ফলে পরমপিতাকে কেশবচন্দ্র বালকের ন্যায় "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে আরও কি হইত বলা যায় না।

যে মহাপুরুষের কৃপায় কেশবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইয়াছিল তিনি হুগলি জেলার জাহানাবাদ মহকুমায় কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির কালীবাড়ীতে পুজারীভাবে ছিলেন ও সেইখানেই মা তাঁহাকে কৃপা করেন। সিদ্ধত্ব লাভের পর পৃথিবীর লোক তাঁহাকে বুঝিতে পারে। তাঁহার আবির্ভাবের এই ফল হইয়াছে যে হিন্দুর ছেলের চমক ভাঙ্গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহা নয়, সুদূর পশ্চিমে আমেরিকা ও য়ুরোপ ভূখণ্ডেও তিনি কি ছিলেন লোকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার প্রিয়শিষ্য বিবেকানন্দ সেই কথা বুঝাইয়া দিতেছেন। এখানে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, খৃষ্টান, মুসলমান সব একাকার। মা আমার সব।

শ্যামাচরণের দল। শ্যামাচরণ লাহিড়ী নামে এক মহাত্মা কাশীতে বাস করিতেন। তিনি যোগী ছিলেন এবং গীতানুসারে লোকশিক্ষা দিতেন। অনেক লোক শ্যামাচরণের শিষ্য। ইঁহারা এক্ষণে একটি সম্প্রদায় হইয়াছেন। অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষিত যুবক এই দলে।

থিওসফী বা পরাবিদ্যা। ম্যাডাম ব্লাভটস্‌কী নামে রুষীয় দেশের এক জন স্ত্রীলোক ভারতবর্ষে আগমন করিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করেন। তিনি অনেক দিন তিব্বতে ছিলেন ও তথা উপাসনা করিয়া মহাপুরুষগণের কৃপায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কুথমীলাল নামে একজন মহাপুরুষ তাঁহাকে কৃপা করেন। আমেরিকার কাপ্তেন অলকট ম্যাদামের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন। ম্যাদাম পুস্তক লিখিয়া থিওসফী বা পরাবিদ্যা কি বুঝাইয়া দিলেন। ম্যাডাম ও অলকট চেষ্টা করিয়া ভারতসন্তানকে বুঝাইয়াছিলেন যে তাহারা কি ছিল এক্ষণে তাহাদের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে এবং তাহাদের নিজের যত্নে কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে। অনেক বড় বড় লোক এই দলভুক্ত হয়েন। পাইয়োনীয়র পত্রের সম্পাদক সিনেট সাহেব ম্যাদামের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া তাঁহার দলে আইসেন ও পাইয়োনীয়রের সম্পা-দকতা ত্যাগ করেন। তিনিও সাম্প্রদায়িক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই ধর্ম্ম এখন পৃথিবী ব্যাপিয়াছে। ভারতের ত কথাই নাই। মান্দ্রাজের আদিয়র ইহাদের প্রধান স্থান। এক্ষণে কর্ণেল অলকট ও আনি বিশান্তার তত্ত্বাব-ধারণে এই ধর্ম্ম চলিতেছে। কাশীতে ইহারা হিন্দুকালেজ স্থাপন করিয়াছেন, হিন্দুরছেলের হিন্দুর মত অথচ সময়োপযোগী শিক্ষা দেওয়াই এই কালেজের উদ্দেশ্য। ইহাদের সাম্প্রদায়িক অনেক পুস্তক আছে। 'থিওসফিষ্ট' নামে ইহাদের কাগজ আছে। ফ্রীমেসনদিগের ন্যায় পরস্পরে চিনিবার জন্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কেত ও দীক্ষা আছে। ইহারা ভারতের সর্ব্বস্থানে শাখা প্রশাখা করিয়াছেন। বঙ্গদেশেও ইহাদের শাখা সভা আছে। সেই সভা হইতে সাম্প্রদায়িক পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় ও 'পন্থা' নামে একখানি উত্তম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারতের অনেক লোক এক্ষণে থিওসফিষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে হিন্দুধর্ম্মের গাঙ্গে যে জোয়ার আসিয়াছে, তাহার মূল হইতেছেন, ইহারা। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল ইহারা মাথা তুলিয়াছেন। অলকট ও আনি বিশান্তা উভয়েই যোগ শিক্ষা করিয়াছেন।

গাণপত্য।

গণেশ বা গণপতির উপাসকদিগকে গাণপত্য বলা যায়। বৈষ্ণবেরা যেমন বিষ্ণুসেবা করিয়াও অপর দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তেমনই এই সম্প্রদায়ের লোকেরাও অপর দেবতার উপাসনাও করিতে পারেন। তবে তাঁহাদের মুক্তির জন্য ও পরকালের জন্য গণেশবীজ জপিতে হয় ও গণেশগায়ত্রী জপিতে হয়। এক একটি দেবতার আহ্বানের জন্য এক একটি বিশেষ মন্ত্র আছে, তাহাকে বীজ বলে। তন্ত্র এই বীজ উদ্ধার করেন। আরও একটি বিশেষ মন্ত্র আছে যাহা জপিলে সেই দেবতার আকর্ষণ হয়। মন্ত্রতত্ত্বে আমরা মন্ত্রের আকর্ষণীশক্তির কথা বলিয়াছি। গণেশের গায়ত্রী হইতেছে "একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো বিঘ্নঃ প্রচোদয়াৎ," এক দন্তের জ্ঞানলাভ করি, বক্রতুণ্ডকে চিন্তা করি বিঘ্নরাজ ঐ জ্ঞান আমাদিগকে প্রেরণ করুন।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আমিই মন্ত্র।

গাণপত্য সম্প্রদায় বিশেষ থাকিলেও গণেশের পূজা না করিয়া হিন্দুর কোন কর্ম্ম হইবার যো নাই। গণেশ যে সিদ্ধিদাতা। আশ্বিনের দুর্গাপূজায় আমরা গণেশ পূজা করি ও চৈত্রে বাসন্তীপূজায় ও গণেশজননী পূজায় আমরা গণেশপূজা করিয়া থাকি। হিন্দুস্থানীরা গৌরগণেশ পূজা করেন। ইহাদের গাণপত্য সম্প্রদায় কিন্তু প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ঢুন্‌ঢিরাজ ও বক্রতুণ্ড। গণেশ সাধনা বড় কঠিন। আপনাকে শিশুসন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে, জগৎকে মা বলিতে হইবে, কামের লেশমাত্র থাকিবে না তবে তুমি যথার্থ গাণপত্য হইতে পারিবে। গণেশের বীজ "প্রাণতোষিণী" প্রভৃতি তন্ত্রে আছে। তন্ত্র ছাড়া যে মন্ত্র নাই।

সৌর সম্প্রদায়।

সূর্য্যপূজা অস্মদ্দেশে অতি বিরল। স্ত্রীলোকেরা অগ্রহায়ণ মাসে যে ইতু (ঋতু) পূজা করিয়া থাকে তাহা এই সূর্য্যপূজা। নবগ্রহের পূজার সময় বা নবগ্রহের যাগের সময় সূর্য্যের পূজা ত হইয়াই থাকে। হিন্দুস্থানীরাও ছটুব্রত বা ষষ্টিব্রত নামে একটি ব্রত করেন, তাহাও কার্ত্তিক মাসে নদীতীরে গিয়া সূর্য্যপূজা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তদ্ভিন্ন পঞ্চদেবতার পূজার সময় সূর্য্যপূজা হইয়া থাকে। আর জবাকুসুমসঙ্কাশং বলিয়া সূর্য্য প্রণাম [illegible]

না, অর্ঘ্যদান করেন না, এমন হিন্দু অতি কমই আছেন। কিন্তু যাঁহারা সৌর সম্প্রদায় তাঁহারা গলায় স্ফটিকের মালা ধারণ করেন ও কপালে রক্তচন্দনের তিলক ধারণ করেন। ইঁহারা সূর্য্যদর্শন না করিয়া আহার করেন না। বর্ষাকালে বা বাদলের সময় সূর্য্যদর্শন না হইলে ইঁহাদের আহার হয় না। সাম্প্রদায়িক লোকেরা সংক্রান্তির দিনে ও রবি বাসরে কেহ কেহ একেবারে আহার করেন না কেহ বা লবণ ব্যতিরেকে একাহার করেন।

পুরাকালে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা হইত। তাহা সূর্য্যধ্যানে প্রকাশ। রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্ট, চারি হস্তে বর অভয় ও কমলদ্বয়ধারী মস্তকে, মাণিক্য, অরুণ বর্ণ ও ত্রিনেত্র।

সূর্য্যের গায়ত্রী "ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।" আদিত্যের জ্ঞান লাভ করি, মার্ত্তণ্ডকে চিন্তা করি, সূর্য্য আমাদিগকে তাহা (সেই জ্ঞান) প্রেরণ করুন।

পুরাকালে ভারতে সূর্য্যোপাসনার প্রাধান্য ছিল। চীনপরিব্রাজক হুয়ন সাং মুলতানে সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্যপ্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা পরে এই মূর্ত্তিতে গোমাংস সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আনন্দগিরি শঙ্করবিজয় গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রকরণে সূর্য্য উপাসনার বিবরণ লিখিয়াছেন। শ্রীহর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। উড়িষ্যার কনারক প্রদেশে যে সূর্য্যমন্দির আছে তাহা ১২৪১ খৃঃ হইয়াছিল। স্থাপয়িতা রাজা লঙ্গোর নর্মিঃ দেব। ইংরেজ বাহাদুর এই মন্দির রক্ষার জন্য এক্ষণে চেষ্টিত হইয়াছেন।

যবদ্বীপে অনেক হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে সূর্য্যের সপ্তাশ্বযোজিত কয়েকখানি রথ পাওয়া গিয়াছিল। সূর্য্যের পাষাণময় ও পিত্তলময় মূর্ত্তিও আছে।

শৈবসম্প্রদায়।

সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া খৃষ্টের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। ফলত যতদিন হিন্দুধর্ম্ম ততদিন শৈবসম্প্রদায়। ভারত ছাড়াইয়া শৈবধর্ম্ম যব বালি লম্বক প্রভৃতি দ্বীপ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দুরাজারা রাজত্ব করেন, এখনও ব্রতযুধ (মহাভারতের

যুদ্ধবর্ণনা) রামায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র, অর্জ্জুনবিজয় আগম দেবগম তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ তথা প্রচলিত। দ্বীপের লোকেরা বলে, ভারতের কলিঙ্গদেশ হইতে তাঁহারা সেই দেশে গিয়াছেন।

পূর্ব্বদিকে হিন্দুধর্ম্ম যেমন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিল, পশ্চিমে তেমনি মিশরদেশ ও গ্রীসদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। ভারতের লিঙ্গপূজা এই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল। আমাদের শিবশক্তি মিসর দেশে হইয়াছে, অসীরিস ও আইসিস। অসীরিশের স্ত্রী হইতেছেন আইসিস। ভগবতীর ন্যায় আইসিস ও পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত ত্রিকোণ শক্তি যন্ত্র কেবল ভগবতীর পরিচায়ক নহে তাহা আইসীসেরও পরিচায়ক। অসীরিস শিবের ন্যায় সংহারকর্ত্তা এবং শিবের ন্যায় অসীরিশের বাহন বৃষ তাহার নাম এপিস। বৃষ ও পূজিত। শিবের শিরোভূষণ সর্প, অসীরিশেরও তাই। শিবের পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অসীরিশের যে পাষাণমূর্ত্তি আজিও মিশরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারও পরিচ্ছদ ব্যাঘ্রচর্ম্ম। শিবের প্রিয়বৃক্ষ বিল্ব তাহার পত্র ত্রিপত্র অসীরিশেরও প্রিয়বৃক্ষপত্র ত্রিপত্র। যে নগরে শিব থাকেন তাহার মাহাত্ম্য খুব। কাশীর ন্যায় মেম্ফিস পবিত্র। দুগ্ধ দিয়া শিবকে স্নান করাইতে হয়, অসীরিশেরও তাই। ফিলিদ্বীপে প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ না হইলে অসীরিশের পূজা হইত না। শিবের মহাকালমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ অসীরিশও কৃষ্ণ বর্ণ। মিশর ভারতের পশ্চিমে ১৮০০ শত ক্রোশ দূরে। মিশরদেশে এই অসীরিশ দেবের লিঙ্গ পূজা হইত। মহাদেবের সহিত আর কোন প্রভেদ রহিল কি? বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া নানা স্থানে পতিত হইয়াছিল, অসীরিশের দেহ টাইকনদেব খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন।* তাঁহার লিঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সেই অবধি লিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি পূজা প্রকাশ হইল। মিশরের স্থানে স্থানে তত্ত নামে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমাদের দেশের যোনি-লিঙ্গের প্রতিরূপ বা গৌরীপট্ট শিবলিঙ্গের প্রতিরূপ। তাঁহার নাম "তত্ত"। আমাদের মতে যেমন গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, মিশরেও তাই। আমাদের দেশে সন্ন্যাসীরা চৈত্রমাসে যেরূপ গ্রামযাত্রা করিয়া থাকেন, মিশরেও অবিকল তাহা হইত। নবদ্বীপে ও

*মতান্তরে আইসিসের দেহ।

চূড়ার ষাণ্ডেশ্বরতলায় ও স্থানে স্থানে চৈত্রমাসে শিবের বিবাহ বলিয়া যেরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে, মিশরেও সেইরূপ হইত। লিঙ্গ পূজায় স্থল-বিশেষে মদ্যাদিপানের ব্যবস্থা আছে। মিশরেও তদ্রূপ হইত।

এক্ষণে গ্রীস দেশে ব্যাপারটা কতটা গড়াইয়াছিল দেখা যাউক। গ্রীস দেশে লিঙ্গপূজায় খুব ধূম হইত, স্থানে স্থানে মন্দির ও লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। বেক্‌স্ দেবের লিঙ্গ আর মহাদেবের লিঙ্গ এক বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেলিকোরিয়া নামে বেক্‌সের যে উৎসব হইত তাহা হিন্দুদের চড়ক বই আর কিছু নয়। একবিংশতি হস্ত পরিমিত লম্বা স্বর্ণলিঙ্গ লোকে বহন করিয়া লইয়া যাইত। মিশরদেশের প্রথম খৃষ্টানেরা "তত্ত"মূর্ত্তি দেহে ধারণ করিত। অদ্যাপি কবরে দেখিতে পাওয়া যায়। মক্কায় শিব আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে বলি শুধু শিবপূজা কেন, হিন্দুধর্ম্মের অপর অংশেরও বিস্তার ঘটিয়াছিল। পুরাণপুরী নামক একজন ক্ষত্রিয় ১৭৫২ খৃঃ প্রয়াগে উর্দ্ধবাহু হন। ইহার আশ্রম বিঠুরে (কানপুর) ছিল। পরে ইনি ভোট (তিব্বৎ), ব্রহ্মদেশ, সিংহলদ্বীপ, আফগানিস্থান, খোরাসান কাস্পীয়ান সাগর সমীপস্থ স্থান, রুষিয়ার মস্কৌনগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। ফিরিবার সময় তুর্কি ইরাণ, খরকদ্বীপ, বাহিরীণদ্বীপ, মক্কা বোখারা, সমরকন্দ ও ভোট হইয়া আসেন। ইনি রুষিয়ার অস্ত্রাখান নগরে হিন্দু অধিবাসী দেখিয়াছিলেন, ইনি তুর্কীর বসুরা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণরাও নামা দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তাতারের বাখ্ নগরে আরবের মস্কট নগর ও বাহিরিণদ্বীপে অনেক হিন্দুর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। এই পুরাণপুরী তিব্বত হইতে রাজপুরুষদের কাগজ লইয়া আসিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে প্রদান করিয়াছিলেন। কাশীরাজ চৈত সিংহের কার্য্যও করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল সাহেব ইহাকে আশাপুর নামে গ্রাম জায়গীর দিয়াছিলেন।

শিবের বীজ একাক্ষর হইতে বিংশত্যক্ষর পর্য্যন্ত। এই সকল মন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ধ্যান আছে ও উপাসনা পদ্ধতি আছে। তন্ত্রে সে সমস্ত দ্রষ্টব্য। "তন্ত্রসারে"ও বিশেষ বিবরণ আছে। রুদ্রাক্ষ ধারণ, বিভূতি লেপন, সিদ্ধি পান, ত্বরিতানন্দ সেবন সাধনার অঙ্গ। দাক্ষিণাত্যেই শৈব সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ প্রভাব। বঙ্গদেশের শাক্তেরাও শিবপূজা না করিয়া শক্তিপূজা করেন না নহিলে সমস্ত নিষ্ফল হয়। বঙ্গদেশে যেমন বৈষ্ণবগুরুরা গোঁসাই নামে

পরিচিত, পশ্চিমে শৈবসন্ন্যাসীরা তদ্রূপ গোঁসাই নামে পরিচিত। শৈব-সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই উদাসীন কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গৃহস্থও আছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণবের তিলক নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ ঊর্দ্ধ পুণ্ড, কিন্তু শৈবদিগের তিলক ত্রিপুণ্ড অর্থাৎ ললাটে বামদক্ষিণে তিনটি সরল রেখা। গোপীচন্দনের পরিবর্ত্তে শৈবেরা বিভূতি ব্যবহার করেন, একটা একটা চিম্‌টা প্রায়ই হাতে থাকে। কুম্ভমেলায় শৈবসন্ন্যাসীরা প্রথমে স্নান করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গেলে সাক্ষাৎ শিবাষতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হন। যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের বিবরণ সবিস্তারে জানিতে চাহেন তাঁহারা শঙ্করবিজয়বিলাস, শঙ্করদিগ্বিজয়, শঙ্করজয় কেরল উৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবেন। শঙ্কর কখন জন্মগ্রহণ করেন সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, খৃষ্টীয় এক শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ে তিনি আবির্ভূত হন। মলয়বর প্রদেশে নাম্বুরী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কোনমতে চিদম্বরে। আট বৎসর বয়সে উপনয়নের পরই বেদপাঠ আরম্ভ করেন। এই অল্প বয়সে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়াছিল। বার বৎসরে পিতৃহীন হয়েন এবং তখন হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টিত হন। একদা মাতার সঙ্গে নদী পার হইয়া তিনি গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন। আসিবার কালীন দেখিলেন, নদীপূর্ণ পার হইবার উপায় নাই। তথাপি মাতাপুত্র দুইজনে পার হইতে আরম্ভ করিলেন। যখন আকণ্ঠ মগ্ন হইলেন তখন মাতাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দিবেন। উভয়েই জলমগ্ন হইবার ভয়ে মাতা স্বীকৃত হইলে শঙ্কর মাতাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া সন্তরণ দ্বারা পরপারে উপনীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ জননীকে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে গমন করিলেন। মতান্তরে বলে মাতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহে ছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় লোকে সাহায্য না করায় বিরক্ত হইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কেহ কেহ এমনও বলেন তাঁহার মাতা জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ কথাটা বৌদ্ধগণের রটনা। শঙ্কর ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাভূত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইলেন এবং তত্ত্বজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চীপুরে হিমশীতল নরপতির আলয়ে বৌদ্ধযতিগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত টানিয়াছিলেন। শঙ্কর প্রথমে শক্তি মানিতেন না, বলিতেন শিবোঽহং আমিই শিব। পরে কাশীর মনিকর্ণিকার ঘাটে জগদম্বার কৃপায় শক্তি কি বুঝিতে পারেন। তিনি আনন্দে ছুটিয়াগিয়া অন্নপূর্ণার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহারই নাম যে "আনন্দলহরী" পূর্ব্বে এক স্থানে আমরা সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি। তাহারই অংশের এখন বীজরূপে ব্যবহার হয়। সেই অবধি শঙ্করের মঠে শক্তিচিহ্ন রাখিবার জন্য শঙ্কর আদেশ করিলেন ও তদবধি শঙ্করশিষ্যগণ শক্তি মানিয়া আসিতেছেন। শঙ্কর নির্গুণ উপাসক ছিলেন, জগদম্বার কৃপার পর সগুণ উপাসনাতেও মত দিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই অবধি পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিব বিষ্ণু প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসনা প্রচারে ব্রতী হইলেন। তাঁহার শিষ্য আনন্দ গিরি শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর প্রথমে তুঙ্গভদ্রাতীরে সরস্বতী দেবীকে স্থাপিত করেন এবং বলেন "কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমার আশ্রমে অবস্থিতি কর। সেইখানেই নিজের মঠ ও দেবীর পীঠ প্রস্তুত করিয়া "ভারতী" সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন। শঙ্কর ভারত পর্য্যটন করিয়া জীবনের শেষে কাশ্মীরে গমন করেন ও পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতী পীঠে অবস্থান করেন। পরে হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে গমন করেন, শেষে কেদারনাথে ৬২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার শিষ্য লক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্বদিকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। হস্তামলক পশ্চিমদিকে অষ্টাক্ষর বিষ্ণু মন্ত্র প্রচার করেন। দিবাকর আচার্য্য সৌর মত প্রচার করেন। গিরিজাপুত্র গাণপত্য মত প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্য ত্রিপুরকুমার শাক্ত মত প্রচার করেন। বটুকনাথ শিব বা ভৈরব উপাসনা প্রচার করেন। শঙ্করের শিষ্যগণ হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি হইয়াছে, চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—

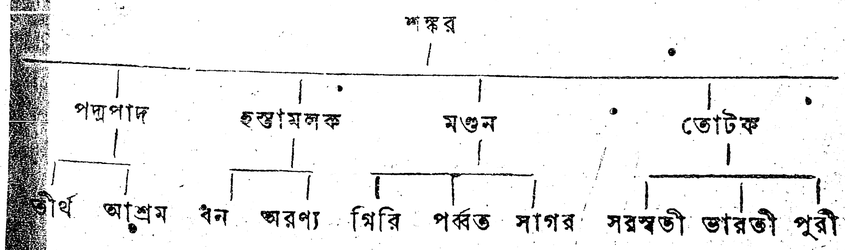

দশনামী সন্ন্যাসীর দশটি শ্রেণীর নাম সুতরাং হইল তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য
গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী। শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু সুতরা
শঙ্করের শিষ্যানুশিষ্য। একজন ছিলেন ঈশ্বর পুরী আর একজন কেশ
ভারতী।

শঙ্কর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্ত সূত্রের যে ভা
করেন তাহার নাম শারীরিক ভাষ্য বা সূত্রভাষ্য বা শারীরিক মীমাংসা
উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। তাঁহার অপর গ্রন্থের নাম ভগবদ্গী
ভাষ্য, দশোপনিষদ ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য, মোহমুদ্গর, অম
শতক, আনন্দলহরী। ইহা ব্যতীত তিনি নানা দেবদেবীর অতি সুললি
স্তব রচনা করিয়াছিলেন। "শৃঙ্গগিরির মঠে পুরী, ভারতী ও সরস্বতী
সারদামঠে তীর্থ ও আশ্রমের; গোবর্দ্ধনমঠে বন ও অরণ্যের এবং জ্যো
মঠে গিরি পর্ব্বত ও সাগরের; শিষ্য প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে
প্রত্যেক মঠের এক একজন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার নাম মহান্ত। প্রতে
মঠের ভূসম্পত্তি আছে। এ প্রদেশের মঠ হইতেছে তারকেশ্বর ও ভো
বাগান। দশনামীদের মতে যিনি শিব তিনিই ব্রহ্ম। প্রথমে ইহারা বেদা
মতাবলম্বী হইলেও এক্ষণে কিন্তু তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্র উভয়ই অবলম্ব
করিয়াছেন। ইহারা ডোরকৌপীন ধারণ করেন এবং মৃত্যুর পর দাহ ন
হইয়া ইহাদের সমাধি হয়।

ক্রমশঃ।

দুইজন কর্ত্তা।

যে গ্রামে কমললোচন বসু মহাশয়ের ভদ্রাসনবাটী, সে গ্রাম কোন
মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত নহে, তবে তাহা লোকালবোর্ডের অন্তর্গত
বসুজা মহাশয়ের মহতী চেষ্টার ফলস্বরূপ গ্রামে একটি ইউনিয়ন কমিটি,
একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও তাহার দ্বারদেশে
একটি লেটার বক্স স্থাপিত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য পেন্সনভোগী বসুজ
মহাশয় লোকালবোর্ডের মেম্বর, ইউনিয়নের সভাপতি, স্কুল দুইটীর সেক্রেটরী
এবং (লোকে যাহা বলে) অনারেবল মাজিষ্টর। এ হেন বসুজা মহাশ
গ্রামে উৎকৃষ্ট বাটী বাগান পুষ্করিণী জমীজরাৎ থাকিতেও কিন্তু চুঁচুড়ায় বা

করেন। বলেন গ্রামে ডাকাৎ ও ম্যালেরিয়ার ভয়। বাড়ীতে বাস করে
কতকগুলা পায়রা, চড়ুই, চামচিকা ও 'সদা', (সদানন্দ) নামক একজন
উড়েমালী।

চুঁচুড়ায় বাবুর বাসাবাটী; সপরিবারে তিনপুরুষ অর্থাৎ তিনি তস্য পুত্র
ও তস্য নাতি বাস করেন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে জর্ম্মান ডাক্তারের নূতন
থিওরি অনুসারে ৮টার কম শয্যা ত্যাগ করেন না। নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া
শয্যায় বসিয়া চা, বিস্কুট বা পাঁউরুটি, টোষ্ট বা অর্দ্ধসিদ্ধ হংস বা কুক্কুটডিম্ব
সহযোগে ভক্ষণ করিয়া এবং নাতি ও নাতিনীগণকে ভক্ষণ-করাইয়া, কাটা
পোষাক ও কোট ক্যাপে সজ্জিত হইয়া মর্ণিং ওয়াকে বহির্গত হন। ডায়েবিটিস্ (বহুমূত্র) আছে বলিয়া প্রাতরাশের সঙ্গে ছয়টা ডিম্ব তাঁহাকে ভক্ষণ করিতেই হয়। প্রাতর্ভ্রমণের সঙ্গী গোবিন্দ দত্ত পেন্সনভোগী সবজজ আর তিনি পেন্সনভোগী প্রোফেসর। উভয়েরই বয়স সমান ষাইটের কাছাকাছি। ইহা কিন্তু তাঁহাদের অফিসিএল এজ অর্থাৎ সরকারী বয়স। প্রকৃত বয়স বছর চারি বেশী হইতে পারে। চুরুটমুখে যখন ভ্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে সময়ক্ষেপ হয়। গোবিন্দ বাবুর মতে ইংরেজদের কেবল চির শৈথিল্যে ট্রান্সভাল সমরটা এতদূর গড়াইয়াছে। বসুজার মতে পূর্ব্বে শৈথিল্য ছিল বটে কিন্তু এখন আর নাই। চীনের সমরটা ফাঁসিয়া গেল বলিয়া উভয়েই দুঃখিত। মানবজাতির উপকারার্থ চীনরাজ্যটা ভাগবাঁটোয়ারা হওয়া উচিৎ ছিল। চীনের পুরাতন পুস্তকালয়টা রক্ষা করা, বসুজার মতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বসুজা মহাশয়ের নাতনীর বয়স দ্বাদশ বৎসর, নাম "রিপণ-শশী"। যে দিন রিপনশশী পিতামহের সঙ্গে নগর ভ্রমণে বহির্গত হন, সে দিন দত্তজার নাতিনী 'রমোলা'ও সঙ্গে যান'। উভয়েই এক বয়সী এবং উভয়েই জেনানা মিশনীমিন্ হিপোপটেমসের বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। রিপণশশী বাইবেলে পারদর্শিতার জন্য এবার কমিশনার দত্ত রৌপ্যপদক পাইয়াছেন। রমোলা পারিতোষিক বিতরণের সভায় নৃত্য গীতে নিপুণতা প্রদর্শনের জন্য বসুজা মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী দত্ত পাঁচ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন ও মিশন-পুরস্কার "মিস্থিওডরা জোনাথনের জীবনী" পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বসুজা মহাশয় দিনের বেলা অন্দরে অন্ন আহার করেন। তিনি তখন অর্দ্ধ সেরের অধিক মাংস আহার করেন না। ডিমের আমলেট তিনি বড় ভালবাসেন—প্রত্যহই তাহা হয়। তাঁহার জন্য আমলেট ও গিন্নির জন্য পেঁয়াজভাজা প্রত্যহই সুতরাং হইয়া থাকে। রাত্রিকালে তাঁহার ও গিন্নির জন্য করপু বক্স খানা দিয়া যায়।

বসুজা মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত সকল সভাতেই যোগদান করিয়া থাকেন। দত্তজা ফ্রেণ্ড বলিয়া একবার গোপনে কংগ্রেসে চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া বসুজা মহাশয় দুই মাসের জন্য দত্তজার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে তজ্জন্য তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে যেদিন মাজিষ্ট্রেটের পত্নী তাঁহার বাসাবাটীতে ও অন্দরে শুভাগমন করেন সেদিন কংগ্রেস সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াও প্রশ্নোত্তর প্রদানকালে বার বার দত্তজার চাঁদার কথাটা তাঁহার ওষ্ঠাধরে আগমন করিলেও তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই।

বসুজা মহাশয় পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেন কিন্তু এখন আর যান না। গ্রামে যে ব্রাহ্মসমাজটি ছিল সুতরাং তাহা এখন আর নাই। পূর্ব্বে তাঁহার বিধবা ভগিনী ও বিধবা ভাগিনী জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি ব্রত করিলে তিনি খড়্গহস্ত হইতেন কিন্তু এখন আর হন না। গত বৎসর ননদের পরামর্শে গিন্নি ইতু পাতিয়াছিলেন, কর্ত্তা তাহা শুনিয়াও কিছু বলেন নাই।

দশটা—এগারটার মধ্যেই বসুজার স্নানাহার শেষ হয়। বাড়ীতে বাথরুম আছে, গরমজল ও সাবান সাহায্যে প্রথম স্নানকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্নানের পর টর্কি তোয়ালে দিয়া গা মুছিয়া একটু গোলডেন অয়েল মাথায় দেন। আহারের পর একটু নিদ্রা যান পরে খবরের কাগজ লইয়া দিন অতিবাহিত করেন। অপরাহ্নে রীতিমত ভ্রমণ করিয়া আসেন। সন্ধ্যার পর পুত্রের সঙ্গে ও দিন বাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে ও প্রধানত পূর্ব্বকার ও বর্ত্তমান সাহেব রাজকর্ম্মচারীগণের কথার আন্দোলন হয়। রাজনীতি, সমাজসংস্কার, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি সকল বিষয়েই তর্ক চলিয়া থাকে। দিন বাবু তাঁহার নিকট খবরের কাগজ পড়িতে যান। কলিকাতা গেজেট ও খবরের কাগজ দিন বাবুর মুখস্থ তিনি কথায় কথায় পুরাতন খবরের কাগজ হইতে

নজীর দেন। তিনি ট্রান্সভালে এ নাগাইত কত বারে কত সৈন্য গিয়াছে ও কত সেনাপতি পর পর গিয়াছে তাহা বলিতে পারেন। সুতরাং বসুজার তিনি প্রিয়পাত্র। দিন বাবু আবার একটু হারমোনিয়ম বাজাইতে পারেন। কর্ত্তার ছেলের ছোট হারমোনিয়মটি মধ্যে মধ্যে দিন বাবু বাজাইয়া থাকেন। নিধু বাবুর ও শ্রীধরের অনেকগুলি টপ্পা দিন বাবুর জানা আছে। সুর-সংযোগে তাহা গাহিয়া থাকেন। বসুজা দিন বাবুকে আদর করিয়া বলেন, মরিমিঞা।

কর্ত্তা কিম্বা তস্য পুত্র বাটীর ও সংসারের কোন সংবাদই রাখেন না। কর্ত্তার শ্যালক বাটীতে থাকেন, তিনিই হাটবাজার, তত্ত্বতাবাস, দেখাশুনা সকল কার্য্যই করেন। পাঁচ টাকা যখন কাহন তখন খড় কিনিতে পারেন নাই, এখন পনর টাকা কাহনে কিনিতেছেন বলিয়া সে দিন গিন্নির ননদের কাছে শ্যালক মহাশয় বড় বকুনি খাইয়াছিলেন। বাসাবাটীতে গরু নাই। গরুপোষা হয় না। ঘোড়ার জন্য বিচালীর প্রয়োজন।

বাটীতে গরু না থাকিলেও জীবজন্তুর উপর তাহাদের দয়ামায়া নাই, এমন বলা যায় না। কর্ত্তার কেনেরী আছে, গিন্নীর খরগোস আছে, নাতি-দের একটা রূপী আছে।

পূজার সময় হয় পশ্চিমে না হয় দার্জ্জিলিঙে সপরিবারে বেড়াইতে যান। জমীজরাতের দুই টাকা বিলক্ষণ আয় আছে, এ সব কেন করিবেন না? কর্ত্তা বলেন যে ওরূপ বেড়ান ইঞ্জিনে অয়েল করা।

বিদ্যার চর্চ্চা পরিবারের মধ্যে বিলক্ষণ আছে। কর্ত্তা কলিকাতা রিভিউ পত্রে হিন্দু মাইথোলজি সম্বন্ধে আর্টিকেল লিখিয়াছেন। পুত্রবধূ 'বামাবোধিনী'তে "আমার ময়না" বলিয়া পদ্য লিখিয়াছেন। বন্ধুবান্ধব আসিলে কর্ত্তা দুইটিই পড়িয়া শুনান। বোধ হয় এইরূপে ত্রিশবার পঠিত হইয়াছে।

সে দিন ফ্যামিলীডাক্তার আসিলে বড় বউয়ের কেন জ্বর হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান হইতেছিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে তিনি দুই দিন মোজা পরেন নাই ও গায়ের আংরাখাটা অত্যন্ত ময়লা ছিল। অনু-সন্ধানে আরও প্রকাশ পায় যে সেদিন ফিল্টারটা খারাপ হওয়ায় নদীর

জল খাইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মহাশয় একটু জগসুপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার দাম বার আনা ও তাহা ডাক্তারখানাতেই পাওয়া যায়। কর্ত্তার ডিসপেপসিয়ার জন্য প্রায়ই জগসুপ খাইতে হয়।

একদিন কার্য্যোপলক্ষে বসুজা গ্রামে গিয়াছিলেন। কার্য্যোপলক্ষে গ্রামের রামদাস কবিরাজের বাটীতে একবার কাটাপোষাক পরিয়াই যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানে একজন গুরু মহাশয় বসিয়াছিল। এ কথা সে কথার পর মৃত্যুর পর মানুষের কি হয় এ কথাটা উঠিয়াছিল। গুরু মহাশয় বসুজার মত জানিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বলেন that undiscovered country from whose bourne no traveller returns শেষে কিন্তু সরল হইয়া বলিয়াছিলেন, টোটাল এনাহিলেশন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস—মৃত্যুর পর মানুষের কিছুই থাকে না। এ কথা শুনিয়া গুরু মহাশয় ও কবিরাজ মহাশয় উভয়েই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছিলেন।

যে গ্রামে রামদাসের বাস সেখানি একখানি গণ্ড গ্রাম—সুরধুনীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। যে ঘরখানিতে রামদাস থাকেন সে ঘর হইতে সর্ব্বদা সদ্যদুঃখবিনাশিনী ভাগিরথীর তরঙ্গভঙ্গ দর্শন হয়। সে ঘরখানি বাহিরবাটীর চণ্ডীমণ্ডপের এক পার্শ্বে। মেটেঘর ও ছোট হইলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানি চালী আছে তাহাতে রামদাসের পুঁথীগুলি আছে। পূজার বাসনকোসন, গাড়ু গামচা, আসন, তালপাতার চেটী, খড়ম, দড়ীবাঁধা চসমা এই হইল গৃহের আসবাব। এক পার্শ্বে একখানি ছোট তক্তাপোষ তাহার দক্ষিণ শিয়রে বিছানাটি গুটান আছে, তক্তাপোষের চারি কোণে চারিটি মুখচেরা কঞ্চি ঝুলান আছে। মশারির দড়ি কঞ্চির চেরামুখে লাগাইয়া দিলেই আটকাইয়া যায়—মশারি খাটাইবার বড় সুবিধা। ইংরেজরা টের পান নাই তাই রক্ষা নহিলে ডব্বার্টনের ডেনী ব্রাদার্স এতদিন মশারি খাটাইবার যন্ত্রের পেটেণ্ট লইতেন।

রামদাস গুপ্ত বাড়ীর কর্ত্তা। বয়স নব্বুই বৎসর কিন্তু শরীরে বিলক্ষণ বল আছে, চসমার সাহায্য বিনাও দেখিতে পান। পূর্ব্বে কবিরাজী করিতেন, এক্ষণে ছেলেরা মুঙ্গের ও জামালপুরে চাকরী করে।

রামদাস গুপ্ত ভোরে উঠেন বলিলে কথাটা ঠিক বুঝা যাইবে না, কেহ কখনও তাঁহার শৌচকার্য্য দেখে নাই বলিলে কতকটা বুঝা যাইবে। অতি প্রত্যুষে গ্রামের গুরু মহাশয় দেখা করিতে আসিলেও দেখিতেন যে তিনি উঠান হইতে হয় পুষ্প চয়ন করিতেছেন না হয় জপ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। না হয় দেখিতেন তাঁহার ছোট পুত্রবধূটি তাঁহার পূজার স্থান করিয়া দিয়া অন্দরের দিকে যাইতেছেন। ঐ সময়ে গ্রামের মতের মা, কি গ্রামের পিসি কি গুরু মহাশয় আসিয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। হয়ত মতের মা বলিত "হাঁগা কর্ত্তা খগেনের ছেলেকে আজ কি দোব" কর্ত্তা বলিতেন "আজও হরিমটক"। "কাঙ্গালিকে আজও নৃপবল্লভ দিই গে" বলিয়া গুরুমহাশয় থপ্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন, জানিতেন এ সময়ে বেশী দেরি করিলে কি বকাইলে কর্ত্তা আগুণ হইয়া উঠিবেন।

কর্ত্তার জপ শেষ হইতে ও গীতা ও চণ্ডীপাঠ শেষ হইতে এগারটা বাজিয়া যায়। বিশেষ বিশেষ দিনে আরও বিলম্ব হয়, উঠিয়া খড়ম পায়ে দিয়া "গিন্নী কোথা" "গিন্নী কই" বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন। গিন্নী এই সময় পতির পাদোদক ধারণ করেন। এই সময়ে কর্ত্তা পরেশের ছেলেকে একটু তাঁহার পূজার নির্ম্মাল্য দিয়া, মেজো বউয়ের ফোড়াটাতে তোকবালাম্বা দিতে বলিয়া, গাভীটির বাম পায়ের ঘায়ে আলকাৎরা দিতে বলিয়া, আদাছেঁচা ও ছোলাবাটা ও সারগুড় খাইয়া বাহিরে চলিয়া আসেন।

পরে যখন দেড়টার সময় আহারের জন্য আর একবার অন্দরে গমন করেন, তখন গিন্নী সংসারের দুইটা কথা জোর করিয়া পাড়িয়া বসেন। বড়জামাইকে চিঠি লেখা হইয়াছে কি না, নাৎজামাইকে রথের সময় কি তত্ত্ব করা হইবে, মেয়েব্যাভারে গঙ্গার মাকে এক টাকা ধার দিবেন কি না, ক্ষান্তদাই বৃন্দাবন গিয়াছে, এবার আঁতুড়ে কে দাই থাকিবে, অনারেবেল গিন্নী এই সময় এই সব ইনটারপেলেশন করিয়া বসেন। কাহারও অনুকরণে কর্ত্তা বঞ্চিৎ করেন না—জবাব দিয়া থাকেন।

দিবানিদ্রা কর্ত্তার নাই। আহারের পর হাঁচিয়া ও নস্য লইয়া এক খানা বড় পিঁড়ী ঠেসান দিয়া বসেন। কখনও কখনও মাথার একটা কাপড়ের পাড়ছেঁড়া বাঁধিবার প্রয়োজন হয়। একটু বিশ্রামের পর পুনী

লেখা ও পুঁথীপাঠ। অপরাহ্নে গ্রামের লোক আসিয়া জুটিয়া থাকে, তখন হয় মহাভারত পাঠ, রামায়ণ পাঠ না হয় সেকালের নানাবিধ গল্প হয়। না হয় নাতী নাতনীর সঙ্গে রসাভাষ। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সোণার মত ঝক্‌ঝকে গাড়ু ও কথকঠাকুরের মত চাঁপাফুলের রং গামছা লইয়া নদীর তীরে গমন করেন, সেখানে সন্ধ্যাকৃত্য শেষ করিয়া বাটী ফিরিয়া থাকেন। একটু বিলম্ব হয়। সন্ধ্যার পর একমাত্র সঙ্গী গুরু মহাশয়। তাঁহার গলা ভাল, ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। গুরু মহাশয় উঠিয়া গেলে একাহারী কবিরাজ মহাশয় একটু দুগ্ধপান করিয়া শয়ন করেন। অন্দরের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। নিজের বিছানা নিজেই করিয়া লন। একদিন একদিন জোর করিয়া গিন্নী বিছানাটা ঝাড়িয়া দিয়া যান, কর্ত্তা তাহাতে বড় বিরক্ত হন।

কর্ত্তার রোগ নাই, শোক নাই, রাগ নাই, লোভ নাই, মদমাৎসর্য্য নাই। ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার কাজটা নিজেই করেন। কর্ত্তার শত্রু নাই, কোন বালাই নাই, কখনও আদালতে সাক্ষ্য দেন নাই। গ্রামের কেহ গ্রাম্যবিবাদে মধ্যস্থ হইতে বলিলে অঙ্গুলিসঞ্চালনে অনাহারী মেজেষ্টর বসে-দের বাড়ী দেখাইয়া দেন। গ্রামের সকল লোক তাঁহাকে ভয় করে, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না।

সাধু সন্ন্যাসী অতিথি ফকির পাইলে কর্ত্তার আর আনন্দের সীমা থাকে না, নিজে সেবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দেন; কাছে বসিয়া আজ্ঞা পালন করেন ও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন। সেবার পর, বিশ্রামের পর, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের জীবনে বা অপর কাহারও জীবনে ভগবানের কৃপার বিশেষ বিশেষ নিদর্শনগুলি অতিশয় মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন।

এক একদিন মেয়েদের খাবার সময় কর্ত্তা খড়ম ত্যাগ করিয়া পা টিপিয়া পা টিপিয়া অন্দরে গিয়া উপস্থিত হন, এবং পাতের কাছে গিয়া দেখেন, মেয়েরা কি দিয়া ভাত খাইতেছে, তরকারী পাইয়াছে কি না। মেয়েদের পাতে তরকারী না দেখিলে বা অল্প মাত্রায় দেখিলে বলাই বাহুল্য গিন্নীর বড় বিপদ উপস্থিত হয়। গিন্নী আপনার ঊর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষকে রক্ষা করিবার জন্য এবং কর্ত্তা কখন আসিবেন না জানা থাকায়, পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া আছেন; সুতরাং কর্ত্তা বড় কিছু করিতে পারেন না। এক

দিন জনদুই উপরিলোক আসায় একটু বিপদ ঘটিয়াছিল কিন্তু কর্ত্তা সেদিন রাগ করেন নাই। মেয়েদের বাড়াভাত যেমন তেমনই রহিল—কেহ খাইতে পাইল না। চাকরাণী গঙ্গামণি দোয়ারি জেলের বাড়ী হইতে আধসের পোণামাছ আনিলে ও তাহা রান্না হইলে তবে মেয়েরা খাইতে পাইল। কর্ত্তা এতক্ষণ বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। বাড়ীতে আমিষভক্ষণ অনেকদিন বন্দ করিয়াছেন।

কর্ত্তার ভয়ে সধবারা কেহ পা শুধু রাখিতে পারিত না। পা শুধু দেখিলে তিনি বলিতেন "তোবেটিরে জগদম্বার জাৎ, তোরা নিজেই জগদম্বা অমন করে পা শুধু রেখে মরিস্ কেন? তোদের পায়ে টক্‌টকে আল্‌তা দেখ্‌লে আমার যে শিবের বুকের উপরকার পাখানা মনে পড়ে। তোরা বুড়কে এ সুখে কেন বঞ্চিৎ করিস্ মা!" সেই সময় গিন্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন "ওগো শুন্‌চ আমি মরিলে তোমায় কেউ বল্‌বে না—আমি ত এখনও বেঁচে আছি—তুমিও পরো গো—শুন্‌চ।" গিন্নীর প্রতি কর্ত্তার সোহাগের অপর দৃষ্টান্ত বড় একটা নাই, তবে একদিন জল খাইবার সময় আনারস খাইতে খাইতে পরেশের ছেলেকে দিয়া গিন্নীকে বাহির বাটীতে ডাকিয়া পাঠান, গিন্নী আসিলে তাঁহার মুখে নিজের মুখের আনারসখানি তুলিয়া দিয়াছিলেন। গিন্নীর বড় বিপদ হইয়াছিল। কে কোথা দেখিল এই লজ্জায় আধ ঘণ্টা মুখে করিয়া শেষে কর্ত্তার তাড়নায় ঘোমটা টানিয়া আনারস গিলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কর্ত্তার ডায়েরী নাই কিন্তু গ্রামের কাহার কবে বিবাহ, কাহার কবে মৃত্যু, কাহার কবে জন্ম হইয়াছে, এ সকল কথা তাঁহার মুখেমুখে। তাঁহার আরও মুখেমুখে গীতার শ্লোক, চাণক্য শ্লোক, হিতোপদেশ, খনার বচন ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদের ত কথাই নাই।

একদিন ভুবন ঘোষ গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কব্‌রেজ মশাই এ বছরটা কেমন টান টান ঠেক্‌ছে—বুঝি বা আকাল হয়, চাল্ চাট্টি কিনে রাখ্‌ব না কি? কর্ত্তা বলিলেন "না রে না। জানিস্ না, খনার বচনে আছে—

আষাঢ় নবমী শুক্ল পখা।
তাতে আছে জলের লেখা॥
যদি বর্ষায় রিণিঝিনি।
শস্যের ভার না ধরে মেদিনী॥

যদি বর্ষায় মুসলধারে।
মাঝ সমুদ্রে বক চরে॥
যদি সূর্য্য হেসে বসে পাটে।
চাষার গরু বিকায় হাটে॥

সে দিন আষাঢ়ের শুক্ল নবমীতে ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি হয়েছে আর সূর্য্যদে
মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অস্ত গেছেন দেখেছি—কোন ভয় নাই, খনার বচন মিথ্যা হ
না, এবার খুব শস্য হবে।"

কবিরাজ মহাশয় সুন্দর গান বাঁধিতে পারেন। মাঘ মাসের রাত্রি
"নাম" গাইবার জন্য দশখানা গ্রামের লোক তাঁর নিকট হইতে গা
বাঁধাইয়া লইতে আসে। এমন কি বহুদূরবর্ত্তী স্থানের লোকও তাঁহা
নিকট গান বা গানের সুর করিয়া লইবার জন্য আসিয়া থাকে। খবরে
কাগজ ওয়ালারা ও কেতাব ওয়ালারাও কখন কখন তাঁহাকে খুঁজিয়া থাকে
কেন না পুরাতন কবির গান তাঁহার নিকট একাধারে সমস্ত পাওয়া যা
শেষোক্ত দলের আগমনে কবিরাজ মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হন বলেন "
মানুষকে লইয়া আর টানাটানি কেন?"

কবিরাজ মহাশয়ের ৺দাশরথী রায়ের ও গোপাল উড়ের ও বিদ
সুন্দরের যাত্রার প্রতি অচলা ভক্তি। শুনিতে পাই তিনি পুরাকালে প
ক্রোশ পথ হাঁটিয়াও পাঁচালী শুনিতে ও গোপাল উড়ের যাত্রা শুনিতে
যাইতেন। তিনি বলেন অভক্তের ভক্তি আনিতে দাশরথীর পাঁচালী অমো
উপায়। গোপাল উড়ের গান সম্বন্ধেও তাঁহার মত কিছু নূতন রকমের
তিনি বলেন যে বিদ্যাসুন্দরের গান সব সাধনার গান। মালিনীকে গু
মনে করিলে ঐ সকল গানের সাধনার অর্থ বুঝা যায়। তিনি বলেন সুন্দর
সাধক, মালিনী গুরু, বিদ্যা—মহাবিদ্যা আর সুড়ঙ্গখনন—যোগসাধন
আমরা কিন্তু কথাটা বুঝিতে পারি।

কবিরাজ মহাশয় অনেকদিন হইতে চিকিৎসা করা ছাড়িয়া দিয়াছেন
কিন্তু লোকে ছাড়ে না বিরক্ত করে, তিনি হাত দেখার হাত হইতে মুক্তি
পান নাই। লোকের বিশ্বাস তিনি হাত দেখিয়া তিন দিন অগ্রে বলিতে
পারেন লোকটা কখন মরিবে। কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং বলেন ডাক্তারী
ঔষধে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি বলেন ভারতের জ্বর সারিবার
জন্য জগদম্বা ব্রাজিল দেশে কুইনিনের গাছ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কখনই

যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ডাক্তারীর কলটা (তাপমান) কিছুই নহে। উহাদ্বারা জ্বর ঠিক হয় না আর বায়ু পিত্ত কফ ইহার মধ্যে কিসের প্রকোপ তাহাও বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলে ঔষধ দেওয়া বৃথা, কেন না বায়ু পিত্ত কফের সাম্যাবস্থাই মানুষের প্রকৃতি।

কবিরাজ মহাশয় বাহ্যে হরি পরায়ণ পরম ভাগবত। সর্ব্বদা হরিকথা লইয়া আলোচনা করেন। লোকে জানে যে তিনি পরম বৈষ্ণব। কিন্তু গুরুমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি শাক্ত। দেবদ্বেষীর উপর তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তিনি দ্বেষাদ্বেষীর কথা হইলেই রামপ্রসাদের গান গাহিয়া থাকেন—

(প্রসাদী সুর—একতালা)
মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসী।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী॥
শিব রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রাম রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাঁসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

প্রথম প্রথম গিন্নী তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে অর্থাৎ এটা কর, ওটা কর, সেটা কর, তুমি যে কর্ত্তা, সংসারের এ গুলা না করিলে কি ভাল দেখায়, এরূপ করিলে—তিনি রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত গানটি গাহিতেন। এখন গিন্নী বুঝিয়া আর বড় বিরক্ত করেন না।

(গাড়া ভৈরবী। জৎ)
ভেবে দেখ মন কেউ কার নয় মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে।
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দেবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে॥

শ্রীআনন্দময় দেবশর্ম্মণ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

লহরী, মাঘ ও ফাল্গুন। এবার ছত্র ১৫ সমালোচন দেখিলাম কিন্তু তাহা সেই আইপুরাণ গদ্যে। পদ্যে সমালোচন দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম। পোড়া কপালক্রমে তা হল না। সম্পাদকের উৎসাহ খুব। "পেটুকরাজ" হইতে দুছত্র শুনিবেন?

হায় রে বাদশাহী আমল, বলিহারী যাই,
গল্প গুজব, মতন তাহার কথা শুন্তে পাই।
টাকায় আট মন, চাল্ সেকালে, ঘি দুধ ছড়াছড়ি,
আঃ কি মজার, রাজ্য রাজার, নমস্কার করি।
পেটের কারণ, হায় রে তখন, ভয় ছিল না কার,
মত্ত হাতী ফুলিয়ে ছাতি, ফি'রতো অনিবার!
যদি বল, দিনে রেতে, চোর ডাকাতের দল,
বধ্‌তো প্রাণী, রাহাজানি, ক'রতো অবিরল।
দূর তোর ছার, দস্যু ডাকাত, ডোণ্ট্ কেয়ার সব,
ভাতভরা পেট্, গা-ভরা বল, থাক্‌লে গণি শব!
তিন থাপড়ে, দু-দশটারে, পাঠাই যমের ঘরে,
বল্ বল্ বল্, বাহুর বল, শ্রেষ্ঠ চরাচরে।

বিকাশ, মাঘ। ইন্দুভূষণ (গল্প) চলিতেছে। "মানবদেহ প্রকৃর[ti]' পন্থায় মানবের সপ্তরূপ যে চলিতেছে ইহা তাহাই। উভয় প্রবন্ধেই [ব]র "গুপ্তবিদ্যা" হইতে। এ সব লেখা যতটা পারা যায় ততটা সরল করা উচিৎ। 'পাণিপথের যুদ্ধ' লেখা মন্দ নহে।

পন্থা, মাঘ, ফাল্গুণ ও চৈত্র। মাঘের প্রবন্ধ হইতেছে 'কালপরিণাম যুগান্তর'। শিবের গীতটুকু বাদ দিলে বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসুর প্রবন্ধ উৎকৃ[ষ্ট] হইত।

পরমাণু নিরাকার। ত্র্যসরেণুরূপে তাহার স্থান অধিকার অবস্থ[া] আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সূর্য্যের তিন ত্র্যসরেণু পরিমিত স্থানব্যাপী দৈনিক গতি পরিমিত কালকে 'ত্রুটী' বলে। ১০০ ত্রুটীতে ১ 'বেধ', ৩বে[ধে] এক 'লব', ৩ লবে এক 'নিমেষ', ৩ নিমেষে এক 'ক্ষণ', ৫ ক্ষণে এক 'কাষ্ঠা'

১৫ কাষ্ঠায় এক 'লঘু', (৩০ কাষ্ঠায় এক কলা) ১৫ লঘুতে এক 'নাড়ী' বা দণ্ড হয়। (আর দুই দণ্ডে এক 'মুহূর্ত্ত')। অতএব ১৮ কোটী, ২৩ লক্ষ, ১০ দহস্র ত্রুটীতে এক অহোরাত্র। আমাদের যেমন কালের ক্ষুদ্রতম অংশ পরিমাণের ব্যবস্থা আছে, সেরূপ অন্য কোন দেশে নাই বা ছিল না। এই-রূপ ক্ষুদ্রতম কালাংশ পরিমাণের ন্যায়, স্থূলতম কালাংশ পরিমাণেরও ব্যবস্থা আছে। ৩৬০ মানুষ বৎসরে ১ দেব বৎসর।

৪০০০ দেব বৎসরে——১ সত্যযুগ।
৩০০০ ঐ ——১ ত্রেতাযুগ।
২০০০ ঐ ——১ দ্বাপরযুগ।
১০০০ ঐ ——১ কলিযুগ।
২০০০ ঐ ——১ যুগসন্ধি।

অতএব ১২০০০ দেব বৎসরে ১ পূর্ণযুগ বা চতুর্যুগ। ১০০০ পূর্ণযুগে বা ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন (৪৩২ কোটী মানুষ বৎসরে)। এবং ১০০০ যুগ ব্যাপী ব্রহ্মার রাত্রি। ৩৬০ ব্রহ্মার অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ শত বর্ষব্যাপী ব্রহ্মার পরমায়ু—বা 'পর'। এই 'পর' পরম পুরুষের এক নিমেষ মাত্র। প্রায় 'তিন কোটী গুণিত কোটী' মানুষ বৎসর এক 'পর' হয়। অহোরাত্রবিদ্ জ্ঞানীগণ এই পরম কালতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। আমরা তাহা কিরূপে ধারণা করিব?

একটি অদ্ভুত গল্প ফাল্গুণে শেষ হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসার সময় এক জনের আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, নানা বিষয় দেখিয়া মৃত্যুর পরের অবস্থা অনুভব করিয়া আত্মা আবার দেহে ফিরিয়া আসে। গল্পে এই সকল কথা আছে। লেখক নাম দিয়াছেন বলিতেছেন, আমারই হইয়াছিল। লেখক শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। শেষ দুই সংখ্যায় ভবিষ্যপুরাণ হইতে আদম ও হব্যবতীর (আদম ও হবা) ও তাঁহাদের বংশাবলীর বিবরণ আছে। বাইবেলে যেরূপ আছে, ইহাতেও সেইরূপ।

সরস্বতীর অভিশাপে ম্লেচ্ছ ভাষা অতীব অধম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল! অনন্তর ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং অন্য খণ্ডে ম্লেচ্ছভাষা বিস্তৃত লাভ করিল। ইহাতে ম্লেচ্ছগণ নিতান্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিযুগের তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে ম্লেচ্ছবংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমুদয় ভূমিই ম্লেচ্ছময়ী এবং নানা পথাবলম্বী লোক সকল দুষ্ট

TORN PAGES.

হইয়াছিল। সরস্বতীর তটবর্ত্তী ব্রহ্মবর্ত্ত প্রভৃতি কতিপয় দেশ ব্যতীত সর্ব্বত্র ম্লেচ্ছগুরু মুষানামক কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কলিযুগ সমাগত হওয়াতে দেবার্চ্চনা ও বেদভাষা সমুদয়ই নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

যে সাতটি মহাপুরী (অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তি) তাহাতেও হিংসা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। দস্যু, শবর, ভিল্ল, মূর্খ, আর্য্য সকলেই ম্লেচ্ছদেশে অবস্থান করিতেছে। ম্লেচ্ছদেশে ম্লেচ্ছধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরাই বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসিত। সমুদয় গুণই ম্লেচ্ছের অধীন। অন্য সকল অপগুণ বলিয়া হেয়। ভারতে ও তাহার সন্নিহিত দ্বীপ সমূহেও ম্লেচ্ছরাজ্য। হে ঋষিগণ এই সকল জানিয়া এখন হরিকে ভজনা কর। ইহা শুনিয়া মুণিগণ বহু রোদন করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, চৈত্র, গৌরাব্দ ৪১৬ (১৩০৭) বেশ চলিতেছে।

মধুর মধুর গৌর কিশোর
মধুর বিষ্ণুপ্রিয়া
এক আসনে রতন ভূষণে
বসিলেন বার দিয়া।
মরি শোভার বালাই লঞা!

চাঁদের কোলেতে চাঁদের উদয়
উলস ভকত হিয়া॥
যুগল ভজন যুগল পূজন
রসিক ভকত-আশ।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া চরণ যুগল
মাগে সেবারাম দাস॥

"গৌরলীলার উদ্দেশ্য" আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কথাটা খুলিয়া লেখা উচিৎ ছিল। আমরা বুঝি যে শক্তি তৃপ্ত না হইলে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া শক্তির নিকট শক্তি লইয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনার গূঢ় রহস্য জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জানেন, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও উঁহাদের এক দিনের জন্যও বিচ্ছেদ হয় নাই। "এই পূর্ণ বিকাশ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে পূর্ণভাবে থাকিতে পারিল না" কথাটা ঠিক নহে। তবে জড়ে ছিল না সূক্ষ্মে ছিল। সাধকের পক্ষে জড়ের কথা তোলা বৃথা।

উদ্বোধন, চৈত্র মাসের দুইখানি। ইহারা একটি নূতন সন্ধান পাইয়াছেন। বড় অক্ষরে লেখা—"স্বামী বিবেকানন্দ প্রধান লেখক"। তার নীচে ছোট অক্ষরে "সম্পাদক—স্বামী ত্রিগুণাতীত"। অর্থাৎ প্রধান লেখক

সম্পাদক হইতে বড়। একথাটা ঠিক এবং সকল সম্পাদকও জানেন আর সকল প্রধান লেখকও জানেন, কিন্তু এরূপভাবে কেহ কথাটা প্রকাশ করেন নাই, এখন বেশ হইল। প্রধান লেখকরা এক্ষণে আশ্বস্ত হইবেন কিন্তু সম্পাদক মহাশয় নাম প্রকাশ করিতে দিবেন কি? উদ্বোধনের কথা ছাড়িয়া দিন, উঁহারা সব ত্যাগীর দল।

যাহাহৌক চৈত্র মাসের উদ্বোধন পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রথম প্রথম যে খোঁচা দিতাম, তাহার ফল এতদিনে ফলিয়াছে। ৫ম সংখ্যা একটু কমজোর। ৬ষ্ঠ সংখ্যা একেবারে পূর্ণ। 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না—প্রবন্ধ শেষ হয় নাই। কিন্তু সুর—অর্থাৎ History of Civilisation যেরূপ গড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাল কাটিয়া যাইবারই কথা। আমরা এরূপ ভাষার পক্ষপাতী নহি। এরূপ ভাষা আখ্যান বস্তুর উপর অনাদর আনে। ভাষা সরল করিতে হইবে বলিয়া গ্রাম্য করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। চৈত্রের শেষ সংখ্যার সকল প্রবন্ধগুলিই ভাল লাগিল। তাই বলিয়া মুখের উপর যে ব্রণটা রহিয়াছে, তাহা টিপিয়া দিব না এমন নয়, "এইটী বুঝা এবং বিশেষরূপ ধারণা করা আমাদের আবশ্যক যে, যাহাকে আমরা কার্য্যকারণভাব বলি, তাহা ব্রহ্মপ্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর (যদি আমরা এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়।" মান্দ্রাজে রামকৃষ্ণ উৎসব মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। যশোহরেও হইয়াছে।

আরতি, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন। আরতির আলো ক্রমশই সাফ্ হইয়া আসিতেছে। কবে আমরা কাঁসর ও ঘণ্টানাদের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য দেখিব? তবে রামকৃষ্ণ কথামৃত এতদিনে আরতিতে দেবভাবও আনিয়াছে। এবার কুলীনের তালিকাটি তাল ভঙ্গের একটি নিদর্শন। চণ্ডীঘোষের নূতন গায়ের কাপড়খানি আর একটি ইত্যাদি।

পুস্তক সমালোচনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ। সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত, রেব জী, সি, দত্ত প্রণীত। "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরা" চৈতন্যদেবের চরিত হইতে, তাঁহার দোষ বা আপাত দর্শন দোষভাবগুলি একত্রে বাছিয়াছেন। "শৈশবে তাঁহার মিথ্যা প্রবঞ্চনা চৌর্য্য অবাধ্যতা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে আমরা কিছুতেই তাঁহাকে আদর্শ শিশু বলিতে পারি না।" কাজ কি বলে? কেহ ত আর গ্রন্থকারকে খৃষ্ট ছাড়িয়া গৌরাঙ্গ ভজিতে বলে নাই।

অকুল-লহরী। জনৈক তত্ত্ব জিজ্ঞাসু প্রণীত, শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত এফ, টি, এস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, প্রথম পীঠ। কলিকাতা ১৩৩ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরিযন্ত্রে" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০৬ সাল। মূল্য ৸০ আনা। ভূমিকা হইতে এইটুকু দেখুন "কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে প্রথম পীঠই অগ্রে প্রকাশ করিলাম। * * প্রথম পীঠ উপক্রমণিকা স্বরূপ। দ্বিতীয় পীঠ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে প্রথম পীঠের প্রকাশ করা যেন কৃষ্ণ বিনা রাসবিহার। * * পুস্তকখানি ছন্দে লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু ছন্দের নিয়ম রক্ষা হয় নাই—করা দুঃসাধ্য। শ্যাম ও কুল দুই রাখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। * * এই পুস্তক লেখার প্রধান উদ্দেশ্য—বৈরাগ্য নিরূপণ।" গ্রন্থকার নিজের কথা নিজেই বলিয়াছেন, আরও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় পীঠ না দেখিয়া সমালোচন করিবেন না, সমালোচন হইবে না। তবে জিজ্ঞাসা করি সমালোচনার জন্য আমাদের নিকট পাঠাইলেন কেন? এত তাড়াতাড়ি করিতে কে বলিয়াছিল? গ্রন্থকারের একটা দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব গুরুদেবের মাথায় চাপাইলে চলিবে না। শুদ্ধাশুদ্ধি পত্রের জন্য কি গুরুদেব দায়ী। কাঠ, খড়, বাঁশ ফেলিয়া দিলেই যদি ঘর হইত তাহা হইলে লোকে আর ঘরামির খোষামোদ করিত না। কতকগুলি অতি গুরুতর বিষয়ের প্রশ্ন করিলেন কিন্তু তাহার উত্তর নাই, মীমাংসা নাই, ইহাতে কি কাহারও তৃপ্তি হইতে পারে? সকলেরই যেন পণ্ডশ্রম। তবে এইটুকু বলিতে পারি গ্রন্থকারের প্রতিভা আছে—কালে ফলিতে পারে। হীরককেও আকর হইতে আনিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তাড়াতাড়ি হস্তলিপি প্রেসে পাঠান—এ পাপ বাঙ্গালার সকল গ্রন্থকারের। তাই গ্রন্থেরও এত দুর্দ্দশা।

ছে।

যৌনসারী।

পূর্ণিমার পুরাতন গ্রাহকদিগের কাহারও কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে, পশ্চিম হিমালয়ের যৌনসার নামক প্রদেশবিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।* এই প্রবন্ধে যৌনসারীর সহিত পাঠকের পরিচয় করিয়া দিতে চেষ্টা করিব।

রাজ্যশাসন প্রণালী।

যৌনসার যখন শিরমুর রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, তখন এখানে এক প্রকার অপূর্ব্ব প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল; অদ্যাবধিও তাহার অল্পাধিক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র যৌনসার ৪৫০ খানি গ্রামে বিভক্ত। বার তেরখানি লইয়া এক একটি গ্রাম-সমষ্টি গঠিত হইয়াছে,—ইহার নাম খাত। এইরূপ পঁয়ত্রিশটি খাত আছে। প্রত্যেক খাতে এক একজন মণ্ডল বা প্রধান ব্যক্তি থাকেন, ইঁহাকে সিয়ানা বলে। কোনও কোনও বড় খাতে প্রধান সিয়ানার অধীনে এক বা ততোধিক সংখ্যক সহকারী সিয়ানা আছে। পঁয়ত্রিশজন সিয়ানার অধিনায়কস্বরূপ পূর্ব্বে চারিজন প্রধান পুরুষ থাকিতেন —ইঁহাদিগকে চৌত্রা বলিত। তখন রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবদীয় কার্য্য চৌত্রা সমিতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত। শিরমুররাজ চৌত্রা প্রদত্ত সামান্য মাত্র রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রামে কোনও মামলামোকদ্দমা বহু উপস্থিত হইলে, সাধারণতঃ খাতের সিয়ানারাই তাহার নিষ্পত্তি দিতেন। অতি গুরুতর ধরণের মোকদ্দামা দুই একটি চৌত্রা-সন্নিধিরমোক্ষণে পাছিত। সিয়ানা ও চৌত্রা পদ কতকটা পুরুষানুক্রমিকই। জীবিত সিয়ানার মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই তৎপদে অধিরূঢ় হইয়া গাত্রদাহ প্রশমনার্থ বাঁধি নিয়ম নাই। উঁহার বংশে, অর্থাৎ পুত্র নি[illegible] বদ্রি অশরীরী প্রেতাত্মা, যে কেহ খাতের সমস্ত অধিবাসীর বিবে[illegible] চীৎক[illegible]য়া সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য ব্যস্ত হন, তাঁহাকেই মনোনীত [illegible] মর্য্যাদা র[illegible] অব্যর্থ। আত্মগ্লানি [illegible]ইলে, অথবা সে বংশে সিয়া[illegible]কারগত পার্থক্য বি[illegible]টীতে একাধিক মেড়ের [illegible]নে উপবিষ্ট। মন্দির[illegible]ক্তির প্রতি দুর্ব্যবহারের

*আশ্বিন সংখ্যা ১৩০

TORN PAGES.

তবে খেলায় স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ করিলেন কেন?—ইহার উত্তর যিনি দিতে পারিবেন, তিনি মহাভারত বুঝিবেন, যিনি পারিবেন না তিনি কখনও মহাভারত বুঝিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহাকে প্রণাম করেন, যিনি সামান্য কুক্কুরের জন্য স্বর্গত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন সেই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে পণ রাখিয়া পাশা খেলিয়াছিলেন—ইহাতেই ত সব বুঝা যায়। বিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে সুসভ্য য়ুরোপখণ্ডে রাজন্যবর্গের বাকারাট আশক্তি যদি বুঝা যাইতে পারে তবে দ্বাপরের কথা কেন না বুঝা যাইবে—যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার ও যাঁহার কৃপায় 'একবসনা দ্রৌপদী অক্ষয়বসনা হইলেন'।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা পরের দুই সংখ্যা ভাল। বিষয়বৈচিত্র নাই বলিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে স্পষ্টই বুঝা যায়। হইলেও সমাজভেদ, সদানন্দ, কবিজীবনী, আমার কন্যার প্রতি [কবিতা] পাঠে যথেষ্ট আনন্দ আছে এবং শিক্ষাও আছে। শেষকথা, যদি বঙ্গদর্শন চলে তবে ভাল করিয়া চলুক। 'ক্যারা ভারতী' হইলে চলিবে না।

জন্মমাত্র শুকদেবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান স্বর্গীয় দৈববস্তু আর জন্মমাত্র যুদ্ধ অহিরাবণের সম্পদ অর্থাৎ রাক্ষসের বস্তু। বঙ্গদর্শন মাসিক সাহিত্য সমালোচনা লইয়া জন্মিয়াছেন কিন্তু জ্যৈষ্ঠে দেখিতেছি মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা। মানুষে যেন কেমন কেমন দেখায়। আমরা আর কি করিব রিং ফিংগার কি ফিংগার রিং তাই ভাবিতেছি। তবে ওটা নাকি আমাদের জিনিষ সাত্ নকলে না আসল খাস্ত হয়।

মুকুল, ১৩০৮ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ। নববর্ষে বলিতেছেন "যদি একবার দোষ দেখিতে বস, মুকুলের অনেক দোষ দেখিতে পাইবে। আমরা আপনারাই যখন স্বীকার করিতেছি তখন অন্যের আর বলিবার প্রয়োজন কি?" মুকুলের গাত্রচর্ম্ম কোমল তা জানি।

পূর্ণিমা; ৯ম বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩০৮ সাল।

বেণীতীর্থে।

ভাদ্র মাস। ওরাগঙ্গা। দুকূল প্লাবিত করিয়া সুরতরঙ্গিণী রসরঙ্গে তরঙ্গভঙ্গে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছেন। আজ ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে—দক্ষিণ প্রয়াগের মুক্ত বেণীতীর্থে পঞ্চতীর্থের বারিতে স্নান করিবার জন্য দলে দলে নরনারী আসিয়াছে, আমিও আসিয়াছি। অবগাহন স্নান করিয়া ও বেণী মাধবের পূজা করিয়া, সেই দেব রামপ্রসাদের বেণীমাধবের শিরে সচন্দন বিল্বপত্র দিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। জঠরজ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়া অপরাহ্নে উড়িষ্যার কেশরীরাজবংশের দত্ত পুরাতন বাঁধাঘাটের একপার্শ্বে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি। ত্রিবেণীর সম্মুখে আজ আর তিন চারিটি গঙ্গা নাই, ভিন্ন ভিন্ন চড়া নাই, আজ জলেজলময়—ছয়লাভ—একাকার। মনে করিতেছি, বাল্মীকি বর্ষান্তগোদাবরী দর্শনে তাহার সহিত স্বামীশয্যাত্যাগিনী গমনশীলা স্খলিতবেণী উপভুক্তা নারীর তুলনা করিয়াছিলেন। সে কবিতার দিনে কবিতাই আসিয়াছিল। আজ বিংশশতাব্দীর ঊষাকালে—দূরে যখন গৌরীপুরের কারখানা-কল-স্তম্ভ ধূম উদ্গীরণে বর্ষার আকাশকে আরও ঘনতর মসীময় করিতেছে—তখন কাহার সহিত সুরধুনীর তুলনা করিব? মন বলিতেছে ধনী ঠিকাদারের নূতন ও মেরামতী বাটীর সহিত তুলনা কর। তার ঠাকুরদাদার ক্যাঁতড়াহাটি বাড়ী আর নাই। এখানে আলো, ওখানে জমাট খসিয়াছে, ওখানে ভাঙ্গা পাঁচিলের ইটের গাদা; ঘরে ঝাড়বার জাল, আরসুলা, ইন্দুরমাটী; উঠানে ঘাসজঙ্গল পুঁইমাচা, এ সব আর নাই—এখন সব লুকাইয়াছে। এখন দ্বিরদরদ নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারাদি হোক এখন অমলধবল সৌধশ্রেণী সগর্ব্বে গগণের দিকে শির উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধপ্‌ধপে ঠিকঠাক; অন্বেষণ করিয়াও একটা অসংলগ্ন বা বেহিসাবী কিছু বাহির করবার যো নাই। তুলনাটা ইংরেজী ইংরেজী হওয়ায় মনটা যেন কষ্ট পাইল। সহসা মুখ উত্তোলন করিয়া দেখিলাম আমারই পার্শ্বে একটি বৃদ্ধ ও যুবক আসিয়া কখন বসিয়াছে ও নিমগ্ন হইয়া কি কথোপকথন করিতেছে। যুবকের উৎসাহ ও ব্যস্ততা, স্থবিরের আত্মপ্রসাদ ও ধৈর্য্য, দুইটি সম্পূর্ণ চিত্র। যাহাহোক আমিও তাহাদের কথোপকথনে একবার মাত্র মনোযোগ দিবামাত্র, মগ্ন হইয়া পড়িলাম।

#170 to 207. FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE, FILMING IS NOT POSSIBLE.

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিল "ত্রিবেণীর আর কি আছে? সব গিয়াছে। ঐ যে গঙ্গাবক্ষে জলরাশি মধ্যে একটু বৃক্ষশির জাগিয়াছে দেখিতেছেন ঐখানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাঙ্গলা ছিল। তিনি জজপণ্ডিত ছিলেন। এই ঘাটে একদিন জগন্নাথ আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভিন্নভাষী দুই জন য়ুরোপীয় গোরার দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, তাহারা পরস্পরকে গালি দিয়াছিল। আদালতে নালিষ হইলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তিনি উভয়ের পর পর কথাগুলি—ভাষা না জানিয়াও কেবল স্মরণশক্তির বলে—যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন। জজের ও লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

যুবক। মহাশয়, ওসকল কথা লোকে জানে। যাহা লোকে জানে না বা যাহা রহস্যজ্ঞ অতি অল্প লোকেই জানে এরূপ কথা বলুন না—চির-বাধিত হইব।

বৃদ্ধ। সেই সময়ে ত্রিবেণীতে আড়াই শত টোল ছিল। ৺সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া এখানকার ভট্টাচার্য্যরা ও ছাত্রবৃন্দ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে তাঁহারা মা সরস্বতীর ক্রোড়ে বসিয়া আছেন। সরস্বতী পার হইয়া কোন দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতের যাইবার যো ছিল না। সরস্বতীকে কেহ কি ডিঙ্গাইয়া পণ্ডিত হইতে পারেন?

যুবক। তখন বুঝি পণ্ডিতে পণ্ডিতে সর্ব্বদা বিচার হইত?

বৃদ্ধ। হাঁ, এখানে ত প্রায়ই হইত? সেকালে লেখা পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইলে লোকে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইত ও দেশে দেশে বিচার করিয়া বেড়াইত। যে, সকল লোককে পরাজিত করিতে পারিত সে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হইত। একটা গল্প শুনিবে?—সাধক জগন্নাথের কথা আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

যুবক। বলুন না।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, আমিও শুনিতে লাগিলাম, একটু অগ্রসরও হইলাম। কেহ আপত্তি করিল না।

একদা একজন পণ্ডিত ত্রিবেণীতে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সাধক জগন্নাথকে বিচারে আহ্বান করেন। এই ঘাটে বিচার আরম্ভ হয়। তখন বিচারকালে বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত—এবারও হইয়াছিল।

বিচার এরূপ আকার ধারণ করিল যে উভয়ের স্নানাহার বন্ধ হইয়া গেল, দিনরাত কেবলই বিচার চলিতেছে। দুই দিনের পর সংবাদ মতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথানুসারে ত্রিবেণীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা, ব্রাহ্মণ উপবাসী দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও ভীত হইলেন। সমাজপতি রাজার কঠোর আদেশে বিচার স্থগিত রাখিয়া উভয়ে স্নানাহার করিলেন। অবসর-কালে বিচার চলিতে লাগিল। শেষফল দেখিবার জন্য রাজাও বজ্‌রায় রহিলেন। সাত দিনের পর অপরাহ্নে জগন্নাথ পরাজিত হইলেন। অপর পণ্ডিত জয়লাভের পর বর্দ্ধমান অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের অধিক মনোকষ্ট হইবে বলিয়া ইচ্ছা করিয়া সরস্বতী পার হন নাই। শুনিয়াছি তাঁহার নাম ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ।

এদিকে সন্ধ্যাকালে জগন্নাথের ভৃত্য রামদাস প্রভুকে বাড়ী লইতে আসিল। পরাজয়ের কথা দেশব্যাপ্ত হইয়াছিল, গৃহিণীও জানিয়াছিল। রামদাস আসিয়া দেখিল জগন্নাথ বিষণ্ণ বদনে ঘাটে বসিয়া আছেন। বাটী যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া জগন্নাথ বলিলেন "রামদাস মনোযোগ দিয়া কথা শুন। আমি আর বাটী যাইব না, এইখানে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিব। শেষাবস্থায় আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হইয়াছে। এ মুখ আর জন-সমাজে দেখাইতে পারিব না। কিন্তু বাবা তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে; তুমি শপথ কর যাহা বলিব শুনিবে ও করিবে। রামদাস প্রভুকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তখনই ইচ্ছামত শপথ করিল।

তখন জগন্নাথের বাক্যানুসারে রামদাস চঙ্গ গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর নিকটে আসিল। জগন্নাথ ভৃত্যের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিলেন।

বলিলেন "দেখ রামদাস আজ হইতে আমি গুরু তুমি শিষ্য। বিচারে হারিবার কারণ এই যে আমি গণেশসিদ্ধ কিন্তু পণ্ডিত মহাবিদ্যা তারাসিদ্ধ। বিচার আরম্ভ করিয়া আমি এ কথা টের পাই, তখন উপায় নাই। গণেশ মা অপেক্ষা বড় হইতে পারেন না, কাজেই আমার হার হইল। কিন্তু বাবা ইহার প্রতিশোধ আমি লইব। তুমি জান আমার ব্রাহ্মণীর গর্ভাবস্থা; আমি জানি ব্রাহ্মণী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিবেন। তুমি সেই পুত্রকে লালন পালন করিবে। উপনয়নের পরই আমার মহামন্ত্র যাহা তোমাকে দিলাম সেই মহামন্ত্র তুমি তাহাকে উপদেশ করিবে। পরে উপযুক্ত সময়ে এই

ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে ঐ মন্ত্র বলে উত্তরসাধক হইয়া আমার পুত্রকে মহাবিদ্যা কালীসিদ্ধ হইবার জন্য শব-সাধনা করাইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা উভয়ে সিদ্ধ হইবে। আমার আত্মাও যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ভগবতীর নিকট বর গ্রহণের পর খুঁজিয়া সেই পণ্ডিতকে বাহির করিবে। আমার পুত্র বিচার করিয়া যে দিন সেই পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবে সেই দিন আমার আত্মার শান্তি হইবে, নহিলে নয়। রামদাস তোমার গুরুর এই আজ্ঞা। বাড়ী যাও ব্রাহ্মণীকে প্রকাশযোগ্য সমস্ত কথা নির্জ্জনে বলিও।" এই বলিয়া জগন্নাথ রামদাসের কর্ণে কর্ণে আরও কি কথা বলিলেন। গভীর রাত্রিতে গৃহিণী আসিয়া দেখা করিয়া গেল।

জগন্নাথ পরদিন প্রাতে সঙ্কল্প করিয়া প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। যথাসময়ে জগন্নাথের আত্মা নশ্বর জড়পিণ্ড ত্যাগ করিয়া অনন্তধাম উদ্দেশে যাত্রা করিল।

যথা সময়ে রামদাস গুরুর আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিল। জগন্নাথের শিশুসন্তানকে লইয়া রামদাস সর্ব্বদা এই বামদিকের শ্মশানে বসিয়া থাকিত। সর্ব্বদা শ্মশান দেখিয়া শিশুর একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া যাইবে এই জন্য সে ঐ কার্য্য করিত। আপনি উপুড় হইয়া শুইত। রাত্রিতে অন্ধকারে শিশুকে ঘোটকারোহণ ক্রমে পৃষ্ঠে বসাইয়া কালীনাম জপ করাইত। রামদাস যথাসময়ে বালককে মন্ত্র দিল।

* * *

আজি অমাবস্যা। তিথি বার নক্ষত্রাদি সকলই আশানুরূপ। রামদাস ও বালক উভয়েই উপবাস করিয়া আছে। সন্ধ্যার পরে ঘোরতর মেঘ উঠিল ও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঘনঘটায় ও ঘোরান্ধকারে পৃথিবী নিরয় তুল্য হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জনসহ পসলা পসলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। চপলা চঞ্চলার ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণালোকের ক্ষণপ্রভা তমিশ্রাময়ী ঘোরারজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর তমোময় করিয়া তুলিল। এমন সময় শিবাদল বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল। রামদাস চঙ্গ সুসময় বুঝিয়া, "জয় কালী" বলিয়া, বালককে ক্রোড়ে লইয়া ও পূজার দ্রব্যাদি লইয়া শ্মশান উদ্দেশে বাহির হইল। বালক রামদাসকে প্রণাম করিল। গলদশ্রুলোচনে রামদাস বলিল "মা কালী তোমার

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" এই বলিয়া নৈশগগণের জগদম্বারূপিণী অন্ধকারচ্ছায়াকে উদ্দেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া বলিল "মা গো আমার দুধের বালক—তুমি ভিন্ন রক্ষা করিতে আজ উহার কেহ নাই। কোলে নিও মা।" এই বলিয়া চুম্বন করিয়া শিরঘ্রাণ করিল।

রামদাস বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এমন সময় সহসা দেখিল মস্তকোপরি আকাশে নীল বিদ্যুৎ চমকাইল; প্রভু জগন্নাথের ন্যায় একটি ছায়া রামদাসের অগ্রে অগ্রে পন্থানুসরণ করিল। সেই সময়ে যামঘোষ ঘোরনাদে প্রথমযাম ঘোষণা করিল। উভয়েরই শরীর কণ্টকিত হইল।

ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে উপনীত হইয়া রামদাস যথাযোগ্য আয়োজন করিল। শাস্ত্রমত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া রামদাস ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিল। বালকও কেন জানি না নিস্তব্ধ—ভাবে ভোর। অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় একটা শকুনির পক্ষসঞ্চালনের শব্দ হইল, তাহা শুনিয়া একটা গৃধিণী সুতীক্ষ্ণস্বরে একবার মাত্র চীৎকার করিল। নিকটে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইল কিন্তু রামদাস কিছু দেখিতে পাইল না, বুঝিতে পারিল না সর্প কি দূরে কোন বৃষ শববন্ধনে ব্যবহৃত যবসরজ্জু চর্ব্বণ করিতেছে। ঠিক এই সময়ে শূন্য কলসীতে প্রবল বায়ু প্রবেশ করাতে একটা হো হো শব্দ হইয়া উঠিল। একটা শৃগাল, কুক্কুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া নিঃশব্দে ও সবেগে রামদাসের নিকট দিয়া ছুটিয়া গেল। বহু বহুদূরে গঙ্গাবক্ষ হইতে শব্দ আসিল—রামদাস শুনিলেন—

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর
কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি
অতেব হলাম সাহস ভাঙ্গা॥

রামদাস সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন। মনে হইল কে যেন হাত ধরিয়া টানিতেছে।

* * *

রামদাস। দেখ আমি উপুড় হইয়া শোব, তুমি আমার পিঠে যেমন বলিব তেমনি করিয়া বসিয়া মন্ত্র জপ করিবে। যখন ভগবতী আসিবেন ও বর দিতে চাহিবেন তখন তুমি বলিবে রামাদাদা বর নিবে। তিনি নানা

কথা বলিবেন, তুমি কোন মতে শুনিও না। বলিবে রামদাদা না বর নিলে আমার বর চাই না।

বালক। তাই করিব। কিছুতেই শুনিব না, রামাদাদা তুমি বর নেবে তারপর আমি বর নেব। যদি ভয় করে বড্ড।

রামদাস। ভয় কি? আমার পিঠের উপর থাকিবে কিনা। আর যদি আমি ভয় দেখাই তাহলেও ভয় থেও না।

বালক। তুমি ভয় দেখালে কেন ভয় খাব?

রাম। আমি ভয় দেখাব। পিঠ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করব।

বালক। তাতে আমি ভয় খাব না। পিঠ থেকে কিছুতেই পড়্ব না, উঠ্ব না।

* * *

বালক ঘোটকারোহণের ন্যায় রামদাসের পৃষ্ঠে বসিল—মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিল। রামদাস দুই একবার বালককে উৎসাহ দিল, কথা কহিল। পরে তীক্ষ্ণধার ক্ষুর সাহায্যে সুদৃঢ়হস্তে আপনার কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া ফেলিল। হু হু করিয়া শোণিতস্রোত বহিল,। রামদাস এখন শব। রামদাস এখন চণ্ডালের শব।

বালক মন্ত্র জপ করিতেছে, একান্তমনে মহামন্ত্র জপ করিতেছে। রামদাসের শব দুলিতে লাগিল, ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বালক পূর্ব্ব-কথা মনে করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল। ক্রমে সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, বটুক, ভৈরব, যোগিনী দেখা দিতে লাগিল। সহসা সম্মুখে স্তূপাকার স্ত্রীলোকের কেশরাশি পতিত হইল। শূন্যদেশ হইতে কতকটা পর্য্যুসিত শবমাংস পতিত হওয়ায় দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র ও মস্তিষ্ক পূর্ণ হইয়া গেল। রামপ্রসাদ এই সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

জগদম্বার কোটাল বড় ঘোর নিশায় বেরুলো।
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী ঘন দম দমকতাল
বব বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে চতুষ্পার্শ্ব শূন্যাগারে
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।

অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে ভীষণ ত্রিশূল করে
পদতল লম্বিত জটাজাল॥
শমন সমান দর্প প্রথমেতে চলে সর্প
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যেজন সাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে আনন্দসাগরে ভাসে
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥

বালক বলিয়া জগদম্বার ক্ষমা নাই। "লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া ওড়াবে না রতি মাষা।" এমন কি এক সময়ে জগন্নাথের গৃহিণী যেন আসিয়া বলিল "আয় বাপ কোলে আয়, বাড়ী যাবি চ, তোর আর জপে কাজ নাই।" বালক চঞ্চল হইতে না হইতে কর্ণকুহরে কে সুস্পষ্ট বলিয়া দিল "সাবধান—সাবধান"। বালক মা নয় বুঝিতে পারিয়া আবার তপে মগ্ন হইল।

ক্রমে রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে সুখতারা উঠিবার সময় হইয়া আসিল। পূর্ব্বদিক, অরুণোদয় হইবার কালে যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণে বিভূষিত হয়, সেইমত রূপ ধারণ করিল। মৃদুমন্দ মলয়পবন বালকের গণ্ডদেশ চুম্বন করিল। সহসা বসন্ত সমাগম হইল। দূরে পিকধ্বনি ও নিকটে ভ্রমর, গুঞ্জন স্পষ্ট শুনা গেল। বিবিধ সুগন্ধ কুসুমের সৌগন্ধে দিক পুরিয়া গেল। কোথা হইতে শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি সঞ্চার হইয়া অনিদ্রা, পরি-উপবাসের ক্লেশ মুহূর্ত্ত মধ্যে অপনয়ন করিয়া দিল। বালক দেখিল প্রফুল্লেন কাশে পুরোভাগে শনৈ শনৈ একখানি গাঢ় নীল কাদম্বিনীর উৎপত্তি—আজি

সহসা কাদম্বিনীর মধ্যস্থল ফাটীয়া গেল আর তন্মধ্যে হইতে কোটি-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল অথচ কোটী-চন্দ্র-সুশীতল অপরূপ মনোরম জ্যোতি সাগরে ভাসমানা মহাকালীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকটিত হইল।

সাধক এইরূপ দেখিয়াই একদিন ইমণ কল্যাণে গাহিয়াছিলেন—

কেরে কালকামিনী বাস পরিহারিণী।
চরণ তরুণ অরুণ নিকর, নখর নিভাতি নিন্দি নিশাকর,
উরু তরু রম্ভা নাভি সরোবর, নূকর কটিতে কিঙ্কিণী॥
পীযূষ পূর্ণিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত সুরাসুর নর,
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়, বামা নরমুণ্ডমালিনী।
তড়িত জিনি হাস্য কমলবদন, খঞ্জনগঞ্জিনী যুগল নয়ন,
ইযু শিশু শব সুশোভিত কর্ণে, বামা আধশশীভালিনী॥
আহা কিবা কান্তি এলো কুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে,
বামা গঙ্গাধরহৃদিহ্রদে জলে, শোভে যেন নীলনলিনী॥

বালক দেখিল—বুঝিল—আবার দেখিল। ইষ্ট দরশনে তখন নলিননয়নে নীরধারা ছুটিল। উঠিয়া মায়ের পদতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিল। বালক তখন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, চৈতন্য দেহ লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাষ্পে কণ্ঠ রোধ হইয়া যাইতেছে, কিছু বলিতে পারিতেছে না। মা বলিলেন "বাবা তুই আমার দুধের ছেলে—বাবা কোলে আয় তোকে কোলে করে আমি ধন্য হই। বর গ্রহণ কর।" বালক আনন্দে সুললিত সংস্কৃত ছন্দে স্তব করিতে লাগিল। মা সরস্বতী তখন বালকের জিহ্বায়, মা নীল সরস্বতী যে বালকের পুরোভাগে। বালক স্তবান্তে বলিল 'মা যদি বর দিবেন তবে রামাদাদাকে দিন'। মা হাসিয়া বলিলেন 'বাবা রামদাসের মৃত্যু হইয়াছে সে বর লইবে না—তুমি বর লও।'

বালক। মা, তুমি রামাদাদাকে বর দাও; তাকে বর দাও, তবে আমি বর লব।

মা। রামাদাদা মরিয়াছে সে কেমন করিয়া বর লইবে? তুমি দেখ না যে শব।

বালক। মা তুমি যদি রামাদাদাকে বর না দেও তবে আমার আর প্রয়োজন নাই। দর্শনে সব হইয়াছে; আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

মা তখন হাসিয়া বলিলেন "তাই হৌক"। জগদম্বা তখন রামদাসের মস্তক শিববাঞ্ছিত বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন, বলিলেন—

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি যোগনিদ্রাং পরিত্যজ।
পশ্য মে পরমং রূপং যথেপ্সিতং বরং বৃণু॥

রামদাস উঠিয়া মাকে দেখিল, নয়নক লোরে তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তখন বাত্যালাঞ্ছিত কদলীর ন্যায় ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, উঠিয়া দেবভাষায় রামদাস চঙ্গ স্তব করিতে লাগিল। স্তবান্তে বলিল "আর বাকী নাই, মুক্তি করতলগত, তবুও যদি বর দিবেন, মা এই বালকের সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা হৌক; বিচারে অজেয় হৌক।" দেবী বলিলেন "তথাস্তু"। তখন উভয়ে যুক্ত করে বলিলেন "মা গো তোমার চরণসরোজে যেন চিরকাল মনভৃঙ্গ মধু পান করিতে পায়"। মা বলিলেন "তথাস্তু"। তখন মা সেই নব ব্রহ্মচারী অষ্টম বর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। হরি হর ব্রহ্মা যাহা সর্ব্বদা বাঞ্ছা করেন, বালক সেই স্তন্যপীযূষ পান করিয়া দেবতা হইয়া গেল। মাও আশীর্ব্বাদ করিয়া আকাশপথে শূন্যে লীন হইয়া গেলেন। শ্মশানভূমি আর ঘোরান্ধকারে তিমিরাবৃত হইল না। তখন বালক ও রামদাসের উভয়ের দেহ হইতেই জ্যোতি নির্গত হইতেছে। তখন জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিল।

* * *

যথাকালে বালক ও রামদাস ভোলানাথকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সাধক ভোলানাথ দেখিয়াই চিনিলেন, সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বালককে ক্রোড়ে করিলেন ও মুখচুম্বন করিলেন। বলিলেন "বিচারে কাজ কি আমি পরাজয় পত্র লিখিয়া দিতেছি।" রামদাস বলিল "মহাশয় তাহা হইবার নহে। আপনাকে একবার ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া বালকের সঙ্গে বিচার করিতে হইবে।"

ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে। বালক আমার ধ্রুব প্রহ্লাদ অপেক্ষা যে বড়। উহার তুষ্টির জন্য তাহাই করিব।"

যথাকালে ত্রিবেণীতে বিচার হইল। ভোলানাথ মাকে আহ্বান করিলেন। দেখিলেন জগদম্বা বালকের মস্তকে। ভোলানাথ মনে মনে বলিলেন "মা এ কি হইল?" মা বলিলেন "বাবা ইহারা যে দুজন একদিকে—আজি

তোমার জয় হইবে না।" ভোলানাথ হাসিয়া বলিলেন, "মা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হৌক"। ভোলানাথ বিচারে পরাজিত হইলেন।

* * *

আমি সেইদিন রাত্রিতে ত্রিবেণীর মহাশ্মশান প্রণাম করিয়া আসিলাম, জগদম্বাকে মনে মনে কত কি জানাইলাম। ভোলানাথ, বালক ও রাম-দাসের আত্মাকে প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। পরদিন প্রত্যুষে স্বস্থান উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

নিত্য মহাপূজা।

কেন এত আয়োজন
আবাহন উদ্বোধন
কেন ঝরে আঁখি জল দিতে বিসর্জ্জন।
কেন মৃদুমন্দ রবে
ঘোষিছে চৌদিকে সবে
কি উচ্ছ্বাস, কি আনন্দে জীবন মগন॥

আসিতেছে মহামায়া
শৈলসুতা শিবজায়া
তাই সে আনন্দ এত ধরে না অন্তরে।
তাই সে মত্ত মানব
ভাই বন্ধু মিলি সব
পূতচিত্ত কৃতাঞ্জলি পূজিবে মায়েরে॥

হে মানব,
উন্মিলি নয়ন দ্বয়
হের নিত্য বিশ্বময়
আড়ম্বরে মহাপূজা হতেছে সাধন;
প্রতিদিন উদ্বোধন,
প্রতিদিন বিসর্জ্জন,
প্রকৃতির মহাপূজা নিতই নূতন॥

প্রতিদিন ঊষাদেবী
পবিত্রতা দীপ্ত ছবি
তরুণ অরুণ ভাতি মাখিয়া ললাটে—

রক্তবস্ত্র রবি করে
ঢাকি চারু কলেবরে
ডাকে 'আয়মা প্রকৃতি' কৃতাঞ্জলি পুটে॥

পাখী সুললিত তানে
থাকি লতার বিতানে
গাইছে সুন্দর গীতি প্রাণ মাতোয়ারা।
কুসুম নিহিত বাস
ব'হে মৃদুল বাতাস,
বিল্বদল আয়োজন হৃদি-সাজি-ভরা॥

সপ্তমীর পূজা অন্ত
শিশিরে দক্ষিণান্ত
মহা অষ্টমী পূজার হল আয়োজন।
সরসে নলিনীকুল
স্থলপদ্ম জবাফুল
ফুটে উঠে সেবিতে প্রকৃতির চরণ॥

পাপিয়া দোয়েলা বোলে
কোকিল কূজন রোলে;
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর থরতর হয়।
স্থিরা গম্ভীরা প্রকৃতি
'সন্ধি' পূজার মুরতি
'ক্ষণ' কালে হ'বে যেন প্রকৃতি প্রলয়॥

পশ্চিমে নলিনীপতি
ঢ'লে যবে ধীর গতি
কল্পারম্ভ নবমীর হয় সে তখন;
নীল চন্দ্রাতপ তলে
কুলবধূ কুতুহলে
সালঙ্কৃতা হ'য়ে বন্দে দেবীর চরণ॥

পূর্ণকুম্ভ পুরনারী
পূরিয়ে আনয়ে বারি
প্রকৃতি দেবীর তায় হয় পূতস্নান।
নিত্য নিত্য বলিদান
জীবের মহাপ্রস্থান
নিত্য যম-যূপকাষ্ঠে হয় সংপ্রয়াণ॥

পশ্চিম গগন প্রান্তে
সন্ধ্যারবি দিবসান্তে
মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পড়ে গো ঢলিয়া

দিব্য দিগঙ্গনাগণ
পরি লোহিত বসন
কুলবধূসহ মিলি কোমর বাঁধিয়া

হাতেতে বরণডালা
কা'র হাতে ফুলমালা
যেন শত দেববালা করিছে বরণ।

নিরানন্দে মা প্রকৃতি
যেন মসীময়ী মূরতি
অস্তপ্রায় রবিসহ মা'র বিসর্জ্জন॥

আধ্ ফুটো ফুলকলি
বেলা জুঁই কৃষ্ণকলি
পুরো ফুটি সগৌরবে সৌরভ বিলায়।

মলয় পরশে তায়
কুসুম গরবে চায়
'বিজয়া' উৎসবে মাতি ঢ'লে প'ড়ে গায়॥

কর্ম্ম 'সিদ্ধি' বড় সিদ্ধি
কর্ম্মক্ষেত্রে বাড়ে বৃদ্ধি
সেই নেশায় মানব সদা মাতোয়ারা

শির নাড়ি তরুরাজি
আলিঙ্গন করে আজি
নিশর্গসুন্দরী সাজে সঙ্গে সখীতারা॥

বায়স কর্কশ স্বরে
পেচক তাহার সুরে
মিলাইয়া তান গায় বিসর্জ্জন গান;

ঘোর অন্ধকার আসি
বেড়িল যে দশদিশি
জীবন আঁধারময় কবির মরণ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

যৌনসারী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সমাজগঠন।

মোটামুটি বলিতে গেলে যৌনসারে ব্রাহ্মণ, রজপুত (ক্ষত্রীয়) ও শূদ্র এই তিন জাতির বাস। সংখ্যায় রজপুতই সর্ব্বপ্রধান, তন্নিম্নে শূদ্র, ব্রাহ্মণ অতি স্বল্পসংখ্যক। পূর্ব্বে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ও রজপুতের আমরণ দাসত্ব করিয়া জীবনযাপন করিত। দাসবংশসম্ভূত প্রত্যেক নরনারীই প্রভুবংশের কিঙ্কর কিঙ্করী বলিয়া পরিগণিত। এখনও এ প্রথার একেবারে বিলোপ হয় নাই। ইহাদের হাতে এখনও টাকা পয়সা যাইবার রীতি নাই; ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে প্রভুহস্তে অর্পিত হয়। পক্ষান্তরে প্রভু দাসপরিবারের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি যাবদীয় ভার গ্রহণ করেন। শূদ্রজাতির মধ্যে বাজ্‌কী ও কোল্‌টার সংখ্যাই অধিক। কোল্‌টা কতকটা চামারের সমশ্রেণীস্থ। গ্রামের গৃহস্থেরা সকলেই কিছু কিছু করিয়া শস্য কোল্‌টাকে দিয়া থাকে—কোল্‌টা স্বগ্রামের সমস্ত লোকের জুতা প্রস্তুত করিয়া দেয়। দরদস্তুর টাকা পয়সার বালাই নাই। বাজ্‌কী আর কেহ নয়—বাদ্যকর। এই দুই জাতিকে গ্রামের একপ্রান্তে পৃথকভাবে বাস করিতে হয়। লৌহকার, নাপিত, দরজী প্রভৃতি আরও কয়েকটি শূদ্রজাতি আছে, ইহাদিগকে দাসত্ব করিতে হয় না।

ব্রাহ্মণ ও রজপুতের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হওয়া বিরল নয়, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে রজপুতকন্যার পাণীগ্রহণ যত সহজ রজপুতের পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা গ্রহণ তত সহজ নয়। পরিণীতা হইলেও ব্রাহ্মণস্বামী রজপুতদুহিতার অন্ন গ্রহণ করেন না, ও তদগর্ভজাত সন্তানগণ কৌলীন্যের অধিকারী হয় না। এইরূপ শঙ্করবিবাহ অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। কুলমর্য্যাদা কাহারও কন্যাগত নয়, অর্থাৎ কন্যা বা ভগ্নীকে যে কেহ বিবাহ করুক, তাহাতে বড় একটা এসে যায় না।

বিবাহ-প্রথা।

এইটিই অতি রহস্যময় ব্যাপার। বস্তুতঃ বিবাহবিষয়ে রহস্য আছে বলিয়াই কি দেশের নাম যৌনসার হইয়াছে?* বিবাহক্রিয়াকে ইহারা ঝাঁজেরাই বলে।

*যৌন=বিবাহসম্বন্ধীয়; সার=রহস্য।

প্রথমে বরপক্ষীয়েরা কন্যা মনোনীত করেন। ইহাতেই বুঝিতে হইবে কন্যারই গৌরব অধিক। কন্যার পিতৃগণ (!) সম্মত হইলে বরপক্ষের ঘটক স্থলাভিষিক্ত কয়েকব্যক্তি কন্যার পিত্রালয়ে গমন করিয়া 'থানবাঁধা' নামক শুভকার্য্য সম্পাদন করে। এই সময়ে উহাদিগকে তৈলপক্ক লুচি খাওয়ান হয়, ইহারই নাম 'খান', ও উহারা কন্যাকর্ত্তাদিগকে এক টাকা বা দুই টাকা বায়নাস্বরূপ দেয়, ইহার নাম 'বাঁধা'। কথাবার্ত্তার মধ্যে বরেরা কয় ভাই ও কন্যাযাত্রী কতগুলি হইবে, ইহাই প্রধান। অতঃপর ব্রাহ্মণ দিন দেখিয়া দেন। শুভদিনের পূর্ব্বদিন বরপক্ষের তিন চারিজন লোক সন্ধ্যার সময় কন্যাগৃহে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামান্তে নৃত্য করিতে থাকে। কন্যা-কর্ত্তারা ছাগ বা মেষ বলিদান করিয়া প্রচুর মদ্যের সহিত ইহাদের সম্বর্দ্ধনা করে। পরদিবস আহারান্তে কন্যাকে হাঁশুলী ঝুম্‌কা প্রভৃতি অলঙ্কার ও নববস্ত্রে সুশোভিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কন্যাযাত্রীর সহিত বরগৃহে প্রেরণ করিতে হয়। বর বিবাহ করিতে আসে না, ক'নেই বিবাহ করিতে যায়। কুমারী কন্যাকে ইহারা 'ধ্যানটুরী' বলে। বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই, কন্যার পিতৃগণকে বিবাহের জন্য ব্যস্ত না হইবার ইহাই অন্যতম কারণ। ধ্যানটুরী অল্পবয়স্কা হইলে লোকের পীঠে চড়িয়া যাইবার নিয়ম আছে, নতুবা পদব্রজে যাইতে হয়;—পাহাড়ে ত গাড়ী ঘোড়া বা পাল্কীর ব্যবহার নাই। সকলে বরগৃহে পৌঁছিলে আর একবার খুব নৃত্য করা হয়, এবং সাধ্যানুসারে যতগুলি সম্ভব ছাগ বা মেষ বধ করিয়া অবাধ সুরাস্রোত বহাইয়া দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণের বিবাহে মেষমাংস ও সুরার ব্যবহার নাই, তৎপরিবর্ত্তে ছাগমাংস ও ঘৃত ব্যবহার হয়। রজপুতেরা সুরাপান ও বহুলোক সমাগম শ্লাঘার বিষয় মনে করে। পানাহারের পর কন্যাযাত্রীরা স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়, এবং কন্যা তদবধি 'রোহিণটুরী' (বধূ) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এ বিবাহে পুরোহিত বা মন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই, সুতরাং এইখানেই শুভকার্য্য সমাপ্ত। এই সহজসাধ্য প্রক্রিয়ায় বালিকা কিন্তু অনেকগুলি পতি পাইল। কারণ এ প্রদেশে পাণ্ডবদিগের প্রথা প্রচলিত। বাড়ীতে যে কয়টি ভাই আছে, নব-বধূ সকলেরই স্ত্রী হইল। ভবিষ্যতে সন্তানাদি যাহা হইবে তাহারা ঐ কয়েক ভাইকেই বাপ বলিবে। ডাকিবার সময় 'বড়বাবা' 'মেজবাবা' ইত্যাদি, অথবা পিতৃগণ বয়সে ছোট হইলে নাম ধরিয়া 'রামসিং বাবা' 'মঙ্গলা বাবা' বলিয়া ডাকিতে হয়। সুতরাং ভাসুর, দেবর, খুড়া, জ্যেঠা, খুড়ী, জ্যেঠী, খুড়তুতো ভাই, জ্যেঠতুতো ভাই প্রভৃতি সম্পর্কসূচক শব্দ যৌনসারী ভাষায় স্থান পায় নাই। এই কদর্য্য প্রথার ইহারা একটা বিশেষ সুবিধা দেখায় যে গৃহবিবাদের সম্ভাবনা রহিত থাকে, এবং গৃহস্থের ভূসম্পত্তি বিভক্ত হইতে না পারায় সাংসারিক অবস্থার অবনতি হইবার আশঙ্কা কম থাকে। অবস্থা স্বচ্ছল হইলে একই ব্যক্তির একাধিক রমণীর পাণীগ্রহণেও বাধা নাই, কিন্তু ভাই থাকিলে তাহার একটা দাবি চিরকালই মানিতে হয়। এমনও দেখা যায় যে, শ্বশুরগণ ও শ্বশ্রূঠাকুরাণী জীবিত থাকিলে বধূর গৃহে আসিবার পরেও স্বামীসংখ্যা কিছুকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধনশীল থাকিয়া যায়; তেমন তর ঘরে নবজাত স্বামী রাখিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যু ঘটিলে, তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া প্রতিপালন করিবার ভার অগত্যা বধূকেই গ্রহণ করিতে হয়, পরে ঐ শিশুও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া স্বামিত্বের দাবি না করিতে পারে এমন নয়।

বিবাহবন্ধন ত এইরূপ, বিচ্ছেদেরও বেশ সুব্যবস্থা আছে। বধূ যদি কোনও পরপুরুষের অনুরাগিণী হয়, অনায়াসে তাহার গৃহে চলিয়া যাইতে পারে। সে ব্যক্তি কেবল বধূর পূর্ব্বসংসারের স্বামীদিগকে বিবাহের খরচের দ্বিগুণ মুদ্রা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে বাধ্য হয়। প্রায়ই আপোষে নিষ্পত্তি হয়, তদবস্থায় কিছু কমেও রফা করা চলিতে পারে। এইরূপ উত্তরোত্তর পণবৃদ্ধি হওয়ায় বয়সের অনুপাতে মূল্যও বাড়িতে থাকে; বোধ হয় এই কারণে তিনের অধিক পক্ষসংখ্যা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে যদি কোনও কারণে বরেরা কন্যাকে অপছন্দ করে তবে তাহাকে বাপেদের বাটীতে পাঠাইয়া দেয় ও শ্বশুরদিগের নিকট হইতে বিবাহের খরচা আদায় করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ নয়। এইরূপ ত্যাগের নাম ছুট্। বোধ করি যৌনসারী ভাষায় second-handএর প্রতিশব্দ নাই; কারণ এ প্রকারে হাত ফেরতা হইলেও কন্যার মূল্য কমে না। তাহার পিতৃগণ অম্লানবদনে টাকাকড়ি দিয়া জামাইদিগকে রোকৃশোধ করিয়া দেন এবং অচিরাৎ পুনরায় কন্যার বিবাহ দিয়া নূতন জামাইদিগের নিকট হইতে ঐ পরিমাণ টাকা আদায় করেন। ফলতঃ কুমারীবিবাহই সবচেয়ে অল্পব্যয়সাধ্য, নিকায় খরচ বেশী!—বিচিত্র নয় কি?

জাতকর্ম্ম।

বিশেষ আড়ম্বর কিছুই হয় না। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে প্রথম পুত্র জন্মিলে দশম দিবসে বাদ্যকরেরা বাদ্যতাণ্ডবসহ বিলক্ষণ একটা কোলাহল করে। কতকটা এইরূপ প্রথা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। গৃহস্থ বাদ্যকরদিগকে পারিতোষিকাদি দ্বারা তুষ্ট করে এবং ব্রাহ্মণগণকেও সাধ্যানুসারে অর্থদান করে। ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি আর কোন কার্য্যই হয় না।

উপনয়ন।

ক্ষত্রীয়ের আদৌ হয় না। ব্রাহ্মণের মধ্যেও যাঁহাদিগকে পূজা পাঠাদি যাজনক্রিয়া করিতে হইবে, তাঁহাদেরই উপনয়নের প্রয়োজন, নতুবা না হইলেও চলে। প্রকরণও অতি সহজসাধ্য। উপনেতব্য বালকের পিতা, পুরোহিত, স্থানীয় অপর একটি ব্রাহ্মণ ও একটি নাপিত সমভিব্যাহারে, কোনও স্রোতস্বিনীতীরে গমন করিয়া বালকের মস্তক মুণ্ডন করান, এবং (সঙ্গতি থাকিলে নূতন বস্ত্রের সহিত) উপবীত ধারণ করাইয়া ও অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃতাহুতি দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিশেষ সঙ্গতি ও যশোলিপ্সা থাকিলে নদীতীরে দুই চারিটি ব্রাহ্মণভোজন করাইবারও রীতি আছে।

মৃতসৎকার।

কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, সর্ব্বাগ্রে বাদ্যকরগণ আসিয়া ঢাক ও ভেরী বাজাইতে থাকে। বাজনার তাল ও ভেরীর সুর স্বতন্ত্র ধরণের হওয়ায়, বাদ্য শুনিয়া তদ্দণ্ডেই চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারে অমুক গ্রামে আজ কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। যদি সেই গ্রামে কাহারও আত্মীয়-স্বজন থাকে, সে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া তথায় উপস্থিত হয়। গ্রামেরও স্বজাতীয় সকলে একত্র হয়। তারপর সুপ্রশস্ত দেবদারুতক্তার উপরে শব-দেহকে শোয়াইয়া উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া ও মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে শ্মশানে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে চিতা সাজায়। ব্রাহ্মণের উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রাদিও পাঠ করিবার নিয়ম নাই। চিতার অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্জ্বলিত হইলে সকলে

গৃহে ফিরিয়া যায়। চিতা ধুইবার রীতি নাই। সঙ্গতি ও প্রবৃত্তি থাকিলে তৃতীয় দিবসে অস্থিচয়ন করিয়া রাখিয়া দেয়, পরে শীত ঋতুতে কোনও সময় হরিদ্বারে লইয়া গিয়া সুরধুনীসলিলে নিক্ষেপ করে। শ্মশানকে ইহারা 'মড়াসন' বলে। যাহাদের পূর্ব্ব হইতে আয়োজন থাকে তাহারা মড়াসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমবেত আত্মীয়মণ্ডলীকে ছাগমাংসাদি দ্বারা উত্তম-রূপে আহার করায়, নতুবা তৃতীয় বা পঞ্চম দিনে ঐরূপ ভোজ দিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ অপরিজ্ঞাত।

প্রধানপর্ব্ব।

যৌনসারীদের পর্ব্বদিনের মধ্যে মহাবিষুব সংক্রান্তিই সর্ব্বপ্রধান। ইহাকে ইহারা 'বিষু' বলে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই 'বিষু' পরব আসামেও অতি প্রসিদ্ধ। ষ-কারের স্থানে হ-এর আদেশ হওয়ায় তথায় ইহাকে 'বিহু' বলে। কার্য্যকলাপও উভয়ত্র প্রায় এক। ঐ সময় স্থানে স্থানে দেবসমীপে মেলা হয়; মেলায় নৃত্যগীতের খুব ধুম লাগিয়া যায় এবং বলিষ্ঠ ও কৌশলী যুবকগণ একত্রিত হইয়া তীরধনুক লইয়া দলে দলে কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই সুযোগে প্রবীণেরা সম্বৎসরের প্রায় সমস্ত ঘটকালীর কথাবার্ত্তার সূত্রপাত করিয়া রাখেন এবং দূরদূরান্তর-সমাগত যুবকযুবতী-দিগের চারিচক্ষুর শুভসংমিলনে পূর্ব্বরাগেরও সঞ্চার হয়। এই সকল কারণে এই মেলা সকলেরই অতিপ্রিয়।

গার্হস্থ্য-জীবন।

প্রতি বৎসর বরফ গলিয়া গেলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রত্যেক গৃহস্থ সঙ্গত্যনুসারে কয়েকটি ছাগ ও মেষকে অন্ধকারগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে ও তথায় প্রচুর আহার্য্য যোগাইতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পশুগণ কয়েক মাসেই নিতান্ত পীবরতনু হইয়া উঠে, প্রায় দৃষ্টি ও চলৎশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে, ক্রমে জীবিত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এইরূপ এক একটা পশু বধ করিলে দেড়মণ দুমণ মাংস পাওয়া যায়। আর ধান্য হইতে চোয়াইয়া যথাকালে প্রচুর পরিমাণে সুরাও প্রস্তুত করিয়া রাখে (দয়াবান্ ইংরাজগবর্ণমেণ্ট ইহাতে আপত্তি করেন না)। এই দুইটিই হইল শীত নিবা-রণের ব্রহ্মাস্ত্র। এ ছাড়া জ্বালাইবার জন্য প্রচুর কাষ্ঠও আহরণ করিয়া

রাখে। পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে যখন ভয়ঙ্কর শীত হয় ও বরফ পড়িতে থাকে, তখন হইতে প্রায় কেহই ঘরের বাহির হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিন কাটায় না। সম্বৎসর ধরিয়া ছাঁটিয়া ছাঁটিয়া অনেক মেষের লোম একত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—এখন ঝাড়িয়া বাছিয়া ধুনিয়া তাহা হইতে সূতা কাটিতে হইবে, পরে সূতা লইয়া শীতবস্ত্র বুনিতে হইবে। পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রাদি যুড়িয়া কাঁথা সেলাই করিতে হইবে। ইত্যাদি বহু প্রকারের কাজ থাকে। গৃহ সাধারণতঃ দ্বিতল, ক্বচিৎ দুই একটি ত্রিতল; দেখিতে বেশ সুশ্রী। উপরতলায় গৃহস্থ বাস করে, মাঝের তলায় শস্যাদি রাখা চলে, সর্ব্বনিম্ন তলে পশুদিগকে আবদ্ধ রাখা হয়। প্রতি গৃহে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ—একটি যেন লম্বা হল্; তাহারই এড়োদিকের একপাশে একটি বারাণ্ডা থাকে। শীতাধিক্য বশতঃ জানালা গবাক্ষ প্রভৃতি বড় একটা রাখা হয় না।

ঐ উপরের হলের মধ্যস্থলে শীতারম্ভে আগুনজ্বালা হয়। অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সকলে ঘেরিয়া বসে। মহিলাগণ প্রায়ই একটা না একটা কাজ হাতে করিয়া বসিয়া যান। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা উপকথা বলিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে কথাবিশেষের বিরামস্থলে গানবাজনা খানিকক্ষণ ধরিয়া হয়। কতক একপাশে বসিয়া হয়ত কড়ি লইয়া খেলা করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সুরাপাত্রের সঘন পরিক্রম এবং মাংস ও পিষ্টকের প্রতি সময়োচিত সদ্ব্যবহার প্রায় অবিরাম চলিতে থাকে। কুটুম্বিতা করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। বৃদ্ধেরা কন্যা ও জামাইদিগকে দেখিতে আর যুবকগণ ভগ্নী ও ভগ্নীপতিদিগকে দেখিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া তত্তৎস্থানের পারিবারিক আনন্দস্রোতে পূর্ণপ্রাণে গা ভাসাইয়া দেয়। ভিতরে এই আনন্দকোলাহল বাহিরে, নদী গিরি বন উপবন রজৎবর্ণবৎ ধবল বরফরাশিতে ঘনাচ্ছাদিত। পক্ষিগণ দেশান্তরে পলাইয়া গিয়াছে, কীটপতঙ্গাদি বিবরে লুক্কায়িত, পশুগণ গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইয়াছে; প্রকৃতি আজ নিবাতনিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, দিবারাত্র একইভাবে সুষুপ্ত বা যোগনিরত। একদিকে এই প্রকৃতিকে দেখিলে তাহার শান্তিময় সুশীতল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ঘুমাইতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইবার নিমিত্ত যেমন একটা তীব্র বাসনা জন্মে, অন্যদিকে তেমনই কুটিরদ্বারে দাঁড়াইয়া পারিবারিক শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য

বিরল অনাবিল আনন্দস্রোতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উহাদেরই একজন হইয়া অমনি করিয়া আগুন পোহাইতে পোহাইতে উপকথা ও গান শুনিতে বড় সাধ হয়।

কিন্তু হায়! যৌনসারীর এই সুখচন্দ্রমায় কালমেঘের অস্বচ্ছায়া পড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই। তথা কথিত সভ্যতা ও বিলাসিতা যৌনসারের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতে ভুলিয়া যায় নাই। এখন সিয়ানারা ও অন্যান্য গণ্যমান্য যৌনসারীরা ঘরের বোনা মোটা কম্বলের উল্‌টা সেলাই করা জামা গায়ে দিয়া ও গ্রামের কোল্‌টার হাতের কম্বলের জুতা পায়ে দিয়া গ্রামান্তরে বা চাক্‌রাটায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন—বিলাতী জিন্ বা অপকৃষ্ট ছিটের জামা গায়ে দিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করা, ও তাঁহারা যে ক্রমে সভ্যতার আলোকে আসিতেছেন বৈদেশিক সভ্য লোকদিগকে ইহা জানান, আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন। যৌনসারীসুন্দরী স্বচ্ছপ্রস্রবণসলিলে রূপচ্ছটার প্রতিবিম্ব দেখিয়া এখন তেমন তৃপ্তিলাভ করেন না, তাঁহার দর্পণের দরকার। তাঁহার মাথা বাঁধিবার জন্য ভাল নক্সাকাটা চুনুরী না থাকিলে বিষুব মেলাচত্বরে নৃত্যকালীন চিরচঞ্চল পদযুগল অকস্মাৎ অত্যন্ত ভারী ও অবশ বোধ হয়—তালভঙ্গ হইবার নিতান্তই সম্ভাবনা। পিতলকাঁশার গহণাও ক্রমে বিরল প্রচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায়, সকলেরই অল্পবিস্তর নগদটাকার প্রয়োজন আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা অশান্তির ছায়া আসিয়া অনাবিল উজ্জ্বল সনাতন চিত্রকে এখনই কিয়ৎপরিমাণে মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। সাবান, পোমেটাম, রেশমীফিতা, বারাণসীশাড়ী, গা-ভরা সোণার গহনা, নেক্‌টাই, নিকার্‌বকার্ প্রভৃতি মহারথীগণ এখনও পাহাড়ের পাদমূলে থাকিয়া কেবল সতৃষ্ণনয়নে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। কে বলিতে পারে ইহারা একদিন যৌনসারে জয়পতাকা উড্ডিন করিবেন না। তখন যৌনসারবাসীর কি অবস্থা হইবে দেখিতে ইচ্ছা হয় কি?—নিজ-বাটীর সদরদরজায় দাঁড়াইয়া অন্দরের দিকে যতদূর নজর চলে ভাল করিয়া তাকাও, তাহার জীবন্ত প্রতিকৃতি বিকটহাস্যে তোমাকে বিদ্রূপ করিতে থাকিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কায়িক কষ্ট করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের নানারূপ নাম আছে। যাহারা এক বা দুই বাহু ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া রাখে তাহারা "ঊর্দ্ধবাহু"। যাহারা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া থাকে তাহারা "আকাশমুখী"। যাহারা নখ রাখে তাহারা "নখী"। "ঠাড়েশ্বরী"রা সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকেন।

ঊর্দ্ধমুখী। বৃক্ষশাখায় পা বন্ধন করিয়া নিম্নে মস্তক রাখিয়া তপস্যাকারীর নাম।

পঞ্চধূনী। পঞ্চস্থানে অগ্নি রক্ষা করিয়া উপাসনাকারী।

জলশয্যা। সায়ংকাল হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শরীর জলমগ্ন রাখিয়া তপস্যাকারী।

জলধারা। সন্ন্যাসী একটি খাতে বসেন, মস্তকে জলধারা দেওয়া হয়। রাত্রিকালে এবং প্রচণ্ড শীতের সময়েও এই তপস্যা করা হয়।

কড়ালিঙ্গী। শিশ্নদেশে একটি লৌহকুণ্ডল দিয়া রাখেন।

ফরারী। কেবল ফলমূল খাইয়া থাকেন।

দুধধারী। কেবল দুগ্ধ পান করেন।

অলূনা। আলুনী খান (বৈষ্ণবদিগেরও এই সকল শ্রেণী আছে)।

অওঘড়। শৈবসন্ন্যাসী ব্রহ্মগিরি গোরক্ষনাথের বরে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। শিষ্যপ্রণালী নাই। গুজরাটদেশে ইহাদের আড্ডা। ব্রহ্মগিরিকে গোরক্ষনাথ বরকালে কর্ণের কুণ্ডল আদি দান করেন। ব্রহ্মগিরি আবার দান করেন। তাহারাই "রুখড়" "সুখড়" সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন।

রুখড় সুখড় গুদড় উখড়। ইহারা কোন সন্ন্যাসী মরিলে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকে ও তাহার ত্যাজ্যসম্পত্তি গ্রহণ করে. ইহাই বৃত্তিরূপে অবলম্বিত। ইহাদের পরিধান থেল্‌কা। কর্ণে তাম্র বা পিত্তল কুণ্ডল ধারণের রীতি আছে। গুদড়েরা এক কর্ণে কুণ্ডল অপর কর্ণে তামার ডিস্কি দেয়। ইহারা সকলেই ভিক্ষা করে। গুদড়েরা ধূনুচীতে ও রুখড় সুখড়েরা নারিকেল মালায় ধূপাগ্নি রাখে ও ভিক্ষাদ্রব্য তাহাতেই গ্রহণ করে। এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা মদ মাংস খায় তাহারাই "উখড়"।

ভূখড় কুকড়। ভূখড়েরা অগ্নি রাখে না। খর্পর লইয়া ভিক্ষা করে। কুকড়েরা একটি নূতন হাঁড়ী লইয়া ভিক্ষা করে এবং উহাতেই পাক করে। হাঁড়ীর নাম "কালীহাঁড়ী"।

অবধূতানী। স্ত্রীলোক সন্ন্যাস লইলে "অবধূতানী" বা "অবধূতী" হয়। মুণ্ডমাল তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে বলিয়াছেন অবধূতী সাক্ষাৎ শিবারূপিণী।

"অবধূতী শিবাদেবী অবধূতাশ্রমংশৃণু"।

ইহাদের বেশ সন্ন্যাসীর ন্যায়। ভিক্ষাবৃত্তি ও তীর্থ পর্য্যটন কার্য্য। প্রথম "অবধূতী"র নাম গঙ্গাগিরি। পুরুষগণ স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসমন্ত্র দেন না। অবধূতীর গুরু অবধূতী।

গৃহাবধূত বা "ঘরবারী"। মুণ্ডমালা তন্ত্রে গৃহাবধূতের বিবরণ আছে। অর্থাৎ তাঁহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারী। ইহার বর্ত্তমান নিকৃষ্ট অনুকরণ হইতেছে "ঘরবারী সন্ন্যাসী"। স্বগোত্র বিবাহের ন্যায় ইহাদের স্বার্থবিবাহ নিষিদ্ধ। পুরীতে পুরীতে বিবাহ হইবে না, গিরিতে পুরীতে হইবে।

ঠিকরনাথ। বহুছিদ্রযুক্ত মৃত্তিকাপাত্রে ইহারা ভিক্ষা লয় বলিয়া নাম ঠিকরনাথ। ললাটে মসী ও সিন্দুর লেপন করে, ঠিকরে অগ্নি রক্ষা করে। শিকল, চিম্‌টা বা শলাকা উত্তপ্ত করিয়া দেহকে যন্ত্রণা দেয়, জাতিভেদ বা অন্নভেদ নাই। মদ্য মাংসেরও ব্যবহার আছে, গুজরাট গির্ণার আবু অঞ্চলে প্রধান আড্ডা।

স্বর্ভঙ্গী। কোন বিচার নাই। ইহারা অঘোরীদের শাখা বলিয়া পরিচয় দেয়। সকল দ্রব্যই আহার ও পান করিতে পারে।

ত্যাগসন্ন্যাসী। কিছু চান না, আহার হইল হইল, না হইল না হইল। বহুদিন উপবাসী থাকিতেও ক্লেশ নাই। ইহারা অতীব পূজ্য। কাশীর ৺তৈলঙ্গ স্বামী এইরূপ ছিলেন।

আতুর সন্ন্যাসী। মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণকারীর নাম। মৃত্যু না হইলে কিন্তু গৃহে ফিরিতে পান না।

মানসসন্ন্যাসী। মনে মনে সন্ন্যাস করেন। বাহিরে কোন চিহ্ন ধারণ করেন না।

অন্তসন্ন্যাসী। একস্থানে উপবেশন করিয়া অনশন ব্রতাবলম্বনে ভগবচ্চিন্তায় প্রাণত্যাগ করেন।

ব্রহ্মচারী। ইঁহারা দশনামীর নাম প্রাপ্ত হন না। কিন্তু এক এক মঠের এক এক প্রকার ব্রহ্মচারী আছেন। শঙ্করাচার্য্যের উত্তর মঠের "আনন্দ", পূর্ব্ব মঠের "প্রকাশ", দক্ষিণ মঠের "চৈতন্য" ও পশ্চিম মঠের "স্বরূপ" ব্রহ্মচারী। এই ব্রহ্মচারীরা শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্বকালীন আশ্রমের ব্রহ্মচারী নহেন। নির্ব্বাণতন্ত্র মতে ইঁহারা গেরুয়া পরিধান ও ফলমূল আহার করেন, চুল নখাদি রক্ষা করেন, তাম্রযুক্ত রুদ্রাক্ষমালা কর্ণে ধারণ করেন ও হস্তে ত্রিশূল রাখেন। "উদ্বাহতত্ত্ব" আদিত্য পুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মচারীর পক্ষে কি নিষেধ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তন্ত্রে কিন্তু উদাসীন ও গৃহস্থ দুই প্রকার ব্রহ্মচারীর কথা আছে। গৃহস্থ ব্রহ্মচারী ঋতুকাল ব্যতিরেকে স্ত্রীসংসর্গ করিবে না—এতটা উদারতা আছে।

যোগী। যোগ সম্বন্ধে পরে বিশেষ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা আছে। যোগীগণ অধুনা শৈবসন্ন্যাসীদের সঙ্গে পরিগণিত হইয়া থাকেন বলিয়া নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র। বিশেষ বিবরণ এখন কিছুই দিলাম না। যোগীরা হয় সাকার না হয় নিরাকার দেবতার ধ্যান করেন। সগুণ ধ্যান দ্বারা তাঁহারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন আর নির্গুণ ধ্যান দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ভগবানে লীন হইতে পারেন। বর্ত্তমানকালে যোগীদেরও অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে। কনফট্ যোগী, অঘড় যোগী, মচ্ছেন্দ্রী যোগী, ভর্ত্তৃহরি যোগী, শরেঙ্গীহার, ডুরীপার, কানিপা, অঘোরপন্থী। স্ত্রীলোকে যোগ করিলে "যোগিণী" হয়। গৃহস্থও যোগের অধিকারী। যোগসিদ্ধ হইলে লোকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ইচ্ছামত দেহ হইতে প্রাণ বাহির করিয়া যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারেন এবং ইচ্ছামত দেহধারণ করিতে পারেন। ষট্‌চক্রভেদ ইঁহাদের প্রধান সাধন।

লিঙ্গোপাসনা। ভারতের দাক্ষিণাত্যে মহাদেবের লিঙ্গপূজাকারী সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের নাম লিঙ্গয়েৎ, লিঙ্গবন্ত ও জঙ্গম। বাসব নামক এক ব্রাহ্মণ নূতনভাবে ১১৬০ খৃঃ এই লিঙ্গ-পূজা প্রচার করেন, সম্প্রদায়ের নাম হইল "জঙ্গম"। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে। "বাসব-পুরাণ" সর্ব্ব প্রধান। শ্রীশৈল ও কালহস্তী ইঁহাদের তীর্থস্থান। শিবরাত্রি ব্রতপালন প্রধান কার্য্য। ইঁহাদের মতে গুরু লিঙ্গ জঙ্গম এই তিনটি পরম পবিত্র পদার্থ। ইঁহাদের শবদাহ নাই। যাহারা কাশীর কেদারের ঘরে ব্যভিচার

দৃষ্ট হয় বলিয়া হিন্দুসমাজে ঘৃণা করে, তাহারা প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত নহে। কাশীর কেদারনাথের পাণ্ডারা জঙ্গম। ইঁহাদের মধ্যে গুহ্য সাধনপ্রণালী আছে। স্ত্রী নিজ পতি সহবাস না করিয়া দেবীভাবে স্বেচ্ছানুসারে অন্য পুরুষে অনুরক্ত হইতে পারে। হায়! ভাব বুঝিবার অসমর্থতায় পবিত্রতার কি ব্যাঘাতই ঘটিয়াছে? দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় আর অধিক খুলিতে পারিলাম না।

ভোপা। ভৈরবের উপাসক। কেশ শ্মশ্রু ধারণ করে। ললাটে সিন্দুর ধারণ করে, পায়ে ঘুঙ্গুর পরে। ভৈরবের গুণ গান করে ও ভিক্ষা করে। কেহ কেহ শিকল ধারণও করিয়া থাকে। পশ্চিমেই দৃষ্ট হয়।

দশনামী ভাঁট। বৈষ্ণবদের ন্যায় ইহারাও ভাঁট। ইহারা দশনামীর অন্তর্গত নয়। কিন্তু ইহারা দশনামী ছাড়া আর কাহারও ভিক্ষা গ্রহণ করে না। ঘটকদের ন্যায় ইহারা দশনামীদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে ও মুখস্থ বলিতে পারে। ইহারা গৃহস্থ। সুরাপানে দোষ নাই।

চন্দ্রভাঁট। ইহারা ভিক্ষুক। অনেকে একত্র হইয়া স্ত্রীপুত্র আদি সঙ্গে লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে ও ভিক্ষা করে। ইহারা বানর ছাগল প্রভৃতি জন্তু পোষে ও তাহাদের নাচ ও খেলা দেখায়। নিজেরাও স্ত্রীপুরুষে নৃত্য গীত করে। ইহারা শিবের কোঁচ ও কোচনীদিগের অনুকরণকারী।

শাক্ত সম্প্রদায়।

শক্তির উপাসকেরা শাক্ত। কালী তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি শক্তি। গুরু দীক্ষা সময়ে শিষ্যকে একটি বীজ প্রদান করেন। উদ্দেশ্য, শিষ্য সেই বীজ জপিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। সাধারণ্যে বীজ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সিদ্ধিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বেদ ও অপর শাস্ত্রানুসারে সাধনা করিতে অনেক সময় লাগে কিন্তু তান্ত্রীকী দীক্ষা শীঘ্র ফলপ্রদ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন কলিতে তন্ত্রই প্রশস্ত, কলিতে বৈদিক মন্ত্র নির্বিষ সর্পের ন্যায়। যেমন বিকার সেইরূপ বিষ ঔষধ, কলিতে তন্ত্রসাধনই প্রশস্ত। রামকৃষ্ণ পরমহংস দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে থাকিয়া প্রথমেই তন্ত্র সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, বাদসাহী আমলের টাকা

এখন চলে না—তোমার চল্লিশ বৎসর পরমায়ু, ইহার মধ্যে তোমাকে সব শেষ করিতে হইবে; তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিতে আজ্ঞা দিলে তুমি কি করিবে? ভিন্ন ভিন্ন দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বীজ আছে। তন্ত্রে দেখুন। গুরুমুখে না পাইলে বীজ নিষ্ফল, কেতাব দেখিয়া বীজ সংগ্রহ হয় না।

তান্ত্রিক সাধনায় ভিন্ন যুগের যাঁহারা সিদ্ধ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আমরা একস্থলে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং আর উল্লেখ করিলাম না। কলিতেও অনেক তন্ত্রসাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, পূর্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, গঙ্গেশ, জগন্নাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ও রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি।

তান্ত্রিক সাধকের প্রধান অবলম্বন গুরু। গুরু ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। দেবতাগণ রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই। শাস্ত্রে গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। মুণ্ডমালা তন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন—

গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রজ্জাতা তু দেবতা।
অতএব বরারোহে! দেবতায়া পিতামহঃ।
পিতৃশ্চ ভাবনাদ্দেবি যথা চৈব পিতুঃ পিতুঃ
তদুদ্ভব স্তোষমেতি বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ।

গুরু হইতে মন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং মন্ত্র হইতে দেবতা জন্মগ্রহণ করেন, বরারোহে গুরুদেব তজ্জন্য ইষ্টদেবের পিতামহ হইতেছেন। পিতা পিতামহের সেবা করিলে পুত্রেরা প্রসন্ন হয়েন, সেইরূপ গুরুসেবায় মন্ত্র আর মন্ত্র সেবায় দেবতা আরও গুরু মন্ত্র উভয়ের সেবায় দেবতা প্রসন্ন হয়েন, ইহার বিপর্য্যয় হইলেই বিপরীত ফল ঘটে। যোগিনীতন্ত্রে বলিয়াছেন শিষ্যকে মন্ত্র প্রদানকালে মানবদেহে সেই মহাকালের অধিষ্ঠান হয়। আমরা "উপাসনা খণ্ডে" গুরু ও শিষ্যের লক্ষণাদি, পূজা, বাহ্যপূজা, অন্তর্যাগ আদি বর্ণনা করিব মনে করিয়াছি, জানি না জগদম্বা ও গুরুদেব সে দিন দিবেন কি না। এক্ষণে কথাটার গুরুত্ব অনুসারে কেবল মাত্র অবতারণ করিয়া গুরু প্রণাম করিয়া বিদায় হইব ও অপর বিষয়ের আলোচনা করিব। গুরুর প্রণাম—

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকার অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর যৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্মপদ যৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই গুরুদেবকে প্রণাম। জ্ঞানময়ী অঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধজীবের চক্ষু যৎ কর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে, সেই গুরুদেবকে প্রণাম।

শাক্তসম্প্রদায় প্রধানত কয়টি আচারে বিভক্ত। কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে এই সমস্ত আচারের উল্লেখ আছে।

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎসিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥

তন্ত্রলিখিত বেদাচার সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, তদপেক্ষা শৈবাচার, তদপেক্ষা দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার, তদপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার ও তদপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। তারপর আর নাই।

বৈষ্ণবাচার। নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল দেখুন। বেদাচারের ব্যবস্থানুসারে নিয়মিত কর্ম্ম করিবে। মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জল্পনাও করিবে না। এইগুলি ত্যাগ করিবে—হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, রাত্রিতে মালা ও যন্ত্র স্পর্শ, ও মাংসভোজন।

শৈবাচার। বেদাচার ক্রমেণৈবশৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্। তদ্বিশেষ-মহাদেবি, কেবলং পশুঘাতনং। নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল।

বেদাচারের নিয়মানুসারে শৈবের ও শাক্তের আচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাক্তের বিশেষ এই যে তাহাতে পশু হননের বিধান আছে।

দক্ষিণাচার। নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল।

বেদাচারের নিয়মানুসারে ভগবতীর পূজা করিবে ও রাত্রিতে বিজয়া গ্রহণ করিয়া তদ্গত চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। বঙ্গদেশে দক্ষিণাচার বিস্তর।

বামাচার। আচার ভেদ তন্ত্র দ্রষ্টব্য—

পঞ্চতত্ত্বং থ-পুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেত্তন্ত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাম্॥

কুলস্ত্রীর পূজা করিবে, তাহাতে পঞ্চতত্ত্ব ও পঞ্চ-পুষ্প ব্যবহৃত হইবে। ইহাই বামাচার হইবে। বামাস্বরূপা হইয়া পরমা শক্তির পূজা করিবে। বঙ্গদেশে বামাচার বিস্তর। বাঙ্গলাতন্ত্র প্রধান স্থান।

সিদ্ধান্তাচার। নিত্যাতন্ত্র প্রথম পটল—

শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ শুদ্ধং শোধনা দেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্॥

শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল দ্রব্যই শোধন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। মহেশানি, সিদ্ধান্ত আচারের এই লক্ষণ। আবার সময়াচার তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে লিখিত হইয়াছে— দেবপূজারতো নিত্যং তথা বিষ্ণু পরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্॥
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ

যিনি অহরহ পূজানিরত, দিবাভাগে বিষ্ণুপূজানিরত ও রাত্রিকালে বিধি ও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সিদ্ধান্ত আচারে ফলভোগী হন।

কৌলাচার। এই আচারের কোন নিয়ম বা আইনকানুন নাই। স্থানাস্থান, কালাকাল, কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই নাই। নিত্যাতন্ত্রের তৃতীয় পটল দেখুন। দিক্কাল নিয়মো নাস্তি তিথ্যাদি নিয়মে ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্বচিৎ ভূতপিশাচ বৎ।
নানা বেশ ধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কৌলের পক্ষে মহামন্ত্র সাধনে দিক কাল নিয়ম নাই, তিথিনক্ষত্রাদি ও নিয়ম নাই। কৌলসাধকগণ পৃথিবীতে নানা বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করেন, যথা কোথাও শিষ্ট, কখনও ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য। প্রিয়ে ইঁহাদের ভেদজ্ঞান নাই। চন্দন ও কর্দ্দমে, শত্রু ও পুত্রে সমান। যাহাদের এইরূপ ভেদজ্ঞান নাই অথবা যাহাদের পক্ষে সুবর্ণ ও তৃণ সমান যাহাদের পক্ষে শ্মশান ও ভবন সমান তাহারাই কৌল।

এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন আচার প্রণালী হইতেই স্থূলত অনেকে তান্ত্রিকদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, বীরাচারী ও পশ্বাচারী। যাহারা

মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহারা বীরাচারী। তদ্বিপরীত আচারীরা পশ্বাচারী। বলিদান দেওয়া উভয় আচারের মধ্যেই আছে। কিন্তু এমন অনেক সাধক আছেন, যাঁহারা বলিদানের অর্থ জাত পশু হনন বুঝেন না। তাঁহারা বলিদান অর্থে সূক্ষ্ম ক্রিয়া বুঝেন। যাঁহারা বলিদান দেন, তাঁহারা বলেন, বলিদানের উদ্দেশ্য পশুত্ব মোচন করিয়া পশুকে দেবত্ব বা দেবযোনিত্ব দান করা। কিন্তু সকলের উপর কুলাচার

অন্তঃ শাক্তাবহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥ শ্যামারহস্য।

নানারূপধারী কৌলগণ ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন, তাঁহারা অন্তরে শাক্ত বাহিরে শৈব এবং সভামধ্যে বৈষ্ণব।

শাক্তগণের পূজা দুই প্রকার, অন্তর্যাগ ও বাহ্যপূজা। আমরা উপাসনা কাণ্ডে এই বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিব মনে করিয়াছি, এখন শৃঙ্খলার অনুরোধে উল্লেখ মাত্র করিলাম। বাহ্য বস্তু দিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, আচমনীয় পাদ্য, নৈবেদ্য ইত্যাদি পঞ্চ উপচারে দশ উপচারে বা ষোড়শাদি উপচার প্রদানে দেবতার যে পূজা, তাহাই বাহ্যপূজা। কিন্তু অন্তর্যাগে বাহ্যবস্তু কিছুই নাই, অন্তরে অন্তরে পূজা করিতে হইবে। চীৎরূপ পুষ্প দিয়া, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর দিয়া। কেহ বা মনে মনে পুষ্পাদি কল্পনা করিয়া মানসে বাহ্যপূজা করেন। অন্তর্যাগের মধ্যে শাক্তদিগের ষট্‌চক্রভেদ সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে পাইবেন। শাক্তগণের মধ্যে যোগের ক্রিয়া যত অধিক তত অপর বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকই যোগাভ্যাস করিতে পারেন। তখন ষট্‌চক্রভেদ কেবল শাক্তেরই ক্রিয়া থাকিবে না।

শাক্তদিগের চক্রসাধন, চিতাসাধন, মুণ্ডিসাধন, ছায়াসাধন প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সাধন আছে, তাহা গুরুগম্য। যোগিনীতন্ত্রের (পূর্ব্বখণ্ড) বচনানুসারে শাক্তদিগের ষট্‌কর্ম্ম হইতেছে—শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ। কৌলদিগের কোন কার্য্য নাই; তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রত-ধারণ, বা তীর্থযাত্রা করিতে হয় না। শবসাধনা তান্ত্রিকদের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

ক্রমশঃ।

মা।

কালচক্রের সবেগ আবর্ত্তনে আবার বর্ষার পর শরৎ দেখা দিল। নিবিড় নীরদরাশি যেন কাহার আগমন সম্বাদে ভীত হইয়া মৃদুস্বরে বিরক্তি জ্ঞাপন করিতে করিতে ও বিদায়ের ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। সূর্য্যদেব শত্রুর শেষ রাখিতে নাই জানিয়া সতেজে কর্দ্দমজল শোষণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া ধরণী নির্ভয়ে শ্যামল বসন পরিধান করিলেন আর দিক দক্ষিণ নিশ্চিন্ত মনে শান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জল স্থল ব্যোম নবঋতু-ভূপতির মনস্তুষ্টির জন্য আপন আপন দেয় কর লইয়া উপস্থিত; লোকে না বুঝিয়া বলিতেছে, জলে কুমুদ কহ্লার কোকনদ ফুটিয়াছে; স্থলে বৃক্ষাদি নবরঙ্গে নব পল্লবে ও কুসুমে কুসুমিত হইয়াছে; আকাশে দিবাভাগে রঙ্গের খেলা ও রজনীতে আলোক-মালা। তাহারা জানে না সুবিস্তৃত নৈশগগণ অঙ্গনে আজ পথ-চ্ছায়া কেন এত উজ্জ্বলা? জানে না, যে ব্যোমকেশমহিষীর আগমনের দিন কেমন হইবে দেখিবার জন্য ব্যোমদেশ ছায়াপথ ঘনচ্ছায়া আলোকমালায় অপসারিত করিতেছেন। আর বিমানচারী বিহগ বিহগী সোহাগের অনুরাগে নব নব রাগে জগৎবাসীর নিকট জগজ্জননীর সেই শুভ আগমন সন্দেশ সোৎসাহে সকলের নিকট সমভাবে বিতরণ করিতেছেন।

স্বভাব ত স্ব-ভাবে বলিতেছেন, মা আসিতেছেন কিন্তু প্রাণ কেন তাহা বুঝে না? কেন দারুণ উষ্ণশ্বাস নাসারন্ধ্র ভেদ করিয়া সবেগে সহসা প্রকাশ হয়? কেন নয়নদ্বয় অযাচিত অশ্রুসলিলে ভাসিয়া যায়? কেন নিজের দুঃখ, পরিবারের দুঃখ, প্রতিবেশীর কষ্ট, গ্রামবাসীর কষ্ট, প্রদেশের তাপ, দেশের সন্তাপ স্বরূপ অগ্নি মনোনয়নের পুরোভাগে ধীকী ধীকী জ্বলিয়া উঠে? কেন রোগশোক, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি, পাপতাপ, অনাহার হাহাকার, রোষ অসন্তোষ, বাত্যা বিঘ্নবাধা বিড়ম্বনা—কেন সংপ্লব, আহব, রাষ্ট্রবিপ্লব—ইন্দ্রিয় দ্বারে ঘোরঘটায় তাণ্ডবনৃত্য প্রচার করে? সুখের দিনে তোমার আগমনের দিনে কেন কেন মা তোর কথা ভুলিয়া যাই, তোকে ভুলিয়া যাই, কেন দুঃখ দুঃখের কথা যথা তথা সময়ে অসময়ে মনে পড়ে? কেন প্রাণ আপনি সহসা

কাঁদিয়া উঠে?—হাঁ বুঝিয়াছি, কে যেন দূরে গাহিতেছে, যেন কর্ণপটহে বেহাগ আঘাত করিতেছে—

সুখের আভাস এলে, অসুখ আর উথলে
চাঁদের উদয় হলে সাগর যেমন।

মা গো বিড়ম্বনায় না পড়িলে কেহ তোমার পূজা করে না, আবার বিড়ম্বিত না হইলে তোমার পূজায় সিদ্ধি হয় না। দেখিতেছি নরদুঃখ নিবারণের জন্য ভগবানের অবতার আর দেব-দুঃখ অপনয়নের জন্য মা তোমার লীলাবতার। মধুকৈটভের উপদ্রবকালে ব্রহ্মা বিড়ম্বনায় পড়িয়াই, হরিকে জাগাইতে না পারিয়াই, মা যোগমায়ে, তোমার পূজা করিয়াছিলেন। দারুণ দৈত্যমায়া-বিড়ম্বনা বলে স্বপুত্র রমণীরূপে মজিয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে দেখিয়াই না ঋষি কাত্যায়ণ তোমার পূজা করিয়াছিলেন, আর মা ভক্তবৎসলা সেই অবধি তুমি কাত্যায়ণী নাম ধারণ করিয়াছ? স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ যখন অনন্যোপায় হইয়া তোমার পূজা করিয়াছিলেন, তখনই না মা তুমি সমরতরঙ্গে মহিষাসুর মর্দ্দন করিয়াছিলে? সুরথ সমাধির মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়া মুনিবর মার্কণ্ডেয় যখন তোমার সুচরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখনই না সুরথ সমাধি হৃদয়রক্ত দানে মা তোমার পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছিল ও ঈপ্সিত বর প্রাপ্ত হইয়াছিল। মা গো রত্নাকর পারে মহোদধিতটে লঙ্কানগরী দ্বারে ভগবান রামচন্দ্রের বিড়ম্বনারই বা কি কম হইয়াছিল? কোথা লঙ্কা আর কোথা দেবীদহের লীলোৎপল? বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। কমললোচন যখন কার্ম্মুক সাহায্যে মূঢ়মুষ্টিতে স্বকীয় নয়ন উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর তখনই ত মা তুমি রামচন্দ্রের হাত ধরিয়াছিলে? যখন হিমাচলে মেনকার গৃহে ষষ্ঠীর সায়ংকালে তুমি মহিষমর্দ্দিনী সাজিয়া আসিয়াছিলে, তখন তোমার পিতামাতা তোমায় কন্যারূপ না দেখিয়া—রণরঙ্গিণী ভীমা ভয়ঙ্করী প্রতিমা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিল, তখন তুমিই ত মা তনয়ারূপ ধরিয়া সেই বিড়ম্বনা মোচন করিয়াছিলে এবং কন্যাতত্ত্ব সাধক সাধিকার হৃদয়ে অপার আনন্দ দান করিয়াছিলে? তাই বলিতেছি মা বিড়ম্বনা বাহুল্যে আমাদের ভয় নাই, মনে বুঝিতেছি, তোমার পূজা করিতে পাইব এবং তোমার পূজা হইবে।

আয় মা তবে সুমুখে দাঁড়া, তোকে একবার মনের সুখে সাজাই। না মা ভুলিয়াছি, তাহা হইবে না। কি ছার ডাকের গহণা তা দিয়ে ত সাজাইতে পারিব না। মা গো কুবেরের ভাণ্ডার মন্থন করিয়াও ত মেনকা তোমাকে সাজাইতে পারেন নাই। ভক্ত কবি না বলিয়াছিলেন?

তখন, প্রেমানন্দে গিরিরাণী, রত্ন আভরণ আনি,
উমা-রত্নে যত্নে সাজাইল।
কদাচ না শোভা পায়, আভরণ উমার গায়,
চাঁদকে যেন রাহুতে গ্রাসিল॥
খেদে রাণী ম্রিয়মানা, দাসীগণে করে মানা,
বলে, আর এন না তুচ্ছ আভরণ।
যা দিয়ে সাজালাম দেহ, শীঘ্র মুক্ত করি দেহ,
মায়ের, শূন্য দেহ করি দরশন॥

(গীত।)

সাজিল না শঙ্করি মা! তোরে আভরণে সাজিল না,
কোন্ বিধি গড়িল মা তোয় হর অঙ্গনা॥
কিরূপ ধরেছ তারা, শরচ্চন্দ্রমুখি তারা,
মা আমি, চাঁদের নাম রেখেছি তারা, নয়নতারা ছিল না॥
রূপে হরের মন হরে, মনের অন্ধকার হরে, মা উমা!
তাইতে বুঝি ত্রিনয়ন তোরে, নয়ন ছাড়া করে না॥

সাজান ত হল না। তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রূপে দেখে এস মা; কিন্তু ছত্রভঙ্গ শুনে ভয় হয় মা। দেখো মা যেন হৃদয়কমলে ছত্রভঙ্গ না ঘটে, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব। মা, তোমার ধারণা করিতে ত পারিব না, তুমি যে বাক্য মনের অগোচর! মা গো একদিন না এই হইয়াছিল?—

ভূমৌ নিপত্য দেবেশঃ পপাত চরণান্তিকে।
অযুতং দ্বাদশং দেবি পুস্তকঞ্চাবলোকিতং
কলাং বক্তুং ন শক্নোমি যদ যোগং সুরেশ্বরি!
মাতর্মে কালিকে দেবি! প্রসীদ ভক্তবৎসলে,"

শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্যাপি হসিত্বোবাচ তারিণী,
তদ্রূপা পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ইমং যোগং মহাদেব! ভাবয়স্ব দিনে দিনে॥

অর্থাৎ—মহাদেব জগদম্বার চরণের নিকট ভূমিতে পতিত ও প্রণত হইয়া বলিলেন, "দেবি এক লক্ষ বিশ হাজার পুস্তক ত অবলোকন করিলাম, তথাপি কলাতত্ত্ব বলিতে সক্ষম নহি। সুরেশ্বরি, সেই কলা যোগ আমাকে বল। দেবি, ভক্ত বৎসলে, মাতঃ কালিকে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" তারিণী শিবের এই বাক্য শুনিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন, "জগতের যত পুরুষ সকলেই তোমার স্বরূপ আর জগতের যত স্ত্রী সকলেই আমার স্বরূপ। মহাদেব এই যোগ তুমি দিনে দিনে অভ্যাস কর।"

মা গো যখন দেবদেব মহাদেবের এই অবস্থা তখন আমরা কোথা আছি? মা তুমি বাক্য মনের অগোচর, তুমি বুদ্ধির অতীত, বিদ্যার অতীত, জ্ঞানাতীত। ঘোরান্ধকারে একজন প্রগাঢ় জ্ঞানী পণ্ডিত ও একজন ঘোর মূর্খের একই অবস্থা। মা অন্ধকার তোমার বিভূতি, সেই বিভূতিতে পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়েই মগ্ন—উভয়েরই একরূপ দুর্দ্দশা। তাই বলিতেছি, মা গো তুমি যেমন বুঝ তেমনি কর। আমাদের একটু আনন্দ দাও তাহা হইলেই কৃতকৃতার্থ হইব। মা তোমার পাদপদ্মে সগঙ্গাজল জবাবিল্বদল দিয়া আমরা একবার বিষ্ণুর সঙ্গে বলি—

ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে।

আর একবার দেব দেবযোনি ও মহর্ষি মণ্ডলের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বলি—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহ মূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকা মখিলদেব মহর্ষি পূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু।

* * *

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ
ন জ্ঞায়সে হরি হরাদিভিরপ্যপারা
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতি ত্বমাদ্যা।

আসুন একবার ব্রহ্মার সহিত বলি—

নাতঃ পরং কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং
প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন।
তঞ্চাত্র সর্ব্বজগতাং জননীতি সত্যং
নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিনাত্র দৃষ্টং॥

আর আসুন সর্ব্বশেষে ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণ বেদপারগ ঋষিগণের সহিত করযোড়ে বলি—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ
পূজনীয়া পরাশক্তিঃ সগুণা নির্গুণাথবা॥

মা গো যদি বাঁচিয়া থাকি আর বৎসর পাঁচ দিন পূজা করিব।

ওঁ শান্তি ওঁ দুর্গা ওঁ মা।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

আমাদের মাসিক সাহিত্য সমালোচন সম্পূর্ণ নহে—সম্পূর্ণ হইতেও পারে না। যে সমস্ত মাসিক পত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, তাহার সকল গুলি আমাদের সম্মুখে নাই—সকলগুলি আমরা প্রাপ্ত হই না। যাহা পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন। ১৩০৮ সনের বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই তিন মাসের মাসিক সাহিত্য সমালোচন করিব মনস্থ করিয়াছি কিন্তু সকলে এই তিন মাসের কাগজ দিয়া উঠিতে পারেন নাই। এমনও হইতে পারে যে কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের হাতে কোনক্রমে আসিয়া পঁহুছায় নাই।* তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই সমালোচন আংশিক—পূর্ণ নহে। আমাদের মাসিক সাহিত্য সমালোচন সাহিত্যের হাটে স্থান, আদর ও দর পাইয়াছে। ভরসা করি গুরু কৃপায় ত্রৈমাসিক সমালোচনও সফল হইবে। কতকগুলা কাগজ জমিয়া গিয়াছে; বৈশাখের কাগজের ভাদ্রে সমালোচন করিয়া কোন লাভ নাই; অপর কাগজে ও সংবাদপত্রে যখন সমালোচন বাহির হইয়া গিয়াছে, তখন সে পুরাণ কাসুন্দী তুলিয়া ফল কি? যখন পাঁচ জনে মাসিক ধরিয়াছেন, আমরা না হয় ত্রৈমাসিক সমালোচন ধরি। এই সমস্ত কারণে আমরা মাসিক সমালোচন প্রত্যাখ্যান করিতেছি না অথবা খেয়ালের খেলা মিটাইবার জন্য ত্রৈমাসিক সমালোনের অবতারণা করিতেছি না। পাঠক মহাশয়ের যদি পূর্ণিমার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় থাকে তাহা হইলেও জানিবেন যে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সাহিত্য হইতে মাসিক ত্রৈমাসিক বার্ষিক সমালোচন পূর্ণিমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে।

১৩০৪ সালের এমনই সময়ে (শ্রাবণে) আমরা সমালোচনার সময় এই গুলির নাম করিয়াছিলাম। ভারতী, সাহিত্য সেবক, বীণাপাণি, বামাবোধিনী, সখা ও সাথী, নদীয়াবাসী, নব্যভারত, প্রভা, সঙ্গিনী সজ্জনতোষিণী।

আজ আমরা এইগুলির নাম করিতে সক্ষম। বীণাপাণি ১৩০৭ মাঘ, পুণ্য ১৩০৭ ফাল্গুন ও চৈত্র (একত্রে), আরতি চৈত্র ও ১৩০৮ বৈশাখ ও

*বৈশাখের ভারতী পাই নাই।

জ্যৈষ্ঠ এই তিন সংখ্যা একত্রে। লহরী ১৩০৭ চৈত্র। নবপ্রভা চৈত্র ও ১৩০৮ বৈশাখ হইতে আষাঢ়। বিশ্বজননী বৈশাখ—৮। হিন্দু-পত্রিকা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বামাবোধিনী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। প্রয়াস বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। প্রদীপ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। মুকুল বৈশাখ হইতে আষাঢ়। উদ্বোধন বৈশাখ হইতে আষাঢ়। চিকিৎসক ও সমালোচক জ্যৈষ্ঠ। আর্য্যধর্ম্ম বৈশাখ। সাহিত্য বৈশাখ হইতে আষাঢ়। প্রকৃতি বৈশাখ। সাহিত্য সংহিতা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। পন্থা বৈশাখ। স্বাস্থ্য বৈশাখ হইতে আষাঢ়। ইস্‌লাম প্রচারক ১ম ও ২য় সংখ্যা আষাঢ় পর্য্যন্ত। ভারতী জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। বীরভূমি আষাঢ় পর্য্যন্ত।

আষাঢ়ের পরও যে সকল কাগজ আসিয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন।

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায়, আমরা পাইয়াছি, বালক বালিকাদের জন্য 'মুকুল'। স্ত্রীপাঠ্য একখানি 'বামাবোধিণী'। মুসলমান সম্পাদিত দুইখানি পত্র 'ইসলাম প্রচারক' ও 'লহরী'। লহরীখানি পাঠক জানেন যে আগাগোড়া পদ্যে। স্ত্রী সম্পাদিকার পত্রিকা হইতেছে, 'ভারতী' ও 'পুণ্য' (এবং 'অন্তঃপুর' কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত)। কেবল মাত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দেখিতেছি 'হিন্দু-পত্রিকা' ও 'আর্য্যধর্ম্ম' ও 'পন্থা'। 'উদ্বোধনের' নাম করিব কি? চিকিৎসা বিষয়িণী দুই খানি পত্রিকা 'স্বাস্থ্য' ও 'চিকিৎসক',। বাকি গুলিকে মোটের উপর সাহিত্য শ্রেণীতে নিয়োজিত বলিলেই যথেষ্ট বর্ণনা করা হইবে।

১৩০৪ সালের বর্ষশেষে আমরা বলিয়াছিলাম "মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের উপর আমাদের কিঞ্চিৎ দাবী আছে। কোন এক মাসে যে প্রবন্ধগুলি একত্রে বাহির হইবে, সেগুলির মধ্য দিয়া আমরা একখানি সুর বসুন, সূত্র বলুন, প্রণালী বলুন, পদ্ধতি বলুন, কোন একটা বন্ধনী পাকা—আমরা দেখিতে চাই।"

* * *

জঙ্গলার প্রাধান্যের কথা ভুলিব কেন? কিন্তু জঙ্গলা রাগিণীর জন্ম নাই এ কথা মানি না। বাঙ্গালি কখনই ধ্রুপদী বা খেয়ালী নহে। বাঙ্গালি

বহুদিন হইতে জঙ্গলা। তা বলিয়া কি বাঙ্গালির জান্ নাই—প্রাণ নাই? তা ও কি কখন হয়? * * এখন সামঞ্জস্যের নাম করিয়া, বৈচিত্রের দোহাই দিয়া নানাবিধ 'অসামঞ্জস্য' সামগ্রী একত্র সমাবেশের চেষ্টা হইতেছে বলিয়াই আমাদিগকে এত কথা বলিতে হইতেছে। পূর্ব্বে ছোট বড় সকলেই আপনার বিশেষত্ব আপনি রাখিতে পারিত; অনেকেরই একটু আধটু নিজস্ব ছিল। যাত্রার দল চিরকালই জঙ্গলা, কিন্তু তবু মদনমাষ্টারের ভৈরবী জান্, গোপাল উড়ের কালাংড়া জান্, এইরূপ অনেকেরই কিছু না কিছু ছিল। দেখুন, মতিলাল রায় রসিকমোহন প্রভৃতির প্রবল দল। অনেক বালক সুকণ্ঠ, সুর তালে পটু, ভাল ওস্তাদের কাছে শিক্ষিত। গায়ও ভাল কিন্তু গলায় সুরের গাঁথনী নাই। একখানি খেয়ালভাঙ্গা সুর, তার পরের গানেই মলহার গানের সুর। আমাদের নবীন মাসিক পত্রের কয়েকখানির সেই দশা হইতেছে দেখিয়াই দুঃখ করিতেছি। একবার যদি বিজ্ঞ সম্পাদকগণ সুর বাঁধিয়া দল গুছাইয়া লন, তাহা হইলে, আমাদের এই গুরুতর বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইতে হইবে না।"

সেই একদিন আর আজ এই একদিন। ১৩০৪ আর ১৩০৮ কিন্তু কিছু উন্নতি হইয়াছে কি? উন্নতি হইলে কি আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইত? এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে "বঙ্গ রঞ্জন" পত্রিকার কভারটা যদি "সজ্জন রঞ্জন" পত্রিকায় লাগান যায় আর সেইরূপে বাঁধা হইয়া যদি পাঠকের নিকট পঁহুছায় তাহা হইলেও পাঠক মহাশয় ধরিতে পারিবেন না। আমরা যোগ দেখাইয়া দিলাম, ঔষধ সম্পাদকগণের হস্তে।

এখন দেখা যাউক সাহিত্য জাহাজে কি কি মাল বোঝাই আছে।

(১) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ফরাশি বিপ্লব (নবপ্রভা)। হুমায়ুন ও সেরশাহ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ, সেকালের অন্নকষ্ট (সাহিত্য)। সেরজেলেম (ইস্‌লাম প্রচারক)। ভারতের বৌদ্ধমহিলা (সাহিত্য সংহিতা)।

(২) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আবহবিদ্যা (সাহিত্য)। পাতা ও ফুল, সৃষ্টির বিশালত্ব (প্রদীপ)। ভূগর্ভে অস্থিব্যক্তির সাক্ষ্য (পুণ্য)। জ্যোতিষিক গণনা, বিলাতে অধ্যাপক বসু (ভারতী)। বীজগণিত, আর্য্যজাতির মূত্র-বিজ্ঞান (সাহিত্য সংহিতা)। গাছপালার কথা, জীবজন্তু (মুকুল)। জ্যোতিষ-প্রকাশিকা (ভারতী)।

(৩) জীবন-চরিত। "বীরভূমি" ৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন শক্তিসাধক ছিলেন। অনেকগুলি পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বীরভূমি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

চিকিৎসক। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার পিতার নাম গোলকচন্দ্র। ১৮১৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। গোলকচন্দ্র চাণকের নিকট মণিরামপুরে বাস করিতেন। তিনি কলিকাতায় নিউগী পুকুর ওয়েষ্ট লেনে একটি বাড়ী করিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ গ্রাম্য পাঠশালা ত্যাগ করিয়া হিন্দু-কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। হেয়ার সাহেবের সাহায্যে তিনি মেডিকাল কালেজে অধ্যয়ন করেন। হিন্দুকালেজে চল্লিশ টাকা বেতনে দিন কত শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আশি টাকা বেতনে প্রধান কেরাণী নিযুক্ত হন। তখন বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা বেতনে উক্ত কালেজে পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে মার্শাল সাহেব দুর্গাচরণকে চাকরী দেন। বিদ্যাসাগর দুর্গাচরণের নিকট ইংরেজী অধ্যয়ন করিতেন। দুর্গাচরণ চাকরী করিতেন ও মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, মার্শেল সাহেবের কৃপায় তিনি এইরূপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষা দিবার সময়ই পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষা দিতে চাহেন। কালেজের অধ্যক্ষগণ অমত করায় তিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ১৮৪২ সালে ১লা জুন ডেবিড হেয়ার বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ভালরূপ চিকিৎসা না হওয়ায় দুর্গাচরণ নিজে ভাল করিয়া ডাক্তারী শিখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। প্রথমে তিনি পাণ্ডুয়ার নিকট গোমী গ্রামে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বর্দ্ধমান জেলায় সাতগেছের নিকট বড়োয়া গ্রামে শম্ভু মুখোর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। দেবেন্দ্র, অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র, জিতেন্দ্র। দুর্গাচরণ ১৮৭০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী, ৫১ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। দুর্গাচরণের অলৌকিক চিকিৎসার বিষয় কি আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে? তিনি অধ্যয়নশীল ছিলেন। নূতন পুস্তক উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতেন। গোপনে যথেষ্ট দান করিতেন। গরিবের

নিকট ভিজিট লইতেন না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার নিকট চিকিৎসা শিখিতেন।

হিন্দু-পত্রিকা, শুনঃশেপ (ঋগ্বেদের আখ্যান)। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার কি না তাহার বিচার।

সাহিত্য, হুমায়ুন ও শেরসাহ।

বিশ্বজননী, বিদ্যাসাগর। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যো। মাতার নাম ভগবতী দেবী। ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার হুগলি জেলার জাহানাবাদ মহকুমায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট বীরসিংহ (বীরসিঞা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরদাসের সাত পুত্র, তিন কন্যা; ঈশ্বর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

ইস্‌লাম প্রচারক, নুরজাহান বেগম, কুতবুদ্দীন। আল-মাসুন।

উদ্বোধন, রামানুজ চরিত।

বীণাপাণি, মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী। বুদ্ধদেব।

বামাবোধিণী, রাণী আলেকজান্দ্রা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিত। মাতৃদেবী ৺বামাসুন্দরী বসুর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ভারতী, কবিচন্দ্র।

নব-প্রভা, কার্লাইল।

মুকুল, মহীশুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রঙ্গাচার্লু। জন্ম ১৮৩১ সালে, মান্দ্রাজের চিঙ্গলপট জেলায়। কালেজ হইতে বাহির হইয়া কেরাণী হন। পরে তহবিলদার হন। টেলার সাহেবের অধীনে ভারতবর্ষের রেলওয়ের পরিদর্শক ছিলেন। সর্ব্বশেষে মহীশুর রাজার দেওয়ান হন। মহীশুরের আয় দেড় কোটী। ইংরেজরাজের নিকট আশি লক্ষ টাকা যে দেনা ছিল, তাহা তিনি শোধ করেন। রাজ্যে প্রজা প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহা একরূপ পার্লমেণ্ট। প্রতি বৎসর শরৎকালে অধিবেশন হয় ও নানা কথার আলোচনা হয়। ১৮৮২ সালে মৃত্যু। থিওডর পার্কার।

প্রয়াস। কৃষ্ণকুমারী। রাণা ভীমসিংহের কন্যা ও মিবারলক্ষ্মী। জয়পুরের জগৎ সিংহ, মারবারের মানসিংহ উভয়েই এই অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী বালিকার পাণিগ্রহণে উৎসুক হয়েন। উভয়ের মধ্যেও ভীম

TORN PAGES.

সিংহের সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। আবার পাঠান আমীর খাঁ ও সর্দ্দার অজিৎ সিংহ ইহারাও কৃষ্ণকুমারীর জন্য প্রাণপণ করেন। আমীর খাঁর পরামর্শে বৃদ্ধ রাণা ভীম সিংহ শেষে দুহিতাকে আত্মবিসর্জ্জন করিতে অনুমতি দেন। ষোড়শী যুবতী কৃষ্ণা কথা শুনিয়া একবারও বিচলিত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে পিতার শান্তি হইবে এই আনন্দে তিনি অধীর হয়েন। যৌয়ানদাস (এক বেশ্যাপুত্র) ঘাতুকের কার্য্য করিতে গিয়া শেষে পশ্চাৎপদ হইল—হাত হইতে ছুরিকা পড়িয়া গেল। শেষ আর কি আছে—বিষ। বালিকা বার বার তিনবার বিষ পান করিলেন, তাহাতেও মৃত্যু হইল না। শেষে আমীর খাঁ ও অজিৎ কুসুমরস সাহায্যে এক অতি তীব্র কালকূট প্রস্তুত করিয়াদিল। এইবার বিষতাপে বিকচনলিনী শুখাইল।

প্রদীপ। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। এমার্সন। আবুল ফজল।

ধর্ম্ম-প্রবন্ধ। হিন্দু পত্রিকা, আর্য্যধর্ম্ম, পন্থা ও উদ্বোধন ইহাদের অধিকাংশ প্রবন্ধই ধর্ম্মবিষয়ক। রামকৃষ্ণ কথামৃত অনেকগুলি কাগজে প্রকাশিত হইতেছে; যথা—সাহিত্য, হিন্দুপত্রিকা, উদ্বোধন, আরতি, বামাবোধিনী ইত্যাদি। হিন্দু পত্রিকায় যে তিন খানি দর্শনের বিবরণ এক সঙ্গে বেরুচ্চে হইতেছে, তাহা বেদান্ত, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন। ভগোল পরিচয়, পঞ্চদশী, আমিত্বের প্রচার এই সবও আছেন। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। পন্থা পঞ্চম বৎসরে পড়িল, তদুপলক্ষে সম্পাদক কৃষ্ণধন বাবু পতঞ্জলি দর্শনের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। "পাশ্চাত্যবিজ্ঞান জড়বাদ বিরোধী" প্রবন্ধ বলিতেছে। "বুঝিয়াছ কি বিজ্ঞান কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে? অচিরে জড় উপাসক বিজ্ঞান প্রচার করিবে যে মনই সৃষ্টির পিতা, মন হইতেই জগতের উৎপত্তি, যে জড় জগতের প্রত্যেক কার্য্যকলাপের পশ্চাতে সেই মহাচৈতন্য নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, যে মনোভাব সকল (Thoughts Forces) নানারূপ আকারে বাহ্যজগতে বিচরণ করেন এবং সেই অনন্ত পুরুষের মনোভাবের অভিব্যক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি। এবং মনুষ্যের মনও সেই বিশ্বপতির মন স্বরূপত এক জিনিষ।" আর্য্যধর্ম্মে দেখিলাম "পঞ্চীকরণ মহাবাক্যার্থ বিবরণ" ও "কর্ম্মভেদ"। উদ্বোধনের "ব্রহ্ম ও জগৎ" "ধর্ম্ম জগতে গুরু" উল্লেখযোগ্য। একটা কথা। রামকৃষ্ণ "মিশন" কথাটা ভাল

করিতে হইবে। অপরাপর পত্রের ধর্ম্মপ্রবন্ধের আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

"জাপান দেশের বৃত্তান্ত অনুসারে জানা যায় বঙ্গদেশ হইতে ধর্ম্মপ্রচারকগণ যাইয়া জাপানে বাস করেন ও তথায় দেবনাগর অক্ষর প্রবর্ত্তিত করেন। খৃষ্টীয় ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে ভারত হইতে অসংখ্য লোক তিব্বত, নেপাল, চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম ও সিংহল দেশে গমন করেন। নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, অশ্বঘোষ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, স্থিরমতী, আর্যশূর, গুণমতী, অগ্রোত্র, শঙ্করস্বামী, ভববিবেক, বন্ধুপ্রভ, ধর্ম্মপাল, জিনপুত্র, ধর্ম্ম-যশঃ, পদ্মশীল, মুনি, বুদ্ধশ্রীজ্ঞান, ধর্ম্মত্রাত, বসুমিত্র, বসুভদ্র, সংঘসেন, নাগসেন, উপশান্ত, হরিবর্ম্ম, সংঘরক্ষ, বুদ্ধমিত্র, বুদ্ধত্রাত, বসুবর্ম্ম, গুণমতি, সংঘভদ্র, নন্দিমিত্র, বুদ্ধঘোষ, জিনমিত্র, মাতৃচেতঃ, সমন্তভদ্র, মুনিমিত্র, ধর্ম্মকাল, ধর্ম্মভদ্র, কালরুচি, গুণভদ্র প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত দেশ বিদেশে গমন করিয়া সমগ্র জগতে ভারতের জ্ঞানগরিমা ও মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এমন কি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে কুমারজীব নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বর্ত্তমান লাহোরের সন্নিকটস্থ কোন স্থান হইতে গমন করিয়া মধ্য এসিয়ার গোবি মরুভূমিতে বৌদ্ধদর্শন প্রচার করেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রচারকের স্বার্থত্যাগের বিষয় পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া অপরকেও জ্ঞানবান করিতে চেষ্টা করেন, যাঁহারা শত শত অসভ্য লোককে সভ্যতার সোপানে আনয়ন করেন, যাঁহারা নিজের সুখসচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া পশুবৎ লোকসমূহের পশুত্ব মোচন করেন, সেই উদারহৃদয় মনিষিগণের প্রতি কাহার শ্রদ্ধা না জন্মে?

* * *

ভারতীয় ধর্ম্মযাজকগণের অনুকরণ করিয়া বিদেশীয় লোক সকলও ধর্ম্মনীতি শিক্ষার নিমিত্ত ভারতে আগমন করিতেন এবং এদেশ হইতে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া উহা স্বদেশে প্রচার করিতেন। নেপাল, তিব্বত, পারস্য, কাম্বুজ, তুরস্ক, সাইবিরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, শ্যাম, লঙ্কা, যবদ্বীপ, প্রভৃতি স্থান হইতে অসংখ্য লোক ভারতে আগমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। তিব্বতের উত্তরপ্রান্ত কম্বুদেশ নামে খ্যাত ছিল। তথা হইতে

১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন শ্রমণ ভারতে আগমন করিয়া কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। বর্ত্তমান খোটান ও খাস্‌গর বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে কুস্তন দেশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তথা হইতে ২৯১ খ্রীষ্টাব্দে একজন শ্রমণ ভারতে আসিয়া পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপরিমিতা অধ্যয়ন করেন। তুখার বা তুরস্ক দেশ হইতে ৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন শ্রমন ভারতে আগমন করিয়া বিমলশুদ্ধ প্রভাস মহাধারণী নামক একখানি তন্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুবাদ করেন। ৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে একব্যক্তি তুখার দেশ হইতে আসিয়া একোত্তরাগম-সূত্র অনুবাদিত করেন। চীন, জাপান প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে যে সকল শ্রমণ ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(ভারতী)

অপর প্রবন্ধ। অপর প্রবন্ধ বা বিবিধের মধ্যে বাকি সকলই রহিল। উপন্যাস ও কবিতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালায় উপন্যাস ও কবিতা উভয়ই কমাইতে হইবে। ভাষায় আলস্যের দিন আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব। বহুকাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, সৌখীন কবিতার মলয় পবন, জ্যোছনা, ভ্রমরগুঞ্জন প্রভৃতি উপভোগের সামগ্রী কিছু দিন দূরে রাখিলে ভাল হয়। বালকেরা বাল্যে ব্যায়াম করিয়া হাড় ও পেশী শক্ত করে। ভাষারও বাল্য আছে। ভরসা করি লেখক ও সম্পাদকগণ সকলেই আপনাদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া কার্য্য করিবেন ও যত্ন ও শ্রমের ত্রুটি করিবেন না।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হাব্‌লী সহরের সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন শবসাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত "বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থে সুন্দরের শবসাধনা বর্ণন করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য তাহা উপহার দিলাম।

(শবসাধনা।)

তথাপি ও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥
ভৌমবারযুক্ত কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষীরূপসী॥
বিস্তারিত বিবরণ বলিলে সমস্ত।
গ্রন্থ মাঝে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়ে খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
তঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালীকৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি।
সামান্যার্থে সুবিধান করে মহামতি॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত সাবতীয় যন্ত্র॥

গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বদিক ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধি ন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন॥*
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টিবিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥
কিন্তু যে সে ঘায়ে মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গো-বিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যে জন পণ্ডিত॥

---

*যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালাদ্যৈরভিভূতকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্॥
তন্ত্রসার (ভাবচূড়ামণিবচন)।

যে চণ্ডাল যষ্টি শূল খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিম্বা সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখযুদ্ধে পলায়নপরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যু-কবলে পড়িয়াছে, সে যদি সুন্দর ও শূর যুবক হয় তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহারই শব লইবে।

মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজা স্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সকৌতুকে জলবিন্দু দিল॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শব কটিদেশ।
পূজা স্থানে নিল মহা সুবুদ্ধি নরেশ॥
অতঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্ত কম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ষু পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥

ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামীসম্বোধনে।
বিঘ্ন নিবারণ করে সদা সাবধানে॥
চতুঃষষ্ঠি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত॥
মূলমন্ত্রে শবাসন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণ তলে দিল কুশাসন।
শবকেশ ধরে করে যুটিকা বন্ধন॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গ ন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে।
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লাসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবযুটিকায়।
আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব দুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বাঁধে কবি যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকর যুগ্ম পার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ্ম নৃপতি নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায়॥
শিব শিবা গুরুভাবে হৃদি মধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খ মালা জপ করে মহাকবি॥
করে অসি রূপসী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি বলে মাভৈঃ মাভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥

দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননী॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিন নয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপুতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজি রাজি রাজ্য।
জয়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকালু বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র ত্বরা একবর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণ করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্য ধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যাকথা বিনা লোকে নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যবান সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপ ভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল।

এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ।
পুরমধ্যে তিনদিন রহে সঙ্গোপন॥
সেই তিন দিবসেতে আছে যত জ্বালা।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা॥
নিত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর।
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

ইতিহাসাদি পাঠে জানা যায়, ভারতে বহুদিন যাবৎ শক্তিসাধন চলিয়া আসিতেছে। তবে কাশ্মীর, কেরল ও গৌড় দেশ শুদ্ধ শক্তিসেবক বলিয়া পুরাতন গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তন্ত্রসাধনা চিরকালই প্রবল। বঙ্গদেশে যতলোক সিদ্ধ হইয়াছেন, এমন আর কোথাও নহে। বীরভদ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, পূর্ণানন্দ, গঙ্গেশ, দেবীবর ঘটক, রামাদাদা, সর্ব্বানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি। বহুসংখ্যক সাধকের তৃপ্তির জন্য কবিকঙ্কন চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল রচিত হয়। কাশ্মীর রাজ হর্ষদেব ১০৫৯ খৃঃ রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতামহীকে শুনাইবার জন্য সোমদেব "বৃহৎ কথা" রচনা করেন। তাহাতে বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনীর পুন পুন উল্লেখ আছে। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজসা বাদসাহ যখন নাগরকোট আক্রমন করেন, তখন জ্বালামুখীর অত্যন্ত প্রভাব। একটু সাম্প্রদায়িক বিবরণও এই স্থানে দিব।

চলিয়া পন্থী।—রাজপুতানায় জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বামাচারী শাক্তদের ন্যায় আচার। গুরুর নাম »চক্রেশ্বর।

গুরুর একজন করিয়া কোতোয়াল ও একজন সহকারী কোতোয়াল ও কতকগুলি শিষ্য থাকেন। কৌলদিগের ন্যায় ইহারা চক্র করিয়া থাকেন। ইহারা শাক্তদের উদারনৈতিকদল। ইহাদের চক্রে স্ত্রীলোকেরা সকলেই কাঁচলি খুলিয়া বসে। একটি কলসীর মধ্যে কাচলিগুলি রাখা হয়, পরে কোতোয়াল একটি করিয়া কাঁচলি তুলেন ও শিষ্যদের চিনিতে বলেন। যে শিষ্য চিনিবে, তাহার সহিত যাহার কাঁচলি সেই স্ত্রী সে রাত্রি একত্রে সাধনা করিবেন। কেহ কেহ বলেন, কাঁচলি হইতে চলিয়া পন্থী পদ হইয়াছে।

করারী। অক্ষয় বাবু বিবেচনা করেন যে ইহারা "কাপালিক" ও "অঘোর ঘণ্টা"র প্রতিরূপ। অক্ষয় বাবু অঘোরী ও অঘোর ঘণ্টা এক বিবেচনা করিয়াছেন এবং উদাহরণস্বরূপ মালতীমাধব নাটকে যে অঘোরঘণ্টা মালতীকে বলিদান দিতে উদ্যত হন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; বলিয়াছেন "ঐ অঘোর ঘণ্টা পূর্ব্বকালীন অঘোরীই বোধ হন।" কাপালিকের রূপ তিনি "শঙ্কর বিজয়" ও "প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক" হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কাপালিকের রূপ এইরূপ—"চিতাভস্মে আচ্ছাদিত কলেবর, গলদেশ নরকপাল মালায় আবৃত, কপালে কজ্জলরেখা, সমুদয় কেশ জটাভূত, ব্যাঘ্রচর্ম্মের কৌপীন ও কটিসূত্র, বাম হস্তে করোটি সুশোভিত, দক্ষিণ হস্তে শব্দায়মান ঘণ্টা এবং মুহুর্মুহু "শম্ভু ভৈরব অহো কালীশ নাম জপকারী।" ইহারা বলেন "আমরা মস্তিষ্ক ও বসা ধাতুতে অভিষিক্ত মহামাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করি, ব্রাহ্মণের কপালস্থিত মদ্যপান দ্বারা পারণা করি এবং সদ্যশ্ছিন্ন মনুষ্যের কণ্ঠোর কণ্ঠদেশ হইতে নিঃসৃত রুধির ধারা প্রভাবে উগ্রভূত নরবলি দ্বারা মহাভৈরবের অর্চ্চনা করি।" কাপালিকের রূপ যাহাই হোক করারী কাপালিক বা অঘোরঘণ্টা বা অঘোরী নহেন। যাঁহারা শরীরে কোনরূপ দুঃসহ কষ্ট স্বীকার (করার) করিয়া সাধনা করেন, তাঁহারাই করারী, যেমন লৌহশলাকা দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা, লৌহশিকল দ্বারা পুরুষাঙ্গ বন্ধন ও দমন করা, লৌহশলাকা-শয্যায় শয়ন করা। শাক্ত বৈষ্ণব উভয়েই করারী হইতে পারেন।

ভৈরব ও ভৈরবী। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত পুরুষের সাধারণ নাম ভৈরব ও ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রীর সাধারণ নাম ভৈরবী। কিন্তু যে সকল স্ত্রী সংসার ত্যাগ করিয়া কুলাচার অবলম্বনে ভৈরব সাহায্যে বা একাকী দেশ ও তীর্থাদি

ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকে ভৈরবী বলে। পরোপকার ব্যতীত ইহাদের অন্য ব্রত নাই, ইঁহারা সচরাচর গেরুয়া ধারণ করেন। গেরুয়ার সঙ্গে মস্তকে আলুলায়িত বা জটাভূত রুক্ষ কেশ, হস্তে ত্রিশূল, অঙ্গে বিভূতি, কপালে জবাকুসুমসঙ্কাশ সিন্দুর মণ্ডল, গলদেশে রুদ্রাক্ষ ও মহাশঙ্খমালা, হস্তে লৌহবলয় দেখিলেই বুঝিবেন যে মা আমার ভৈরবী। ইনি যথা তথা গমন করিতে পারেন, কোন গুপ্ত চক্র প্রবেশে বাধা নাই। গৃহস্থেরা যদি কোন ক্রমে একটু ভৈরবীলৌহবলয়ের অংশ সংগ্রহ করিয়া বাটীতে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সংসারের সর্ব্ববিষয়িণী অশান্তি কাটিয়া যায় এমন কি ভূতের উৎপাত নিবারণ হয়। ভৈরবেরা কখন ত্রিশূলের পরিবর্ত্তে চিম্টা ধারণও করেন ও সঙ্গে একখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম রাখিয়া দেন। ইংরেজীশিক্ষার সঙ্গে কলিমাহাত্ম্যে এসব কমিয়া গিয়াছে।

শীতলা পণ্ডিত।—বলিয়া এক সম্প্রদায় শাক্ত-সাধক আছেন। শীতলা দেবী যে দক্ষিণা কালীরই রূপান্তর। শীতলার স্তবেই সেই কথা প্রকাশ। "পূর্ব্বদিকে শীতলা, অগ্নিকোণে রোগনাশিনী, দক্ষিণে মুণ্ডমালাধারিণী দক্ষিণা-কালী, নৈঋতে শূর্পালঙ্কৃতা মস্তকা, পশ্চিমে সম্মার্জ্জনীধরা, বায়ুকোণে কলসধারিণী, উত্তরে সনাতনী দিগম্বরী ও ঈশানে ঘোরদর্শনী আমার রক্ষা করুন।" শীতলার ধ্যান দেখিলেই কথাটা বুঝিবেন—

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীং
মার্জ্জনী কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতা মস্তকাম্।

আমি শীতলা দেবীকে নমস্কার করি, তিনি দিগম্বরী, গর্দ্দভবাহনে আরূঢ়া, সম্মার্জ্জনী, কলস এবং মস্তকে শূর্প ধারণ করিয়া থাকেন।

ইতর জাতীয় লোক ও ভদ্রলোক উভয়েই শীতলার সেবা করেন। ভদ্রলোকেরা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ পূজা করেন আর ইতর জাতীয়েরা প্রায়ই মস্তকে শীতলা বহন করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহারা পণ্ডিতের চিহ্নস্বরূপ এক একটা তাম্রবলয় বা অঙ্গুরী ধারণ করে। পণ্ডিতদের বাটীতে লোকে পূজা পাঠাইয়া দেয়।

ধর্ম্ম পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বাঙ্গালায় ধর্ম্মরাজের পূজা আর কিছুই নহে কেবল বুদ্ধদেবের পূজা। ধর্ম্মপূজা

প্রকারান্তরে বৌদ্ধধর্ম্ম হইলে অহিংসার ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন "বাঙ্গালার রাঢ় অঞ্চলে ঐ দেবতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব * * ভারি ভারি উৎসব হয় ও তদুপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। ধর্ম্মদেবতা অত্যন্ত মদ্যমাংস প্রিয়।" আমাদের মনে হয়, ধর্ম্মপূজা যমের পূজা; যমের একটি নাম ধর্ম্মরাজ। ধর্ম্ম নিষ্কলঙ্ক শ্বেত সেই জন্য বেদীতে একটি করিয়া শ্বেত শঙ্খ থাকে। যখন বৈষ্ণবভাবে পূজা হয়, তখন হিংসার কথা থাকে না, ধর্ম্মরাজ যে বিষ্ণুরই মূর্ত্তি। যখন ধর্ম্মরাজের দূতগণের পূজা হয়, তখন মদ্য মাংসের প্রয়োজন হয়। ভদ্র ইতর দুই শ্রেণীয় লোকেই ধর্ম্মপূজা করে। তবে ইতর জাতীয়েরা শীতলা পণ্ডিতগণের ন্যায় তাম্রবলয় ধারণ করে। ধর্ম্মরাজের গাজনও হয়।

মনসা-পণ্ডিত বা 'মশাই'। ইহারা মনসা দেবীর পূজা করে। ইতর জাতীয়ই অধিকাংশ। ভাদ্র মাসে অনেক মাল সর্প আনিয়া দেবীর সম্মুখে দংশনের ক্রীড়া দেখায়, অনেক পশু বলিদান হয়। ইহার নাম ঝাঁপান। মশাইয়ের উপর ভাবাবেশ হয়।

রামকৃষ্ণশিষ্য।—ইহারা শাক্তদের মধ্যেও বটেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কালীসিদ্ধ ছিলেন। বেলুড় মঠ। "প্রবুদ্ধভারত" "উদ্বোধন" পত্রিকা মুখপত্র।

ভালবাসা।

কে তুমি মোহন মন্ত্রে
বাঁধিছ বিশাল ভব—
কেন বিশ্ব সদা ছুটে
ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশে তব?

নদ নদী পশু পক্ষী
জ্ঞানী নর তরু লতা,—
সবাই শুনিতে চায়
তোমারি প্রেমের কথা!

কিন্তু রে লভিয়া তোরে
বল কিবা আছে ফল ?
যে তোরে নিয়ত পূজে
তারি সার অশ্রুজল !

উন্মত্তা বিভলা রাই
তোরেই আশ্রয় করি
পূত তপোবন মাঝে
কি বলিব হরি হরি

ঢালিয়াছে শকুন্তলা
কত প্রাণগলা জল— !
জানকী নয়নধারে
ভিজায়েছে ধরাতল !

পবিত্র স্বরগস্থিতা
উর্ব্বশী সুন্দরী হায়,—
এসেছিল তোরি তরে
পাপময় এধরায় !

যে তোরে করিবে সার
তারি সার অশ্রুধার—
অগাধ স্নেহের তোর
এই কিরে পুরস্কার !

বসিস যাহার হৃদে
দহিস তাহার মন,
তবু তোরে সবে চায়
একি তীব্র আকর্ষণ !

আমিত বুঝি না তুই
কি মধুর হলাহল—
এত যে যাতনা তবু
কেন তোরে চাহি বল ?

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

পাপের পরিণাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে আজ অনেকদিনের কথা, তখন কেশবচন্দ্র পাটনা কলিজীয়েট স্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন। বাটীতে ঠাকুর ও বৃদ্ধামাতা আছেন এবং বেতনও তেমন অধিক নয়, এই সকল কারণে কেশব তাঁহার পত্নী লতিকাকে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও পাটনায় আপনার নিকট রাখিতে পারেন না। মাসে মাসে বাটীতে খরচ পাঠাইয়া দেন, এবং পূজার সময়, বড়দিনে বা গ্রীষ্মাবকাশে বাটী যান। সমস্ত ছুটিটী তথায় সুখে অতিবাহিত করিয়া আবার কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমন করেন। কেশবচন্দ্র আত্মীয় বন্ধুহীন বিদেশে জননী ও ভার্য্যার বিরহে আশা ও আকাঙ্খাপূর্ণজীবনে একরূপ সুখদুঃখে দিনযাপন করেন।

বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটা, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা স্কুল বসিয়াছে, কেশব ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে জ্যামিতির একটী অনুশীলনী বুঝাইয়া দিতেছেন, এমন সময়ে পিয়ন তাঁহাকে একখানি টেলিগ্রাম দিয়া গেল। তাহাতে লেখা আছে,—"শীঘ্র বাটী আসিবেন, এখানে বড় বিপদ উপস্থিত।" উহার প্রেরক কেশবের জ্ঞাতিসুবাদে খুল্লতাত। এরূপ অবস্থায় মনুষ্যের মনোভাব যেরূপ হওয়া সম্ভব কেশবেরও তাহাই হইল। তিনি আকুল হৃদয়ে হেড্‌মাষ্টারকে বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী যাইবার জন্য বাহির হইলেন। যথাসময়ে ট্রেনে আরোহণপূর্ব্বক চিন্তাক্লিষ্ট প্রাণে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহের বারান্দায় শুইয়া মাতা-ঠাকুরাণী কাঁদিতেছেন, নিকটে কেবলমাত্র একটী প্রতিবেশী বিধবা রমণী বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিয়া মাতাঠাকুরাণির ক্রন্দনরোল দ্বিগুণ হইল এবং সেই সঙ্গে পার্শ্বস্থিত স্ত্রীলোকটীও কাঁদিতে লাগিলেন। কেশব তাঁহার মাতার নিকট লতিকাকে দেখিতে পাইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ শুনিলেন, তাঁহার লতিকা আর ইহলোকে নাই, গতকল্য সন্ধ্যার সময় ভাগীরথীসলিলে গাত্রধৌত করিতে যাইয়া পদস্খলনপূর্ব্বক নিমগ্ন হইয়া কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার সে শূন্যপ্রাণ দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কেশবচন্দ্র স্ত্রীর ঈদৃশ বিয়োগবার্ত্তা শ্রবন করিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর ও ম্রিয়মান হইলেন। তাঁহার সেই শব্দহীন করুণ ক্রন্দনের বর্ণনা করা অসম্ভব। কেশবচন্দ্র সবেমাত্র পাঁচ দিনের ছুটী লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বাটী হইতে লিখিয়া আরও পাঁচ দিনের ছুটী বৃদ্ধি করিয়া লইলেন। অন্যান্য সময়ে বাটী আসিয়া কেশবচন্দ্র যেমন আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, এবার তাঁহার কিছুই নাই; শূন্য প্রাণে একাকীই অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে, তাঁহার সহিত কথা কন। অন্য সকল বন্ধুগণের মধ্যে নগেন্দ্রনাথের সহিত বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সৌহার্দ্য কিছু অধিক। নগেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ধনীলোক না হইলেও উহার অবস্থা কেশবের অপেক্ষা অনেক ভাল, কিন্তু তাঁহার জন্য তিনি কখনও দরিদ্র বন্ধু কেশবকে অনাস্থা প্রদর্শন করেন না। তাঁহার এই নিদারুণ মানসিক কষ্টের সময় নগেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতেন এবং নানারূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে নয় দিবস কাটিয়া গেল। কেশব এইবার জননীকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন।

দিন যেরূপে কাটিতেছিল, সেইরূপেই কাটিতে লাগিল। লতিকার মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন সে শোকের যন্ত্রণাও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে আর এক বারও বাটী যান নাই, আর কাহার জন্যই বা যাইবেন? যে দিন লতিকারে হারাইয়াছেন সেই দিবসই জন্মভূমির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য ঘুচিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধা জননী পুত্রকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য অনেকবার বলিয়াছেন কিন্তু তিনি সকল সময়েই অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথও কয়েকবার বিবাহ করিবার জন্য পত্রের দ্বারা অনুরোধ করেন এবং একটী সৎবংশজাত সুশ্রী অথচ বয়স্থা পাত্রীর সবিশেষ বিবরণ তাঁহাকে লেখেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কেশবচন্দ্র পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিষয় অনেক চিন্তা করিয়াছেন, বিবাহ করিলে সুখী হইবেন কি অধিকতর দুঃখী হইবেন, সে কথা অনেক ভাবিয়াছেন, অনেক মানসিক তর্কবিতর্কের পর তাঁহার পক্ষে বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র এই সম্বন্ধে সকলকার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া অবশিষ্ট জীবন বিপত্নীক অবস্থাতেই রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের সুখের বা দুঃখের তুলনা করা বড়ই কঠিন। কেশবচন্দ্রের জীবনের আরও আটটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কাল ও অদৃষ্টের অপ্রতিহত আবর্ত্তনে তাঁহারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জননীদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখন কেশবচন্দ্র এই বিশাল জগৎ-সংসারে একা। জননীর মৃত্যুর পর তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত ভবনগড়ের রাজার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। এখন তাঁহার নিজের ব্যয় অতি অল্পই হইয়া থাকে, রাজার বাটীতে থাকেন, রাজার ব্যয়ে আহারাদি করেন অথচ বেতন পূর্ব্বের তুলনায় অনেক অধিক, যাহা উপার্জ্জন তাহা প্রায় সবই জমিতেছে। রাজ-সংসারে শিক্ষকতা ভিন্ন, তাঁহাকে আরও কিছু অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, অবশ্য সে জন্য আলাহিদা পারিশ্রমিকও যথেষ্ট পাইয়া থাকেন। কেশবের ন্যায় লক্ষহীন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা শূন্য শান্তিসূত্র বিছিন্ন মানব কোন্ কঠিন কর্ত্তব্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সহচর বিহীন সুদূর প্রবাসের বক্ষে থাকিয়া নিজের কঠোর জীবনে পরিশ্রমের দ্বারা ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন? জগতের এ রহস্য কিছুই বুঝা যায় না। কেশবকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে স্ত্রীবিয়োগ জনিত যে কোন দুঃখ নিহিত আছে এরূপ এখন আর মনে হয় না। তিনি বাস্তবিক এখন আর আপনাকে অসুখী মনে করেন না; লতিকার সেই স্বর্গীয় মুখখানি যদিও তিনি একেবারে ভুলিতে পারেন নাই, অতীতের সুখ স্মৃতির কথা ভাবিতে ভাবিতে যদিও এক আধবার সেই মুখখানি মনোমধ্যে উদিত হইয়া অনেক পুরাতন কথা, অনেক লুপ্তস্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয় তথাপি তাহা অল্পস্থায়ী। কেশবচন্দ্রের এখন মনের ধারণা এই যে সংসারে স্বাধীন জীবন মনুষ্যের প্রার্থনীয়। তাঁহার দাম্পত্যজীবনকে জীবনের একটা অলীক স্বপ্ন মাত্র মনে করিয়া আপন মনকে প্রবোধ দেন। এ মানবজীবন বাস্তবিকই কতকগুলা স্বপ্নের সমষ্টি

মাত্র, সুখস্বপ্নদর্শনকালে লোকে যেমন বিমোহিত হইয়া আত্মহারা হয়, দুঃখ-স্বপ্নদর্শনকালে তেমনি দুঃখের সাগরে ভাসিতে থাকে। কিন্তু স্বপ্নান্তে সুখ বা দুঃখের স্থিতি যেমন সামান্যকালের জন্য, মানবের জীবনেও সেইরূপ, সুখের বা দুঃখের সময় গত হইলে তাহার কথা বড় অধিক দিন মনে থাকে না।

যাহাহউক কেশব এখন আপনাকে সুখী এবং ভাগ্যবান মনে করেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত সুখের সহিত বিবাহিত জীবনের সুখের তুলনা করা কঠিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেশবচন্দ্র কালক্রমে ভবনগড়াধিপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, বৃদ্ধ রাজা বাহাদুর অনেক সময় তাঁহার সহিত স্বয়ং কথা কহিয়া থাকেন, এমন কি কখন কখন এক আধটি পরামর্শও করেন। রাজার বহুসংখ্যক কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে কেশবচন্দ্র ও প্রধান মন্ত্রী মহাশয় কেবল মাত্র বাঙ্গালি অবশিষ্ট প্রায় সকলই মহারাষ্ট্রীয়। তিনি রাজসংসারে মাষ্টার বাবু নামে খ্যাত।

ইংরাজরাজের নিকট মহারাজের সম্মান। জনসাধারণের নিকটও তাঁহার সুখ্যাতি অত্যন্ত অধিক, তিনি আড়ম্বর শূন্য দয়ালু এবং ক্রিয়াবান বলিয়াই বিশেষ বিখ্যাত। কালক্রমে তাঁহার পৌত্র বিবাহযোগ্য বয়ক্রম প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঞ্জাবের এক বিশিষ্ট ধনী ব্যবসাদারের কন্যার সহিত শুভ সম্বন্ধ স্থির হইল। রাজবাটীর চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে কন্যাকে ভবন-গড় রাজ্যেই বিবাহার্থে আনয়ন করা হইল।

যথা সময়ে বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল। দীনদরিদ্রগণকে অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি দান করা হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের নৃপতিগণকে ও ধনীব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল। বিবাহের এখনও একপক্ষ বিলম্ব, ইতিমধ্যে নৃত্যগীতাদি আরম্ভ হইয়াছে। রাজার সুন্দর মনোরম অট্টালিকা-গুলি পত্র পতাকাদির দ্বারায় সজ্জিত করা হইয়াছে, নহবতের মনোহারী সঙ্গীতধ্বনিতে সর্ব্বত্র সমস্ত দিনরাত্রই প্রতিধ্বনিত।

অদ্য বিবাহ উৎসবের চূড়ান্ত আমোদের দিন, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এমারেল্ড থিয়েটার কোম্পানির অভিনয় হইবে। ইতিপূর্ব্বে এ প্রদেশে

থিয়েটার আর কখনও হয় নাই। সন্ধ্যা আগত হইলে, নগরী পূর্ব্ব পূর্ব্ব রজনীর ন্যায় আলোকমালায় বিভূষিত হইল। যথা সময়ে নিমন্ত্রিত বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের দ্বারায় অভিনয়মণ্ডল পরিপূরিত হইতে লাগিল। সেই শুভ্র তাড়িতালোকশোভিত নয়নমন তৃপ্তিকর উৎসবশোভার বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

রাত্রি ৮টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইল, বিষয়—"পূর্ণচন্দ্র"। রাজ-পৌত্রকে একটি বিশেষ আসনে বসান হইল, রাজাও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, অনতিদূরে কেবলমাত্র দুইজন সশস্ত্র দেহরক্ষক দণ্ডায়মান রহিল।

বাঙ্গালীর অভিনয়, বিষয় বাঙ্গালীর, অভিনেত্রীও বাঙ্গালী, দর্শকগণ অধিকাংশই হিন্দুস্থানি মাড়োয়ারী। তাঁহারা সকলেই স্থির বিস্ময়নেত্রে অভিনয় দর্শন করিতেছেন, গীত শুনিয়া মোহিত হইতেছেন, আর দৃশ্যপটের স্বাভাবিকতা দেখিয়া আত্মহারা হইতেছেন; কিন্তু অভিনয়ের কেহই কিছু বুঝিতেছেন না। যে সকল সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালী নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারাই এই অভিনয়ের প্রকৃত দর্শক। তাঁহারা বহু-দিনের পর জন্মভূমির নরনারীর নাট্যাভিনয় দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে সুশীলানাম্নী একটি অভিনেত্রী বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, তাঁহার সমতুল্য অভিনেত্রী আর কেহ নাই। তিনি এই এমারেল্ড থিয়েটারেই অভিনয় করেন, অদ্য পূর্ণচন্দ্রের লুনার অভিনয় তিনিই করিবেন। যাঁহারা তাঁহার নাম অবগত আছেন সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক। যথা সময়ে সুদৃশ্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া নয়নবিমোহনী মূর্ত্তিতে সুশীলা শালিবান রাজার দ্বিতীয়া মহিষী লুনারবেশ ধারণ করিয়া দর্শকগণকে দেখা দিলেন। কয়েকটি বাঙ্গালীর করতালীর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক হইতে বেগে করতালিধ্বনি হইতে লাগিল।

লুনার বচনপারিপাট্যে ও অভিনয়ের স্বাভাবিকতায় সকলেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। যখন কামোন্মত্ত বৃদ্ধ রাজা লুনার বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মিনতিপূর্ব্বক বারংবার তাঁহার মনোবেদনাদাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন সকলেরই নয়ন মন তাঁহাদের প্রতিই সংরক্ষিত। এমন সময়ে দর্শকগণের মধ্যে সহসা এক ব্যক্তি বিকট চিৎকার করিয়া

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সকলেই সেই দিকে নয়ন ফিরাইলেন, কেহ কেহ নিকটে গমন করিয়া জনতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; দূরস্থিত ব্যক্তিগণ ব্যাপার কি জানিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; এইরূপে শীঘ্রই মহাগোলযোগ হইয়া উঠিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ দেখিয়া শুনিয়া ড্রপ্ ফেলিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একজন রাজকর্ম্মচারীর মুখে 'মাষ্টার বাবু' এই কথাটি শুনা গেল। রাজা স্বয়ং নিকটে আসিলেন এবং ডাক্তার তথা উপস্থিতই ছিলেন, তিনিও মুর্চ্ছিত ব্যক্তির কাছে গেলেন। ক্রমে শুনা গেল, কেশবচন্দ্র নামে একটি বাঙ্গালী, ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, হঠাৎ মুর্চ্ছিত হইয়াছেন। কি কারণে জানি না, বাঙ্গালী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত দুই একটি অভিনেতাও তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের আদেশে মূর্চ্ছিত কেশবচন্দ্রকে কয়েক ব্যক্তি ধরাধরি করিয়া মণ্ডপ হইতে বাহিরে আনয়ন করত গৃণরূমের পার্শ্বেই একটি ঘরে রাখিলেন। সে স্থানে অপর লোক বড় কেহ রহিল না, রাজভৃত্যেরা সজোরে বাতাস করিতে লাগিল আর ডাক্তার মহাশয় নিজ হস্তে চোখেমুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন। অপর লোকের মধ্যে অভিনেত্রীশ্রেষ্ঠা সুশীলা ও রাজার নাট্যাঙ্গ অভিনেতা গৃণরূমের জানালা দিয়া কেশবকে দেখিতেছিল। কিয়ৎকাল পরেই কেশবচন্দ্রের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। কেশব আর তথা পুনঃপ্রবেশ করিলেন না, একাকী নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন।

কেশবের পীড়া জনিত গোলমালের পর দুই একটী অভিনেতার দোষে অভিনয় খারাপ হইতে লাগিল। অধ্যক্ষ নাটকের অনেক অংশ ছাড়িয়া দিয়া শীঘ্রই অভিনয় শেষ করিয়া দিলেন। অভিনয় ভাঙ্গিয়া গেলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজা অমাত্য ও বন্ধুগণ লইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় কোতয়াল একখানি পত্র হস্তে করিয়া নৃপতিকে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! নগরের দক্ষিণে নদীর তীরে একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষের শাখায় একটি বস্ত্রালঙ্কার পরিহিতা সুন্দরী রমণীর মৃতদেহ

ঝুলিতেছে। তথাকার অধিবাসীরা কেহই সেই মৃতা নারীকে চিনিতে পারিতেছে না। এই পত্রখানি তাঁহার নিম্নে মৃত্তিকার উপর পতিত ছিল।"

মহারাজ স্বয়ং পত্রখানি হস্তে করিয়া দেখিলেন পত্রের উপরে মাষ্টার বাবু—কেশবচন্দ্রের নাম। খুলিয়া আপন মনে পাঠ করিলেন,—

"প্রভু!—

আমার সম্বোধনের উপযুক্ত কথা নাই। এ কলঙ্কিনীর পোড়ারমুখ যে আবার কখনও তোমার নয়নে পতিত হইবে তাহা একদিনও মনে হয় নাই। সকলেরই শেষ আছে, আমার পাপেরও এইবার শেষ হইয়াছে। যদি প্রবৃত্তি হয় তবে নয় বৎসর পরে এই পাপিনীর অন্তিম সময়ের পত্রখানি একবার পড়িও।

তুমি জান আমি ইহলোকে আর নাই, অনন্ত প্রবাহিনী গঙ্গার সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছি, কিন্তু আমার ন্যায় পাপিষ্ঠাকে কি মা গঙ্গা তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দেন? তখন যদ্যপি বাস্তবিকই মরিতাম তাহা হইলে হয়ত পরজন্মে তোমার শ্রীচরণে স্থান পাইবার আশা করিতে পারিতাম, কিন্তু এখন তাহা দুরাশা মাত্র। আমি ভাগীরথীর জলে ডুবি নাই বটে কিন্তু সেই দিন হইতেই কুলহীন সীমাহীন পাপের অনন্ত সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি আমার এ দশা করিয়াছে কে জান? তোমার সেই অকপট সুহৃদ সেই নগেন্দ্রনাথ। তাহারই কৌশলে আমার মৃত্যু ঘটিত হয়। মরিতে বসিয়াছি আর লজ্জা কিসের? নগেনের সেই কান্তমূর্ত্তি, সেই আকর্ণ বিস্তৃত লোচন-যুগল তোমার পবিত্র দেবমূর্ত্তিকে আমার হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছিল। কুলত্যাগ করিয়া আমি সেই দিনই নগেন্দ্র কর্ত্তৃক কলিকাতা প্রেরিত হইলাম। তৎপরে কয়েকদিন পরে তুমি মাকে লইয়া পাটনা চলিয়া গেলেপর নগেন কলিকাতায় আসিল। তদবধি আমরা একত্রেই থাকিতে লাগিলাম এবং তাহারই পরামর্শে সুশীলা নাম ধারণ করিলাম। ক্রমে নগেনের চেষ্টায় আমি নৃত্যগীতে বেশ শিক্ষিতা হইলাম। নগেন এই সময়েই থিয়েটারে প্রবেশ করে, প্রথম আমার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার ও আমার অপর সঙ্গিনীদের বিশেষ অনুরোধে শেষে আমিও ঢুকিলাম। অদ্যকার অভিনয়ে যে রাজা সাজিয়াছিল, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলে কি? সেই নগেন্দ্রনাথ।

আমি এতদিন মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে আমি কুলকলঙ্কিনী প্লাবাণী হইলেও তোমার ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিবাহ করিবার জন্য তোমায় নগেন যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা আমারই কথায়, বিবাহ করিলে আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইব এই আশায়। জানি না তুমি পুনরায় বিবাহ করিয়াছ কি না, কিন্তু আজি যেন মনে হইতেছে যে আর বিবাহ কর নাই। প্রভু! আজি তোমার প্রাণে কি ভয়ানক ব্যথাই দিলাম। তুমি এখানে আছ জানিলে আমি প্রাণ থাকিতে তোমায় কখন দেখা দিতাম না। আমায় ক্ষমা করিবার ক্ষমতা বুঝি দেবতারও নাই। আজি আমার পাপজীবনের পাপকাহিনী সংক্ষেপে বলিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিব ইহাই বাসনা। আমার অসীম পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত অদ্য সাধিত হইয়াছে। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তোমার সেই মুখখানি দেখিয়া অবধি আমার অন্তর মধ্যে যে যাতনা হইতেছে তাহা আর কি বলিব, হৃদয়ের মধ্যে যেন হু হু শব্দে অনল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। উঃ অনুতাপের কি অসহ্য যন্ত্রণা, আর পারি না, হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে। নরকের যাতনা কি ইহা অপেক্ষাও অধিক?

আমি দুশ্চারিণী শত অপরাধিনী এবং তোমার পরিত্যাজ্যা হইলেও তুমি আমার ইহলোকের জীবন্ত দেবতা; নাথ, আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। ইচ্ছা ছিল তোমার সম্মুখে দূরে দাঁড়াইয়া আমার এই পাপ-কাহিনী স্বমুখে বলিয়া তারপরে মরিব, তাহাও অদৃষ্টে নাই, হইল না। অভিনয় ভাঙ্গিলে সকলে বিশ্রাম করিলে পর আমি তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলাম। অনেক চেষ্টায় তোমার বাসারও সন্ধান পাইয়াছিলাম, দেখিলাম দ্বার রুদ্ধ, দ্বার খুলিবার জন্য কয়েকবার ধীরে ধীরে অনুরোধ করিলাম কিন্তু কেহই শুনিতে পাইল না, জোরে ডাকিবার সাহস হইল না, তখন পুনরায় অচেনা রাজপথ দিয়া আমাদের বিশ্রামস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। কোন প্রকারে ম্যানেজারের পকেট হইতে পেন্সিল ও কাগজ সংগ্রহ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি।

নাথ, এইবার চিরদিনের জন্য বিদায় হইব, যখন তুমি এই পত্র পাইবে তখন আমি আর এ জগতে থাকিব না। আমার আর কিছু বলিবার নাই, আর কিছু প্রার্থনা নাই, তোমার শ্রীচরণের উদ্দেশে একটি প্রণাম করিলাম,

ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়া এই অভাগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিও। আমি এই বিদেশের অপরিচিত ভূমে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিলাম, শ্রীচরণে নিবেদন, ইতি—

পাপিষ্ঠা—লতিকা—"

মহারাজ পত্রখানি পাঠ সমাপনান্তে দুঃখিত ও বিস্মিত মনে পারিষদবর্গের প্রতি চাহিলেন। পত্রের মর্ম্ম কেহই অবগত নহেন, সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তখন মহারাজ শীঘ্র এক ব্যক্তিকে কেশবচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

কিছুকাল পরে সেই ব্যক্তি দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া কম্পিত কলেবরে রাজার হস্তে এক খণ্ড রক্তাক্ত কাগজ দিয়া বলিল,—"মহারাজ! মাষ্টার বাবুকে কে হত্যা করিয়াছে, গলদেশে ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে আর গৃহ রক্তে রক্তময়। এই কাগজখানি তাঁহার নিকটে পড়িয়াছিল।"

মহারাজ একজন সভাসদকে কাগজখণ্ড পাঠ করিতে বলিলেন, তখন উহা উচ্চৈস্বরে পঠিত হইল,—"ভবনগড়াধিপতি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুর, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। এই হতভাগ্য কেশবকে কেহ হত্যা করিয়াছে এরূপ মনে করিবেন না। জানিবেন আমিই আমার হত্যাকারী।"

"সেবক শ্রীকেশবচন্দ্র রায়।"

জীবে-প্রেম।

পৃথিবীতে সুখে বাস করিতে হইলে, সকলের প্রতি প্রেম স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সকল জাতির মধ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধরাই প্রকৃত জীবদিগের প্রতি প্রেম স্থাপন করিতে পারেন। জীবে প্রেম কথাটী ইংরাজদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাঁহারা মাংস ভোজন না করিয়া প্রায়ই থাকিতে পারেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণবগণ এবং বৌদ্ধগণই প্রকৃত জীবের প্রতি প্রেম স্থাপন করিতে পারেন।

বঙ্গদেশের প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক, বৈষ্ণবপ্রবর গৌরাঙ্গদেবের বিষয়ে এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক বুদ্ধদেবের বিষয়ে জীবে প্রেমের উদাহরণস্বরূপ অনেক

মনোহর গল্প প্রচলিত আছে। সেই সকল পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। এই প্রকার কথিত আছে যে—একদিন বুদ্ধদেব ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে এক ব্যক্তি একপাল ছাগ লইয়া যাইতেছে। তিনি সেই ছাগপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই সকল ছাগ কোথায় লইয়া যাইতেছ, সেই ছাগপালক উত্তর করিল যে মগধের রাজা বিম্বসারের নিকটে বলিদানের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি। ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব রাজার নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন "এই জীবগুলিকে হত্যা করা অত্যন্ত পাপকার্য্য এবং ইহার ন্যায় গর্হিত কর্ম্ম বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই।" তিনি আরও অনেক প্রকার উপদেশ দিয়া বিম্বসারকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাহার পর বুদ্ধদেব রাজাকে বলিলেন, যে আপনি এই ছাগগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে বলিদান করুন, কিন্তু তাহাতেও রাজা সম্মত হইলেন না। পরে বুদ্ধদেব রাজাকে বলিলেন যে আপনি একটী ছাগকে ছাড়িয়া দিয়া আমার প্রাণ গ্রহণ করুন। এইবার রাজার মন টলিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে এই ব্যক্তি কি প্রকার প্রেমিক। একটি সামান্য ছাগের নিমিত্ত নিজের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তৎক্ষণাৎ বিম্বসার বুদ্ধের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং সেই দিনই বিম্বসার তাঁহার শিষ্য হইলেন। রাজাদিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গ প্রভুরও এই প্রকার শত শত গল্প প্রচলিত আছে। গৌরাঙ্গ প্রভু সদলে সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটী সিংহ হঠাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমন করিতে আসিল, প্রেমোন্মত্ত গৌরাঙ্গদের তাহাকে কোল দিতে ছুটিলেন। তখনই হিতেবিপরীত হইল। কোথায় সিংহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, না তাঁহাদিগের দয়া দেখিয়া এবং আনন্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল।

বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্ম "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এবং যাঁহারা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা প্রকৃতই কোন জীবের প্রতি হিংসা করেন না। তাঁহারা মাছ, মাংস কিছুই ভোজন করেন না, এবং তাঁহারা সর্ব্বদা মুখে কাপড় বাঁধিয়া থাকেন, পাছে কোন প্রকার ক্ষুদ্র কীট মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া মরিয়া যায়, এবং যখন তাঁহারা বেড়াইতে বাহির হন তখন তাঁহাদিগের হস্তে একটী ক্ষুদ্র ঝাঁটা থাকে, তাহার দ্বারা তাঁহারা পথে শায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গদিগকে সরাইয়া সরাইয়া দেন, পাছে তাহারা পদদলিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যে কতকগুলি জৈন কিছু চিনি লইয়া পিপীলিকার গহ্বরে প্রদান করিতেছেন।

গৌরাঙ্গপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন যে বৈষ্ণবদিগের লক্ষণ "জীবে দয়া, নামে রুচি" সর্ব্বজীবে দয়া করিতে না পারিলে এবং হরিনামে রুচি না হইলে কখনই বৈষ্ণব হওয়া যায় না। কিন্তু আমাদিগের দেশে প্রকৃত বৈষ্ণব আজ কাল অত্যন্ত বিরল। বাঙ্গালার অধিকাংশ বৈষ্ণবেরাই প্রত্যহই মৎস্যভোজন করিয়া থাকেন। সেইজন্য বঙ্গদেশের বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া তুলসীদাস বলিয়াছেন "উস্ লোক যব্ গোঁসাই হোগে, তব্ কসাই হোগে কোন্?" এই সকল লোকে যদি গোঁসাই হন তবে কসাই কাহারা হইবেন? তুলসিদাস যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত কথা।

সমস্ত জীবের প্রতি যে ব্যক্তি প্রেম স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিকপুরুষ। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি বলিয়াছিলেন দেখুন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মনং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। (৬ অধ্যায়-২৯)

অর্থ— আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত,
সর্ব্বত্র সমান দর্শী যোগী করে অনুভূত। (নবীন সেন)

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ। (৬ষ-৩২)

অর্থ— সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
সুখে দুঃখ মম মতে সেইজন যোগী পরম। (নবীন সেন)

হিতোপদেশে এই প্রকার লিখিত আছে—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা ক্ষুদ্র চেতসাম্।
উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকং॥
নিগুর্ষ্বপি মত্যেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি মাধবঃ।
নহি সংহরতে জ্যোৎস্নাম্ চন্দ্রশ্চণ্ডাল বেশ্মনি॥

অনুবাদ— আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্র মতি নর,
মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার।

নির্গুণ জনেও দয়া সাধুগণ করে,
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে।

এ আমার আপন, এ ব্যক্তি আমার পর, এই প্রকার যে ভাবে সেই অতি ক্ষুদ্রমতি। কিন্তু মহাত্মালোকের বিশ্বসংসারই আপন পরিবার। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহাত্মালোক হন তিনি সর্ব্বজীবকেই সমান দেখেন।

হিন্দুরাজা অশোক (পরে বৌদ্ধ) জীবদিগকে প্রকৃত ভালবাসিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পীজরাপোল স্থাপন করেন। জীবগণের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, এবং নানা প্রকার ধর্ম্মকথা বড় বড় প্রস্তর খণ্ডে খোদিত করাইয়া সেই গুলিকে নিজ রাজ্যের সর্ব্বস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পাথরগুলির মধ্যে কতকগুলি এখনও দিল্লীতে, পুরীতে, গুজরাটে, এলাহবাদে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন একটী ইংরাজি কবিতাতে লিখিত আছে—"যে সকল লোকের প্রধান উদ্দেশ্যই শান্তি স্থাপন করা এবং স্থলচর খেচর সকলের প্রতিই প্রেম স্থাপন করা, তাঁহারাই খৃষ্টান নামের প্রকৃত উপযোগী।"

বাইবেলেও এই প্রকার সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম স্থাপন করার বিষয় লিখিত আছে; সেই কথাগুলি যিশুখৃষ্ট যুহুদীদিগকে বলিতেছেন—

Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour and hate thine enemy.

But 1 say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.

That ye may be the children of your Father which is in Heaven; for he maketh his sun to rise in the evil and in the good and sendeth rain on the just and on the unjust.

অর্থাৎ—তোমরা শুনিয়াছ যে এই প্রকার কথিত আছে, তোমাদের ধর্ম্ম-পুস্তকে এই প্রকার লিখিত আছে, তোমরা তোমাদিগের প্রতিবেশীকে ভাল বাসিবে এবং শত্রুদিগকে ঘৃণা করিবে।

কিন্তু আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, তোমরা তোমাদের শত্রুদিগকে ভাল-বাস, যাহারা তোমাদিগকে অভিসম্পাৎ করে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষা কর এবং যাহারা তোমার সহিত ঘৃণিতভাবে ব্যবহার করে এবং তোমাকে উৎপীড়িত করে, তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট মঙ্গলকামনা করিয়া প্রার্থনা কর।

তাহা হইলে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে; কারণ তিনি ত সূর্য্যের কিরণ সৎ, অসৎ সকলেরই উপর বিতরণ করেন, এবং ভাল মন্দ সকলেরই উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব তোমারা ভাল মন্দ সকল জীবের উপর প্রেম বিতরণ কর।

যুধিষ্ঠির যে কি প্রকার বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন তাহা স্বর্গারোহণের সময়ে, একটী নিকৃষ্ট সারমেয়ের প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারো-হণের গল্প প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

মনু বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রত্যহ গ্রন্থাদি পাঠ করা, মুনি ঋষিদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করা পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এবং ভোজন করিবার পূর্ব্বে কাক, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ-দিগকে খাবার দেওয়া। দেখুন দেখি কি প্রকার সুপ্রণালী। সর্ব্ব অগ্রে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গদিগকে ভোজন করাইয়া, নিজে ভোজন করিবে। তাহা হইলে জীবদিগকে কতটা ভালবাসিতে বলিতেছেন?

আর অধিক লিখিয়া কায নাই। সকল ধর্ম্মই স্বীকার করেন যে জীবে প্রেম সকল ধর্ম্মের সার বস্তু।

অতৃপ্তি।

ঘেরিয়া নিখিল বিশ্ব কি এক অতৃপ্ত তৃষা জাগে,
মায়া মোহ দুঃখ প্রেম ভক্তি জ্ঞান সকলের আগে।
অনন্ত বিস্তৃত লক্ষ যোজন হইতে দূরতরে,
অপ্রাপ্য বিষয়ে আনে আপনার পরিধি মাঝারে।
সীমা নাই কুল নাই অনন্তের প্রতিরূপ প্রায়,
কি এক সুদীর্ঘ তৃষা অন্তরেতে পরিসর পায়;—

কোথায় উদ্ভব তার কে পারে গো করিতে গণনা!
এই জানি সুধু মর্ম্ম মাঝে জাগে সেই অদম্য বাসনা।

নিষ্ফল কামনা বক্ষে গুমরিতে থাকে নিশিদিন,
মানসিক কর্ম্মে রাখে প্রভুতায় করিয়া বিলীন।
অতৃপ্তি অতৃপ্তি সুধু—মনে হয় তৃপ্তি হেথা নাই,
তৃপ্তির যেখানে বাসা সেই স্থান দেখিবারে চাই।
নিখিলের তৃপ্তিরাশি হরিয়া লইল কোন্ জন—
অনুদিন পলে পলে উদাসীন ভাবে মম মন।
অসীম সাগর বক্ষে সাধ হয় ভাসিয়া বেড়াই—
অসীম সাগর বক্ষে অন্বেষিয়া তৃপ্তি যদি পাই।

কি কাজ সাধিতে ভবে তাও যেন গিয়াছি ভুলিয়া,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ঘোর অন্ধকারে বেড়াই ঘুরিয়া।
জ্ঞান হারা লক্ষ্য হারা অন্ধকারে বসিয়া সুধাই
'কি কাজ সাধিব বল,'—ব'লে দিতে কেহ কিরে নাই?
সকলে কি অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায় মোর মত?
সবে কি রেখেছে বাঁধি' কুহেলিকাপূর্ণ এ জগত?
কবে এসেছিনু হেথা কোন্ অতীতের কুয়াশায়
অলক্ষ্যে কখন মনে এলে সুধু প্রাণ ডুবে নিরাশায়।

তাই মনে হয় যদি হইতাম বায়ুর হিল্লোল,
খেলিতাম তরঙ্গে মিশিয়া কোনো থাকিত না গোল।
ফুলের নিকট হ'তে ভিক্ষারূপে সুবাস লইয়া
জনহীন বন দিয়া যাইতাম বহিয়া বহিয়া।
স্বার্থশূন্য লক্ষ্যশূন্য যতেক জঞ্জাল শূন্য হ'য়ে
খেলিতাম আনমনে প্রকৃতির স্বভাব নিলয়ে।
কৃত্রিম প্রয়াস ল'য়ে আনিতে হত'না প্রেমরাশি—
উদাসীন করিত না ভবে আজি এ অতৃপ্তি আসি'।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমাধি মন্দিরে—সংকীর্ত্তনানন্দে।

আজ ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাগানে আসিয়াছেন। রবিবার জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি; ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর সকাল নয়টা হইতে ভক্তসঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

সুরেন্দ্রের বাগান কলিকাতার নিকটস্থ কাঁকুড়গাছী নামক পল্লীর অন্তর্গত। নিকটেই রামের বাগান। যে বাগানে ঠাকুর প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব হইতেছে।

সকাল হইতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়াগণ মাথুর গাহিতেছিল। গোপীদিগের প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতীর শোচনীয় অবস্থা সমস্ত বর্ণিত হইতেছিল। ঠাকুর মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। ভক্তগণ উদ্যানগৃহমধ্যে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

উদ্যানগৃহমধ্যে প্রধান প্রকোষ্ঠে সংকীর্ত্তন হইতেছিল। ঘরের মেজেতে সাদা চাদর পাতা, মাঝে মাঝে তাকিয়া রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠের উত্তর ও দক্ষিণে বারাণ্ডা আছে। উদ্যান গৃহের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটী বাঁধাঘাট বিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিণী। গৃহ ও পুষ্করিণী ঘাটের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানপথ পূর্ব্ব পশ্চিমে যাইতেছে। পথের দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ রহিয়াছে। উদ্যান গৃহের পূর্ব্বধারের পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফটক পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা গিয়াছে। লাল সুরকির রাস্তা তাহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ ও ক্রোটনাদি গাছ। ফটকের নিকট ও রাস্তার পূর্ব্বধারে আর একটী বাঁধাঘাট পুষ্করিণী। পল্লীবাসী সাধারণ লোকে এখানে স্নানাদি করে এবং পানীয় জল লয়। উদ্যান গৃহের পশ্চিমধারেও উদ্যান পথ, সেই পথের দক্ষিণ পশ্চিমে রন্ধনশালা। আজ এখানে খুব ধুমধাম, ঠাকুর ও ভক্তদের সেবা হইবে। সুরেশ ও রাম সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারন করিতেছেন।

উদ্যান গৃহের বারাণ্ডায়ও ভক্তদের সমাবেশ হইয়াছে। কেহ কেহ বা বন্ধুসঙ্গে প্রথমোক্ত পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বাঁধা ঘাটে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সংকীর্ত্তন গৃহমধ্যে ভক্তের জনতা হইয়াছে। সুরেন্দ্র রাম মাষ্টার মহিমাচরণ ও মণিমল্লিক ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত আছেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্তও উপস্থিত। তন্মধ্যে প্রতাপও আছেন।

* * *

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অতি করুণস্বরে আঁখর দিতেছেন। "সখি হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়, নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।" ঠাকুরের রাধাভাব হইয়াছে। কথাগুলি বলিতে বলিতেই ঠাকুর নির্ব্বাক হইলেন, দেহ স্পন্দহীন অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্র। সম্পূর্ণ বাহ্যশূন্য। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার সেই করুণস্বর। বলিতেছেন, "সখি তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে; তুইতো আমাকে কৃষ্ণপ্রেম শিখায়েছিলি।"

কীর্ত্তনীয়াদিগের গান চলিতে লাগিল। শ্রীমতী বলিতেছেন "সখি যমুনায় জল আনতে আমি আর যাবনা। কদম্বতলে আমি প্রিয় সখিকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, "আহা" "আহা"।

কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনীয়ারা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছে। প্রভু আবার দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ।

কতক সঙ্গালাভ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন "কিট্‌ম" "কিট্‌ম" (কৃষ্ণ) (কৃষ্ণ)। ভাবে মগ্ন। নাম সম্পূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে না।

এই বারে নাম সংকীর্ত্তন। তাহারা খোলকরতালিসঙ্গে গাহিতে লাগিল "রাধে গোবিন্দ জয়" "রাধে গোবিন্দ জয়"।
ঠাকুর আঁখর দিতেছেন। "ধনি দাঁড়ালোরে (অঙ্গ ভঙ্গ হেলাইয়া দাঁড়ালোরে)

(শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালোরে।)
(তমাল বেড়ি বেড়ে, ধনি দাঁড়ালোরে॥)

ভক্তেরা সকলেই উন্মত্ত। ঠাকুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। মুখে "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সরলতা ও ঈশ্বরলাভ।]

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিলেন। এমন সময় একটী অল্পবয়স্ক ভক্ত আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে সস্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন "তুই এসেছিস!"

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা না করিলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"দেখচনা ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল! লোকে বলে, "আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ।"

ঠাকুরের ভক্তেরা সরল। ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে আবার ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন!

(ভগবানের সেবা ও সংসারের সেবা)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সরল ছোকরা ভক্তের প্রতি)। "দেখ, তোর মুখে যেন একটা কাল আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস্ কিনা, তাই পড়েছে। আফিসে হিসাব পত্র কর্‌তে হয় আরও নানা রকম কাজ আছে, সর্ব্বদা ভাবতে হয়।"

"সংসারী লোকেরা যেমন চাকরী করে তুইও চাকরী করছিস্ তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরী স্বীকার করেছিস্। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ ছেলের জন্য চাকরী কত্তিস্ তাহলে আমি বলতুম "ধিক্ ধিক্ শত ধিক্"।

"সেবা যদি কত্তে হয়, ভগবানের সেবা করবে"

(মণিমল্লিকের প্রতি) দেখ, এই ছোকরাটী ভারি সরল। তবে আজ কাল একটু আধটু মিথ্যা কথা কয়—এই যা দোষ। সেদিন বলে গেল যে আসবে আর এলোনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও গোপী প্রেম)

ঠাকুর পশ্চিমের কামরায় দুচারজন ভক্তের সহিত এইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সেই ঘরে টেবিল চেয়ার কয়েকখানা জড় করা ছিল। ঠাকুর টেবিলে ভর দিয়া অর্দ্ধেক দাঁড়িয়েছেন, অর্দ্ধেক বসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আহা গোপীদের কি অনুরাগ! তমাল দেখি একেবারে প্রেমোন্মাদ হয়ে গেল।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ। গৌরাঙ্গের ঐরকম হয়েছিল। বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছিলেন, সমুদ্র দেখে যমুনা ভেবেছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা, সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারুর হয়! কি অনুরাগ! কি ভালবাসা! শুধু ষোল আনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা। এরই নাম প্রেমোন্মাদ। কথাটা এই। তাঁহাকে ভালবাসতে হবে। তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। তা তুমি যে পথেই থাকো সাকারেই বিশ্বাস কর বা নিরাকারেই বিশ্বাস কর। ভগবান মানুষ হয়ে অবতার হন, এ কথা বিশ্বাস কর আর না কর তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হোল। তখন তিনি যে কেমন, তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।

যদি পাগল হতে হয় সংসারের জিনিস নিয়ে কেন পাগল হবে? যদি পাগল হতে হয় ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ভক্তসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে)

ঠাকুর হল্ ঘরে আবার ফিরিলেন। তাঁহার বসিবার আসনের কাছে একটী তাকিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বসিবার সময় ওঁ তৎসৎ, এই মন্ত্র

উচ্চারণ করিয়া তাকিয়া স্পর্শ করিলেন। বিষয়ী লোকেরা এই বাগানে আসা যাওয়া করে ও এই সকল তাকিয়া ব্যবহার করে এই জন্য বুঝি ঠাকুর ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাধানটী শুদ্ধ করিয়া লইলেন। ভবনাথ মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া।

বেলা অনেক হইয়াছে এখনও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয় নাই। ঠাকুর বালক স্বভাব। বলিতে লাগিলেন কৈ গো—"এখনও যে দেয় না সুরেন্দ্র কোথায়?

একজন ভক্ত। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয় রামবাবু অধ্যক্ষ। তিনি সব দেখেছেন। (সকালের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে।

একজন ভক্ত। আজ্ঞা রামবাবু যেখানে অধ্যক্ষ সেই খানে এই রকমই হইয়া থাকে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) সুরেন্দ্র কোথায়? আহা সুরেন্দ্রের বেশ স্বভাবটী হয়েছে। বড় স্পষ্ট বক্তা—কারুকে ভয় করে কথা কয় না। আর দেখ, খুব মুক্ত হস্ত। কেউ যদি তার কাছে সাহায্যের জন্য যায় ত শুধু হাতে ফেরে না

[ভগবানদাস বাবাজী]

মাষ্টারের প্রতি। তুমি ভগবান্ দাসের কাছে গিয়াছিলে কিরকম দেখলে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, কালনায় গিছ্লাম ভগবান দাস খুব বুড়ো হয়েছেন। রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথার উপর শুয়ে ছিলেন। প্রসাদ এনে একজনে খাইয়ে দিতে লাগলো। চেঁচিয়ে কথা কইলে শুনতে পান। আপনার নাম শুনে বলতে লাগলেন তোমাদের আর ভাবনা কি! সেই বাড়ীতে নামব্রহ্ম ঠাকুরের পূজা হয়।

* * *

ভবনাথ (মাষ্টারের প্রতি)। আপনি অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ইনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলেন্ আর বল্ছিলেন যে, মাষ্টারের কি অরুচি হয়ে গেল। (এই বলিয়া ভবনাথ হাসিতে লাগিলেন।)

ঠাকুর উভয়ের কথপোকথন সমস্ত শুনিতে ছিলেন। তিনি মাষ্টারের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁগো তুমি অনেকদিন যাও নাই কেন বল দেখি।

মাষ্টার তো-তো করিতে লাগিলেন। এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। মহিমাচরণ কাশীপুরবাসী ঠাকুরকে ভারি শ্রদ্ধাভক্তি করেন ও সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে যান। ব্রাহ্মণ সন্তান, কিছু পৈতৃক বিষয় আছে। স্বাধীন-ভাবে থাকেন, কাহারও চাকরী করেন না। সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বর চিন্তা করেন। কিছু পাণ্ডিত্যও আছে। ইংরাজি সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) একি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত। এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আসতে পারে, এ যে একেবারে জাহাজ! (সকলের হাস্য) তবে একটা কথা আছে এটা আষাঢ় মাস (সকলের হাস্য)।

মহিমাচরণের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা লোককে খাওয়ান একরকম তারই সেবা করা, কি বল? সব জীবের ভিতরে তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। খাওয়ান, কি না তাহাকে আহুতি দেওয়া।

"কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক, এরা যেখানে বসে থায়, সে জায়গার নীচে সাত হাত মাটী অপবিত্র হয়।

হৃদে একবার লোক খাইয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খারাপ লোক। আমি বল্লুম, "দেখ্ হৃদে ওদের যদি তুই খাওয়াস তবে এই তোর বাড়ী থেকে চল্লুম।"

(মহিমের প্রতি) "আচ্ছা আমি শুনেছি, তুমি আগে লোকদের খুব খাওয়াতে, এখন বুঝি খরচা বেড়ে গেছে? (সকলের হাস্য)।

ক্রমশঃ।

প্রণব উপাসনা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে প্রণব উপাসনার রীতি কথিত হইয়াছে, তাহা মাণ্ডূক্য উপনিষদ অবলম্বন করিয়া। নৃসিংহ তাপিনী আদি উপনিষদেও ইহার রীতি বর্ণিত আছে। যিনি প্রণব উপাসনা জানেন, তিনিই যথার্থ মুনি। কারণ মননশীল পুরুষই মুনি। আর প্রণবের চিন্তনই মননরূপ। এই ওঁকার চিন্তন পরমহংসের গুপ্তধন। বহির্মুখপুরুষের ইহাতে অধিকার নাই। যিনি অত্যন্ত অন্তর্মুখ তাঁহারই এই উপাসনায় অধিকার আছে।

ব্রহ্মরূপে প্রণবের ধ্যান করিয়া জ্ঞান দ্বারা পুরুষ মুক্ত হন্। কিন্তু যে পুরুষের ইহলোক কিম্বা ব্রহ্মলোকের ভোগবিষয়ে কামনা থাকে, তীব্র বৈরাগ্য রহিত যে পুরুষ হঠ দ্বারা কামনা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধনপুত্র আদি ত্যাগ করিয়া পরমহংস গুরুর উপদেশ অনুসারে ওঁকাররূপ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহার ভোগকামনা জ্ঞান বিষয়ে প্রতিবন্ধ হয়। তাঁহার মুক্তি বিধায়ক জ্ঞান হয় না। নিরন্তর ধ্যান দ্বারা তিনি শরীর ত্যাগের অনন্তর অন্য শরীর প্রাপ্ত হন্। যদি তিনি ইহলোকের ভোগকামনা বলপূর্ব্বক দমন করিয়া ধ্যানপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বিভূতি সম্পন্ন পবিত্র সাধুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্যে পূর্ব্ব কামনার সমুদয় ভোগই প্রাপ্ত হন্। তথাপি তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ বিচারে কিম্বা ধ্যানে প্রবৃত্তি হয়। তখন জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন্।

আর যদি তিনি ব্রহ্মলোকের কামনা হঠপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়া প্রণব ধ্যানে লগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা হইলে শরীর ত্যাগের পর তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে দেবদুর্লভ স্বতন্ত্রতার আনন্দ ভোগ করেন এবং সত্যসংকল্পাদি হিরণ্যগর্ভের বিভূতি প্রাপ্ত হন্।

দেবযানমার্গ দ্বারা উপাসক ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে পুরুষ ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর হয়, তাহার মরণকালে, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণবৃত্তি মূর্ছিত হয় বটে কিন্তু যমদূত তাহার সমীপে আসে না। অগ্নি অভিমানী দেবতা তাহার লিঙ্গশরীর আপন লোকে লইয়া যায়। অগ্নিলোক হইতে দিবসাভিমানী দেবতা আপন লোকে লইয়া যায়। সেখান হইতে শুক্লপক্ষ অভিমানী দেবতার লোক, সেখান হইতে উত্তরায়ণ অভিমানী দেবতার লোক এবং সেখান হইতে সংবৎসর অভিমানী দেবতার লোক সেই উপাসক গমন

করে। তাহার পর দেবতা আসিয়া দেবলোকে লইয়া যায়। বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, ও বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতা আপন আপন লোকে লইয়া যায়। বিজলীর লোকে, হিরণ্যগর্ভের আজ্ঞানুসারে হিরণ্যগর্ভলোকবাসী হিরণ্যগর্ভরূপধারী দিব্যপুরুষ উপাসককে সঙ্গে করিয়া বরুণলোকে লইয়া যায়। পরে বরুণলোক হইতে ইন্দ্রলোকে লইয়া যায়। বরুণদেবতাও ইন্দ্রলোক পর্য্যন্ত উপাসক ও হিরণ্যগর্ভলোকবাসী পুরুষের সঙ্গে যান্। তাহার পর ইন্দ্রদেবতা তাঁহাদিগের সহিত প্রজাপতিলোকপর্য্যন্ত যান্। কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতে সমর্থ হন্ না। প্রজাপতিলোক হইতে কেবল সেই দিব্যপুরুষ উপাসকের সহচর হন্। ব্রহ্মলোকের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ।

ব্রহ্মলোকে উপাসক হিরণ্যগর্ভের সমান বিভূতি প্রাপ্ত হন্। তিনি সত্যসংকল্প হইয়া যখন যে শরীর ইচ্ছা করেন সেই শরীর ধারণ করিতে পারেন। যখন যে ভোগ ইচ্ছা করেন সেই ভোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি তিনি এক সময়ে সহস্র শরীর ধারণ করিয়া সহস্র সহস্র বিভিন্ন সামগ্রী ভোগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা তখনই পূর্ণ করিতে পারেন। অধিক কি, তিনি যে কোন সংকল্প করেন, সংকল্প মাত্রই তাহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু একমাত্র জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করিতে তিনি সমর্থ হন্ না। ইহাকেই সাযুজ্য মুক্তি বলে। যখন প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভ লোকের লয় হয়, তখন জ্ঞান প্রাপ্ত উপাসকেরও বিদেহ মুক্তি হয়। সগুণ কিম্বা নির্গুণ ব্রহ্মকে আপনা হইতে অভেদ চিন্তন করাকে অহংগ্রহ ধ্যান বলে। এই অহংগ্রহ ধ্যান ব্যতীত অন্য ধ্যান দ্বারা হিরণ্যগর্ভ লোকে উপাসক যাইতে পারে না। হিরণ্যগর্ভলোককে সত্যলোক ও ব্রহ্মলোকও বলে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকার্ষে যমসূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্সমূহ।
তেজোযত্তে রূপং কল্যানতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥
বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানিদেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তেনমউক্তিং বিধেম॥

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

৯ম বর্ষ—৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ—১৩০৮।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল; শ্রীম—বি, এ; শ্রীরামদয়াল চট্টোপাধ্যায়; শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। মানবের সংহারমূর্ত্তি	২৮১
২। একখানি পত্র	২৮৫
৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	২৮৬
৪। নিয়তি	২৯১
৫। মৃত্যুর পর	২৯৮
৬। মাসিক সাহিত্য সমালোচন	৩০৪

বাঁশবেড়িয়া।

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দে দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩০৮।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত—

লীলা (নূতন উৎকৃষ্ট বাঁধাই)	মূল্য ১।০
কর্ম্মফল	১।০
ছোট গল্প সংগ্রহ	১৲
জীবন ও মৃত্যু	৷৷০
অনর সিংহ (যন্ত্রস্থ) সিপাহি বিদ্রোহের উপন্যাস	১৷৷০

কর্ম্মফল, সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অভিমত—

Karmaphal is a faithful picture of Bengali domestic life and relates principally the story of an unfortunate youth, who ends his career on the gallows for murdering a prostitute, and of a girl who commits suicide by drowning on being discarded by her lover with whom she had eloped. Considerable power is shown in the delineation of characters and the plot is eminently suited for the study of important aspects of Bengali social and domestic life of the present day.—*Calcutta Gazette*, April 3rd, 1901.

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি অথবা ঐ গ্রন্থকার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়।

THE TWENTIETH CENTURY
A MONTHLY REVIEW.

FEATURES.

1. Representation of different systems of religion and philosophy. 2. Study of Hindu thought. 3. Discussion of general politics and social questions. 4. Critical notices of literature, polite and serious. 5. Review of current affairs.

We shall make it our special endeavour to obtain articles from writers of distinction, so that the TWENTIETH CENTURY may possess the weight of knowledge and authority.

There will be no editorial articles on theology and anything of the nature of acrimonious controversy will be rigidly excluded from the pages of this magazine. Every article on any religious question will go forth with the *imprimatur* of the writer's name.

The June number contains an article on "A Brilliant Century in India" from the pen of our distinguished countryman Mr. R. C. Dutt.

Annual Subscription .. .. Rs 4

Business address: 11, Model Hitter's Lane, Simla, Calcutta.

পূর্ণিমা; ৯ম বর্ষ; ৮ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল।

মানবের সংহারমুর্ত্তি।

মানবের সংহারমুর্ত্তির শেষ নাই। মানব যখন মশা ছারপোকা মারে খন সংহার মুর্ত্তি দেখায়। যখন মাছ ধরে সেও সংহার মুর্ত্তি, পশু হনন রে সেও সংহার মুর্ত্তি। যখন একাকী ঠেঙ্গাইয়া মারে বা খুন করে সেও ংহার মুর্ত্তি, আবার যখন দলবদ্ধ হইয়া চীনে বা ট্রান্সভালে যুদ্ধ করে তখন ংহার মুর্ত্তির অভিনয় করে। এসব জানা কথা কিন্তু এখন মানব যে এক ভিনব মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহা কখন বেদে কোরাণে ছিল না তাহা কান ইতিহাস কখন রটনা করে নাই তাহা কবি কল্পনায় স্থান পায় নাই। মুর্ত্তি সর্ব্বনাশক মুর্ত্তি সর্ব্বসংহারক মুর্ত্তি আইন আদালত, সমাজ শাসন, ভ্যতা, নীতি ও ধর্ম্ম কিছুই রাখিবেনা। এবার মানব মানবকে ধ্বংসের তল জলে চিরকালের জন্য ডুবাইতে বসিয়াছে।

বুঝিয়াছেন কি, কি বলিতেছি? এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, সুনিষ্টদিগের কথা বলিতেছি। ইহারা নররূপী রাক্ষস বা পিশাচ। ইহারা আপনাদের মন্দ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং পরের ভাল সহ্য করিতে ারে না; ইহারা আপনাদের দুঃখ ভোগ করিতে পারে না সুতরাং পরের খ ইহাদের চক্ষুশূল। ইহারা বলে ঈশ্বর নাই; থাকিলে তিনি পক্ষপাতী —এই জন্য তাঁহাকে মানিবার বা পূজা করিবার আবশ্যকতা নাই। কেন হারাজা যতীন্দ্রমোহন নবাব আবদুলগনি, গব্বয় এজ্‌রা বা মিঃ ম্যাকিনন নকুবের আর কেন আমি পথের ভিখারী মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত? কেন একজন সুবর্নথালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সহ দাদঘানির অন্ন ভোজন করিবে ার কেন আমার ভাগ্যে বোর বুখুড়ি আউস—তাও জুটে না? কেন একজনের পায়সান্ন আর কেন আমি সপ্তাহকাল ভ্রমণ করিয়াও এক মুঠা ন্য সংস্থান করিতে পারি না। ঐ দেখ খপ্ খপ্ খপ্ দেই হে—ই সামনে- ওয়ালা জুড়ি আসিতেছে। ঐ জুড়িমধ্যে সাটীন মখমল জরিভূষিত নবীন কদলীপত্র বরবপু খানি দেখিয়াছেন কি? আর আমার এই গহ্বর প্রবিষ্ট উদর দেখুন, এই পদদ্বয় দেখিতেছেন—অতিরিক্ত ভ্রমণে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে?

য়ুরোপের দুঃসহশীত কি করিয়া এই কৌপীন মাত্র সাহায্যে সহ্য করিব, বলিতে পারেন? আর এখন বলিতে পারেন কেন ভগবানকে মানিব? কেন ভগবানকে মানিয়া এই সব দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিব? তিনি কই ত কিছু করেন না—বুঝি করিতে পারেন না। মানবের সংহারমূর্ত্তি এই মূল মন্ত্র লইয়া সংহারসাধনা আরম্ভ করিয়াছে। যে তপ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অতীব কঠোর ও ভয়াবহ। প্রথমেই ইহারা সুর তুলিয়াছিল যে ভূমণ্ডলে রাজা রাখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই মানুষ, সকলেরই দুই হাত দুই পা এক মস্তিষ্ক সকলেই সমান। যখন ক্রোরপতির আর পথের ভিখারীর আকৃতিগত কোন বিসাদৃশ্য নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে সবই এক। তবে রাজ্য কেন রাজা কেন? এক কর্ম্ম কর। য়ুরোপের সমুদয় ভূমিটা ভাগ করিয়া সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও, সকলে ভোগ করুক। এনার্কিষ্ট দলের লোক এই কথা প্রকাশ করিলে তাহাদের মধ্যে লেখকগণ এই কথা জনসমাজে যুক্তিসহ প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না। তখন তাহারা মানব বংশ উৎপাটন করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিল, অর্থ সংগ্রহ করিল, সভাসমিতি করিল, বিপুল দল বাঁধিল, পুস্তক ছাপাইল, সংবাদপত্র প্রকাশ করিল, য়ুরোপ ও আমেরিকা, দলে দলে ছাইয়া ফেলিল। ক্রমে প্রত্যেক বড় সহরে এক একটা আড্ডা স্থাপন করিল। পরস্পরকে চিনিবার জন্য সঙ্কেতের সৃষ্টি হইল, ভাব বুঝিবার কল্পিত ভাষা সৃষ্টি হইল আর সর্ব্বশেষে বড় লোককে সংহার করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইল ও এক একজন অগ্নিভক্ষক অপহতা সেই কার্য্য সাধন করিবার জন্য কঠোর শপথ বন্ধনে বদ্ধ হইল। ইহাদের বিদ্যা শিখিবার জন্য স্কুলও আছে।

ইহার ফল কি হইয়াছে তাহা জানেন কি? আমরাও অনেকবার ইঙ্গিতে বলিয়াছি, ফরাশির সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মুশে কার্ণোর লয় সাধিত হইয়াছে, অষ্ট্রিয়ার রাণী আর ইহজগতে নাই। ইতালীর রাজা ঘাতুকের বিষম আঘাতে এখন শমনসদনে। বড় বড় কত লোক যে পাষণ্ড এনার্কিষ্ট ঘাতুকের হস্তে প্রাণ দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। ইহারা ভগবান মানে না, ধর্ম্ম মানে না, নীতি মানে না, মনে করে একটা বড় লোককে ধ্বংসপুরী পাঠাইতে পারিলেই আমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে, প্রতিহিংসার কতকটা চরিতার্থতা হইবে আর আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের পালন হইবে এবং

আমরা ভবিষ্যৎ এনার্কিষ্টের পথ প্রদর্শক স্বরূপ হইয়া থাকিব। এনার্কিষ্টের শ্রেষ্ঠের শেষ বলি হইতেছেন প্রেসিডেণ্ট ম্যাকিন্‌লে অর্থাৎ আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের সাধারণতন্ত্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি বফেলোনগরে একটি এক-জিবিশন দেখিতে গিয়াছিলেন; সেইখানে জলগর্জ্জ নামক একজন পাষণ্ড সেক্‌হাণ্ড করিবার ব্যপদেশে বামহস্তে তাঁহাকে পিস্তল করে; সেই গুলি তাঁহার পাকস্থলি ও মুত্রাশয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। ম্যাক্‌নলে আর ধরাধামে নাই। বিলাতী সভ্যতার অকিঞ্চিৎকরতা ঘোষণা করিয়া ম্যাকিন্‌লে মেদিনী ত্যাগ করিয়া মুদ্রিত নয়নে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কে বলিতে পারেন? এনার্কিষ্ট বলে "টোটাল এনাহিলেশন" ধূলি ধূলি—ধূলিসাৎ হইয়াছে, আর কিছু নাই কিছু নাই, কোথাও যায় নাই। মাটী একেবারেই মাটী হইয়াছে।

এই হত্যাব্যাপার কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। য়ুরোপের সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছে। মুকুটধারী মস্তকের আর শান্তি নাই, য়ুরোপের রাজন্যবর্গ ভয়ে ভীত চমকিত স্তম্ভিত হইয়াছেন। কেহ আর সহসা বাটী হইতে বাহির হন না। দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত না হইলে কেহ আর পদমাত্রও অগ্রসর হন না। এই সে দিন রুষের জার ফরাশিদেশে রণতরীর ক্রীড়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে এনার্কিষ্ট হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে টাকাটা ব্যয় হইয়াছে তাহাতে একটা প্রকাণ্ড দেশের রাজ্য চলে বা প্রকাণ্ড দেশের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হয়।

সুধীগণও আর নিশ্চিন্ত নহেন। বাগ্মী এই সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন; সংবাদপত্র লেখক লেখনী ক্ষয় করিতেছেন; মাসিকের প্রবন্ধ লেখকের আর নিদ্রা নাই; আইন কর্ত্তার আহার নিদ্রা ত্যাগ, কেবল আইন ভাবিতেছেন। কতকত দিস্তা কাগজ লেখা হইয়া গেল, টন টন কাগজ ছাপা হইয়া গেল কিন্তু এখনও ইহার প্রতিবিধান কিছু হয় নাই। কবে যে হইবে তাহারও প্রত্যাশা নাই। কেহ বলিতেছেন ধর্ম্ম বদলাও, কেহ বলিতেছেন নীতি বদলাও, কেহ বলিতেছেন এনার্কিষ্টদের চাকরী দাও, কেহ বলিতেছেন এনার্কিষ্ট নিপাত কর, কেহ বলিতেছেন সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সর্ব্বজাতীর একটা পুলিষ সৃষ্টি কর, তাহারা দিনরাত্রি এনার্কিষ্ট-মৃগয়া-ব্যাপারে মগ্ন থাকুক। য়ুরোপে কেন এনার্কিষ্ট সৃষ্টি হইল,

সুধীগণ তাহারও আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই এবং কি করিলে এনার্কিষ্ট ধ্বংস হয় তাহারও উপায় অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। য়ুরোপের বড় ব্যাপারে যোগদান করিতে আমাদের সাধ্য নাই। আমরা হিন্দু তাহাতে দুর্বল ও বিজিত। আমাদের কথাই বা শোনে কে? তবে আত্মপ্রসাদের খাতিরেও হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রকারান্তরে প্রকটিত হইতেছে দেখিয়া আপনা আপনির মধ্যে দুই কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

একথা সকলেই জানেন, হিন্দু ভাবেন পরমার্থ আর য়ুরোপ ভাবেন কেবল অর্থ। এইখান হইতেই যত বিপদের সূচনা হইয়াছে। তারপর জাতিভেদ, য়ুরোপে জাতিভেদ নাই, তাহাতে আরও অনর্থপাত হইয়াছে। হিন্দুর ছেলে দুঃখে পড়িলে পরের সুখ দেখিয়া চোখ টাটায় না। সে জানে কর্ম্মফল, সে মানে জন্মান্তর। সে বলে দিয়া আসি নাই ত কোথা পাইব? এই জন্মের এই ফল আবার পাপ কেন করিব? হিংসা যে মহাপাপ, আবার আবার কেন পরজন্মে ভুগিয়া মরিব? তাই আমাদের দেশে মুষ্টিভিক্ষা দিবার রীতি আছে—য়ুরোপে নাই; তাই অথিতি আমাদের নারায়ণ আর য়ুরোপে ব্যাড ক্যারেক্টর বা ভোগাবস্তু। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে কর্ম্মের শৃঙ্খল ছিল, কামারের ছেলে কামারেরই কাজ করিবে। ব্রাহ্মণ জুতা সেলাই করিবে না আর মুচিতে চণ্ডী পড়িবে না। সুতরাং কাহারও অন্ন কেহ মারিত না, কাহারও অন্ন কাহারও মারিবার উপায় ছিল না। তুমি ছুতারের কাজই জান, কাপড় বুনিবে কি প্রকারে? কিন্তু য়ুরোপে জাতিভেদ নাই, কর্ম্ম শৃঙ্খলা নাই, সেখানে জোর যার মুলুক তার, বুদ্ধি যার বল তার, সরেষের শেষ (survival of the fittest).

বলিয়াছি, য়ুরোপকে শিখাইবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে। তবে কেন? হিন্দুর ছেলেকে শিখাইবার জন্য দুই কথা বলিতে বসিয়াছি। যাহা হিন্দুর আছে, তাহার সব ভাল তাহার মন্দ নাই, তাহা ঋষির অনুমোদিত, ঋষির স্থাপিত। এইটি হিন্দুর ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি। তুমি কারণ না জানিতে পার, তোমার বুদ্ধির দোষে বিপরীত বুঝিতে পার, কিন্তু নিশ্চয় জানিও হিন্দুর কিছুই মন্দ নাই ও হইতেও পারে না। কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যাহার জন্ম তাহার মনুষ্যজন্মের শেষ হইয়াছে।

এতকাল পরে জাতিভেদ ভাল এটা ত বুঝিয়াছ? বালবিবাহ ভাল এটাও জানিয়াছ? পরে আরও বুঝিবে। তবে এখন নিশ্চিন্ত মনে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।

একখানি পত্র।

ভাই!

আপনার দুইখানি পত্র পাইয়াছি। করুণাময়ীর কৃপাদৃষ্টি আপনার উপর আছে এবং তাঁহারই শক্তি আশ্রয়ে কামরূপ পরম শত্রুকে জয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন, যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চয়ই হইবে। ভগবতীর চরণ ধ্যানে মন সততই নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সতত নিম্নদৃষ্টি অভ্যাস করিতে হইবে; অর্থাৎ চক্ষের দৃষ্টি সদাই যেন মাটির দিকে থাকে। তারপর মনকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া তাহার মধ্যে কারণবারিরূপ আকাশে ভাসমান পুরুষকে ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় উপর দেবীপাদপদ্ম ধরিয়া থাকুন এবং মধুরস্বরে তালে তালে মন্ত্রজপ করিতে থাকুন; শত্রু, ভয়ে পরাজয় স্বীকার করিবে। হৃদয়গুহাশায়ী এই পুরুষই জীব; ভগবতী পাদস্পর্শে ইনিই শিব হন। তখন সাধক বুঝিতে পারেন, তিনিই শিব স্বরূপ।

শিব শব্দের অর্থ পাশমুক্তজীব অর্থাৎ কামাদি ক্লেশপাশ হইতে যিনি মুক্ত তিনিই শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি এখন ক্লেশপাশ বদ্ধ জীব কিন্তু মা ভগবতীর চরণ লাভ করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলেই শিবত্ব পাইব।

আমরা যে শিব পূজা করি, সেই শিব কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; উপাস্য শিব শব্দের অর্থ ঈশ্বর। আমি যেমন একজন পুরুষ তিনিও তেমনি একজন পুরুষ, তবে তাঁহার সঙ্গে অন্য যাবতীয় পুরুষের এক পার্থক্য আছে। তিনি কখনও অবিদ্যামূলক রাগ দ্বেষাদি ক্লেশপাশে বদ্ধ ছিলেন না এবং হইবেন না। এই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরই উপাস্য শিব শব্দের অর্থ। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি সদানন্দ। ইহার একটি ইচ্ছা আছে যে যাবতীয় জীবই যেন দুঃখপাশ মুক্ত হইয়া তাঁহার ন্যায় সদানন্দ ভোগ করে। তাঁহার এই ইচ্ছাশক্তিই

ইহাদেবী ভগবতী। ভগবানের এই ইচ্ছাশক্তির শরণ লইয়া পড়িয়া থাকুন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলুন, কামরূপ শত্রু দূরে পলাইয়া যাইবে। পথটি হচ্ছে—

জপ জজ্ঞ।

ভগবানের এই ইচ্ছাশক্তিই জীবের শরীরে কুণ্ডলিনীশক্তিরূপে প্রকাশিত হন। দেবী কুণ্ডলিনী জাগরিত হইলেই ইনি পুরুষের বীর্য্য উর্দ্ধদেশে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সপ্তম ভূমিতে উঠাইয়া লন, তখন মাথার চারি দিকে একটা জ্যোতি দর্শন হয় এবং হৃদয়ের মধ্যে বিশোকা জ্যোতির প্রকাশ হয়। ইহাই পরম আনন্দ অবস্থা। মাথার জ্যোতি ও হৃদয়ের জ্যোতি এই উভয়ের মিলনরূপ মৈথুনানন্দ যিনি ভোগ করিয়াছেন, কামিনী-সঙ্গকামনা তাঁহাকে একবারে ছাড়িয়া যায়।

প্রীতিপ্রার্থী—
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এইবার পাতা হইতে লাগিল। দক্ষিণের বারাণ্ডায়। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিলেন, 'তুমি একবার যাও, দেখ ওরা সব কি কর্‌চে; আর না হয় একটু পরিবেশন কর্‌লে! মহিমাচরণ হুঁ হুঁ করিয়া একটু দালানের দিকে গেলেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে আবার হলঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও দক্ষিণের পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে আচমন করিয়া পান খাইতে খাইতে আবার ঠাকুরের কাছে আসিয়া জুটিলেন। সকলেই আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা দুইটার পর প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন ব্রাহ্মভক্ত। আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন, ঠাকুরও মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

প্রতাপের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। মহাশয়, আমি পাহাড়ে গিয়েছিলুম (অর্থাৎ দারজিলিংয়ে)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তোমার শরীরত তত ভাল হয় নি, তোমার কি অসুখ হয়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞে তাঁর (কেশবের) যে অসুখ ছিল, আমারও সেই অসুখ হয়েছে।

কেশবের কথা হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিতে লাগিলেন, কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই দেখা গিয়াছিল। তাকে আহ্লাদ আমোদ কত্তে প্রায় দেখা যেত না। হিন্দুকলেজে পড়তেন, সেই সময়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়। আর ঐ সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়। কেশবের দুইই ছিল। যোগও ছিল, ভক্তিও ছিল। তার ভক্তির সময়ে সময়ে এত উচ্ছ্বাস হতো যে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হতো। গৃহস্থদের ভিতর ধর্ম্ম আনা তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

[লোকমান্য ও অহঙ্কার]

একটী মহারাষ্ট্র দেশীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল।

প্রতাপ। এ দেশের মেয়েরাও কেউ কেউ বিলেতে গেছে। একটী মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে খুব পণ্ডিত বিলেতে গিয়াছিল। তিনি কিন্তু খৃষ্টান হয়েচেন। মহাশয় কি তার নাম শুনেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না; তবে তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে বোধ হচ্চে যে তার লোকসামান্য হবার ইচ্ছে।

(ভক্তদের প্রতি) "এরূপ অহঙ্কার ভাল নয়। 'আমি কচ্চি' এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর তুমি কর' এইটী জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা।

"আমি আমি কর্‌লে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পার্‌বে। বাছুর 'হাম্ মা' (আমি) 'হাম্ মা' (আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয় ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্চে, রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয় ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংস গুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে। সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে। লোকে তার

TORN PAGES.

উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় নি। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কি না নাড়িভুঁড়ি গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁৎ তোয়ের হয়, তখন ধোন্‌বার সময় 'তুঁহুঁ' 'তুঁহুঁ' বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা' বলে না। তুঁহু তুঁহু বলে তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। আর কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

"জীবও যখন বলে 'হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, তখনই জীবের সংসারযন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয় না।

একজন ভক্ত। জীবের অহঙ্কার কেমন করে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন না কর্‌লে অহঙ্কার যায় না। যদি কার অহঙ্কার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কেমন করে জানা যায় যে ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যে ব্যক্তি ইশ্বর দর্শন করেছে, তার চারটী লক্ষণ হয়—বালকবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ ও উন্মাদবৎ।

"যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তার বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত, কোন গুণের আঁট নাই। আবার শুচি অশুচি তার কাছে দুই সমান—তাই পিশাচবৎ। আবার পাগলের মত কভু হাসে কভু কাঁদে; এই বাবুর মত সাজেগোজে আবার ক্ষণিক পরে ন্যাংটো, বগলের নীচে কাপড় রেখে বেড়াচ্চে—তাই উন্মাদবৎ। আবার কখন বা জড়ের ন্যায় চুপ করে বসে আছে।

একজন ভক্ত। ঈশ্বর দর্শনের পর কি অহঙ্কার একেবারে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কখন কখন তিনি অহঙ্কার একেবারে পুছে ফেলেন—যেমন সমাধি অবস্থায়। আবার প্রায় অহঙ্কার একটু রেখে দেন। কিন্তু সে অহঙ্কারে দোষ নাই। যেমন বালকের অহঙ্কার। পাঁচ বছরের বালক 'আমি আমি' করে কিন্তু কারো অনিষ্ট কর্‌তে জানে না।

"আর্‌সিতে মুখ দেখা যায় কিন্তু সে মুখ কাকেও গালাগাল দিতে জানে না। কারো অনিষ্ট কর্‌তে জানে না।

"পরশমনি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল্ সোনার তরোয়াল্ হয়ে যায়। তরোয়ারের আকার থাকে কিন্তু কারুর অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ারে মারা কাটা চলে না।

[বিলাত (Europe) ও কাঞ্চনের পূজা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) তুমি বিলাতে গিয়েছিলে, কি দেখলে সব বল?

প্রতাপ। বিলাতের লোকেরা আপনি যাকে কাঞ্চন বলেন তারি পূজা করে। তবে অবশ্য কেউ কেউ ভাল লোক—অনাসক্ত লোক আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আগাগোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই দেখে এলুম।

[বিলাত ও কর্ম্মযোগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রতাপের প্রতি) বিষয় কর্ম্মে আসক্তি শুধু যে বিলাতে আছে এমন নয়। সব যায়গায় আছে। তবে কি জান, কর্ম্মকাণ্ড হচ্চে আদ্য কাণ্ড। সত্ত্বগুণ (ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব) না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পড়ে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে।

"তবে কর্ম্ম ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই বলেচে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা কি, না কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা কর্‌বে না। যেমন পূজা জপ তপ কর্‌চ্চো, কিন্তু স্বর্গের সুখের জন্য নয়; দান কর্‌চো কিন্তু লোকমান্য হবার জন্য নয়; কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

"এরূপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে কর্‌চি অনাসক্ত হয়ে কাজ কর্‌চি, কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব কর্‌লুম, কি অনেক গরিব কাঙালদের সেবা কর্‌লুম, মনে

করলুম যে অনাসক্ত হয়ে করেচি কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছে হয়েচে জান্‌তে দেয় না।

"তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁর।

একজন ভক্ত। যাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন নাই, তাঁদের উপায় কি? তাঁরা কি বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তি। ঈশ্বরের নামগুণ করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা—'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।'

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। তাই প্রার্থনা করতে হয়, 'হে ঈশ্বর আমার কর্ম্ম কমিয়ে দাও। আর যেটুকু কর্ম্ম রেখেছো, সেটুকু যেন তোমার কৃপায় অনাশক্ত হয়ে করতে পারি। আর যেন বেশী কর্ম্ম জড়াতে না ইচ্ছা হয়।'

"কর্ম্ম ছাড়বার যো নাই। আমি চিন্তা করছি, আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম্ম।

"ভক্তি লাভ কর্‌লে বিষয় কর্ম্ম আপনা আপনি কমে যায়। বিষয় কর্ম্ম আর ভাল লাগে না। ওলা মিছরীর পানা ফেলে চিটেগুড়ের পানা কে খেতে চায়!

একজন ভক্ত। বিলেতের লোকেরা কেবল 'কর্ম্ম কর' 'কর্ম্ম কর' করে। কর্ম্ম তবে জীবনের উদ্দেশ্য নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম্ম তো আমি কাকে কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম একটী উপায়, ——উদ্দেশ্য নয়।

নিয়তি।

শীতকাল! শীতকালে বর্ষা, শীতকালে ঝড়-বাদল! মাগো, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ছত্রভঙ্গ যা' দেখালি তা' অনেকদিন মনে থাকিবে। বৈশাখ মাসে একদিন এক মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে, এই বেলা চাউল কিনিয়া রাখিও। কিছু চাউল কিনিয়াছিলাম কিন্তু যখন কাষ্ঠ-বিড়ালগণ দলবদ্ধ হইয়া জানালা দিয়া আসিয়া সমস্ত নূতন বোরা কাটিয়া রুসেন্যের মত প্রতিদিন আমার কমিসেরিয়াট লুট করে দেখিতাম, তখন মনে হইত, কোথা দুর্ভিক্ষ আর কোথা এই অপচয়! সত্যই কি দুর্ভিক্ষ হইবে? আপাতত মন খানেক চাউল ত শ্রীরামের বাহনের উদরে। দণ্ড দিবার উপায় নাই—শ্রীরামের পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ ঐ যে পিঠে স্পষ্ট। কার সাধ্য অঙ্গ স্পর্শ করে—ও যে ভগবানের খেলাৎ, ত্রেতার G-C-S-I. মেজ নাড়িবার ভঙ্গী দেখেছ? যেন অহঙ্কারের পূর্ণ অভিব্যক্তি, আমিই ভগবানের—এই রোগ শোক জরা মরণ সঙ্কুল সংসারে যখন কাকের মরণের ন্যায় আমার মরণ কেহ দেখিতে পায় না—অথবা, এই মনুষ্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গো, অশ্ব, তিমি, মকর, কুম্ভীর, ময়ূর, ঈগল, নকুল, ইন্দুর প্রভৃতি জীবসঙ্কুল ধরাধামে—আমিই ভগবানের একমাত্র এডিকং। মেজ যেন বলিতেছে, "ইঃ আমায় ধরিবে? তোমার খুট শব্দ না হইতে হইতেই আমি "আম্রা" প্রাচীর একেবারে নারিকেল বৃক্ষরূপ "কব্‌জী" ধামে নিরাপদ! আমায় ধরিবে? বরং বোথাকে ধরা সহজ, তবু আমাকে নহে। নারিকেল গাছে উঠিবে? বেনসনের কলমের কথা মনে করিও।" এ হেন কাষ্ঠবিড়াল দেখিলে আমার মনে হইত যে সংস্কৃত নৈয়ায়িকগণের কি কেবল আমার জন্যই কি লাজাবন্ধনের ন্যায়! অহো কি দুর্দ্দৈব, ইহারই নাম অদৃষ্ট। সে যাহা হোক, এই অগ্রহায়ণের বাদলে, এই রাসপূর্ণিমার ঝড়ে, এই পৌর্ণমাসীর কাদম্বিনীর মসীময়ী কালিমা-রেখা, এই দিগন্তব্যাপী ধান্যক্ষেত্রে জানু-মগ্ন-জলরাশি দর্শনে, এই "পাকাধানে মই" দেখিয়া আজ মনে হইল, যে হে মহাত্মন্ আমায় ক্ষমা করিবেন, অজ্ঞ অবিশ্বাসীকে ঘৃণা করিবেন না, পাপী বলিয়া দূর করিয়া দিবেন না। আমার মত পতিত না থাকিলে আপনার পতিত-পাবন নামের সার্থকতা হইবে না। হায় ভ্রান্ত জীব! কথা সত্য, "জেরাসৎ পুঁট্‌কী মারে, পাহাড় কি সাৎ তাল লাগে।"

"মশাই আছেন কি?" শব্দে চমক হইল—চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল। উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। সজল ঝট্‌কার সহিত ঘরে প্রবেশ করিলেন অন্ধকার, আলো নিবিয়া গেল। গলার স্বরেও চিনিতে পারি নাই। চাকর আলো জ্বালিলে দেখিলাম রাম বাবু!

আমি। অনেক দিন বাঁচিবেন, এই আপনার বাহনের ও আপনার নাম হইতেছিল।

রাম বাবু। বাহন কে?

আমি। তপস্বী কার্ত্তমার্জ্জার। আপনি অনেক দিন বাঁচুন, দুঃখ নাই কিন্তু মহাশয়ের বাহনের শ্রীবৃদ্ধি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইলে আমার ত সর্ব্বনাশ।

রাম। ব্যাপারটা কি?

আমি। আজ্ঞা এমন কিছুই নয়, আট থানি সরু নাগরা বস্তা বাহন মহাশয়েরা ইচ্ছামত রসদ বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ-ভয়ে চাউল কিনিয়াছিলাম।

রাম। দুর্ভিক্ষ ভয়ে! সকলেই ত তাই বলিতেছে "ভরাডুবি পাক ধানে মই"। ধান ত গেলই তা ছাড়া আলু, কলাই ইবিখন্দ পেঁয়াজ কিছু সব গেল। বাঙ্গালির অদৃষ্ট! ভয়ানক ঝড় বাদল এই অঘ্রাণের শীতে তা যাক্, ব্যাপারটা কি আপনি কি অন্তর্যামী? এই পাকাধানে মই, ইহা কি পূর্ব্বে আপনি জানিতেন? অনেক চাল্ কিনেছেন বল্‌ছেন?

আমি। আমার বাবা জান্‌তেন। তাঁরই কথামত কতকবিঘা কতক অবিঘাসে শতাবধি টাকার চাউল কিনে ছিলাম। (ভয়ানক কাশি) এখন এই বাদলঘটিত সর্দ্দিটা পিতৃদত্ত কানুটি। যাক্, রাম বাবু আপনি অদৃষ্ট মানেন? আমি কাগজে দেখ্‌ছিলাম, একজন অদৃষ্টবাদ খণ্ডন করেছেন।

রাম। (ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া) আপনার 'বাবা'কে শতকোটি প্রণাম। অদৃষ্টবাদ খণ্ডন করেছেন—মাথা মুণ্ড করেছেন, একটা শুনিবেন? কিন্তু আপনার পিতৃদেবের ত অনেকদিন কাল হয়েছে।

আমি। নিমদত্ত বলেছিল—

হাবা ছেলে কাঁদিস নাকো আর।
বাবা গেলে বাবা হবে বাবার ভাবনা কি তোমার॥

এ কথা শুধু আমার কেন সকল ভারতবাসীর প্রতিই প্রযুজ্য। আর বলেছে—

বেটা বল্ কেটা তোর মাসী।
মাসী মাসী কর বেটা গলায় দিলে ফাঁসী।

রামপ্রসাদ বলেছেন মাসীকে ত্যাগ কর আর বাবাকে ধর। আমার, বাবা, দুই তিনটি।

রাম। আজকাল লোক সন্ন্যাসীগুরু করিবার জন্য পাগল। কুলগুরু ত্যাগ করা উচিৎ নহে, বিশেষ যখন ভট্টপল্লীর গুরুকুল আপনাদের মধ্যে দোষসংশোধন ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণাদির জন্য দলবদ্ধ হয়েছেন। সন্ন্যাসী-গুরু যে মন্দ তা বল্‌চি না, নিজ গুরুকুলে মন্ত্র লইয়া তারপর সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র গ্রহণ বা যোগ শিক্ষা দোষাবহ নহে। পরমহংস রামকৃষ্ণ বলেছেন, অবধূতের অনেক গুরু ছিল। ওটা ত সঙ্কেত মাত্র। পরে দেশে কি হবে জান্‌তে পেরেই ইশারা করে গেছেন।

আমি। রাম বাবু আপনার বাহন সম্বন্ধেও না তিনি কিছু বলেছেন? তা এখন একটা কথা রাখ্‌বেন। বাড়ীতে তপ্ত চালভাজা মজুত, নারিকেল ছোলাও হচ্চে। আচমনটা করে বসুন, আমি তাওয়া অর্ডর করে দিই? মহাশয় যদি আরও ইতস্তত করেন বা on spiritual guides of Bengal বলিয়া লেক্‌চার ধরেন তা হলে বৈঠকখানা বিডিন্ গার্ডেন হয়ে উঠ্‌বে। শুনেছি বাদলায় লোক আত্মহত্যা করে—আপনার গল্পটি আত্মহত্যা করিতে পারে।

রাম। বাদলায় আত্মহত্যা exploded theory. তোমার বিদ্যার গভীরতার জন্য মানরজ্জু আবশ্যক করে না। টেস্‌লা ইংলণ্ডকে কি বলেছে শুনেচ, "যে হে ইংলণ্ড তুমি কি বর্ব্বর! জেম্‌স্ ওয়াট্ বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিল তাই শতবৎসর ধরে ধরাধামে চক্রবর্ত্তীত্ব করিলে। যথেষ্ট ফল ভোগ করেছ, আর না, এখন সরে দাঁড়াও তাড়িতবিদ্যা উদ্ভাবনী বিদুষী আমেরিকা তোমার স্থান অধিকার করুক। ইংলণ্ড তোমার অসভ্যতা দেখিলে হাসি পায়। আগুনের উপর জল চাপাইয়া তার উপর দ্রব্য দিয়া সিদ্ধ করিয়া তোমার আহার প্রস্তুত হয়। বনের জন্তু ধরে এনে তাকে ছোলা খাওয়াইয়া গাড়ি টানাও। তার টাঙ্গাইয়া তার উপর দিয়া খবর দাও, ছোট টিক টিক বড় টিক টিক ধরে অক্ষর পড়। কয়লা পোড়াইয়া জল তপ্ত করে কল চালাও। মানুষ ধরে তাকে চাকররূপে খাটাও। ছি ছি,

কি লজ্জার কথা, সভ্য জগতে এত বর্ব্বরতা! একটু অপেক্ষা কর, আমি বিনা তারে গ্রহ মঙ্গল হইতে খবর আনিয়া দিতেছি। এই টেস্‌লার কথা, তোমারও কি বর্ব্বরতা। মানুষ বাদলায় আত্মহত্যা করে না। বাদলায় কি করে যদি জানিতে চাও ত রবি ঠাকুরের "চোখের বালি" পড়। যেদিন রবি চকাশে, মলয় পবন শ্বাসে, বিহগে সমধুর ভাষে, ফুল্ল কুসুম হাসে, সেই দিন আত্মঘাতী আপন প্রাণ নাশে।

আমি। গোবিন্দ অধিকারী মহাশয়! আমায় মাফ করুন। আমি বিংশ শতাব্দীর লোক বই ত নই। আপনি অতি প্রত্যুষে আরম্ভ করেছেন, ত্রেতায় পিতামহ নল নীলের ইঞ্জিনিয়ারিং এখনও রত্নাকর ও মহোদধি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। স্বীকার করিলাম আপনি উনপঞ্চাশ শতাব্দীর সংবাদ প্রদানে সমর্থ। কিন্তু এত বড় টেস্‌লাবিদ্ পণ্ডিত হয়ে অদৃষ্ট-টা মানেন তাই একটু আন্‌মোনা আস্‌চে।

রাম। তবে নিতান্তই গল্পটা বল্‌তে হল।

আমি। বলুন। পরাশর সংহিতা টংহিতা আওড়ে যে অদৃষ্টের অপর-রূপ মানে কর্‌বেন তাতে আমি নেই।

রাম। বরং বৃণু—তথাস্তু। আমি নিরাকার অদৃষ্ট হইতে শতযোজন তফাৎ।

আমি। এখন চাল্ ভাজা তাওয়া সাকার, গল্পটা নিরাকার থাকে কেন, সব-চলুক।

রাম। (ঝিমকিনি মারিয়া) তামাসা নয়, গল্পটা যথার্থই সাকার। আমার পিতার এক সময়ে দ্বৈকালীন জ্বর হয়, কিছুতেই আরাম হয় না। শেষে একজন সন্ন্যাসী বলেদেন যে ভাল ব্রাহ্মণ সাহায্যে শাস্ত্রমত সূর্য্যার্ঘ দিলে আরাম হইবে, নতুবা নহে। বহুকষ্টে ব্রাহ্মণ মিলিল। বহুকষ্টে সমস্ত আয়োজন হইল। ব্রাহ্মণ প্রস্তুত হইয়া আছেন। যেমন পূর্ব্বগগণে মার্ত্তণ্ড দেবের প্রথম রশ্মি দেখা গেল অমনি অর্ঘ প্রদান আরম্ভ হইল। বেলা তিনটার সময় শেষ জ্বর আসিত সেই দিন হইতেই বন্ধ। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে অর্ঘ শেষ। পীড়াও শেষ। পিতা অদৃষ্টের কথা উঠিলে এই কথা বলিতেন ও আরও একটি কথা বলিতেন।

আমি। সেটি কি?

একদিন সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে হুগলির বাল্মীকি ঘাটে (এক্ষণে যাহা শ্মশানকালীতলা ঘাট) বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। শত শত নরনারী কেহ কেহ নদীসৈকতে কেহ বা নিম্নগা-তটে কেহ বা বাঁধাঘাটে, কেহ বা শ্মশানে বসিয়া আছে। গ্রহণস্পর্শ বুঝিলেই একবার স্নান করিবে, তারপর মুক্তিকাল পর্য্যন্ত বসিয়া জপ করিবে, কেহ বা দানধ্যান করিবে, কেহ বা গুরু সহিত উপস্থিত পুরশ্চারণ করিবে কেহ বা লক্ষ জপ করিবার জন্য মালা হাতে বসিয়া আছে, শত শত ভিক্ষুকেরও আগমন হইয়াছে, বৈষ্ণবের সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ও খোল করতাল সমেত উপস্থিত। কালীমাথা কাচ লইয়া কেহ বা সূর্য্য দর্শন করিতেছেন। একটা গভীর গম্ভীর উৎসাহ স্রোত চলিয়াছে।

এমন সময় লোকে সসম্ভ্রমে দেখিল একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। তিনি যে কোথা হইতে আসিলেন তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। তিনি যখন ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে শনৈ শনৈ শ্মশানের একটি চিতা উদ্দেশে চলিয়াছেন, তখনই লোকের দৃষ্টি পড়িল। দূর হইতে সন্ন্যাসী শৈব কি শাক্ত ঠিক বলা যায় না কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তিনি শক্তিসাধনাই জীবনের ব্রত করিয়াছেন।

চিতার নিকটে গিয়া কমণ্ডলু রক্ষা করিলেন ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার জটাভার, তাঁহার বিভূতিভূষণ, তাঁহার কৌপীন, অনেকেরই লক্ষ্যস্থল হইয়াছে। এমন সময় সহসা একটা দাঁড়কাক ঈশান কোণ হইতে আসিয়া সন্ন্যাসীর মাথার উপর দিয়া বিকট চীৎকার করিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকগণের "রাম রাম, গঙ্গার জল খা" প্রভৃতি বহু কণ্ঠশব্দ ছাপাইয়া তখন সন্ন্যাসীর গম্ভীর স্বর শ্রুত হওয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন "আদ্‌মি হুঁসিয়ার জেনানা হুঁসিয়ার হো। কাক বোল্‌তা এক আদ্‌মিকো কুম্ভীর লেগা। লেকেন ফিন্ কাক বোলে তো হাম বল্‌নে শকেগা কোন্ আদ্‌মি কো লেগা।" কথা শুনিয়া লোক অবাক্। সন্ন্যাসীর বাক্য শুনিয়া লোক একেবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা শশব্যস্ত হইয়া পুত্র কন্যাকে সাবধান করিতে লাগিল। নদীসৈকত হইতে দলে দলে লোক উঠিয়া দূরে নিরাপদ ভূমিতে গিয়া উপবেশন করিতে লাগিল। একটি প্রাণীও জলে নাই, এমন কি

নৌকার দাঁড়ী মাঝি পর্য্যন্ত সতর্ক। এমন সময় সহসা একব্যক্তি কালীমাখান কাচ চক্ষু হইতে নামাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "গ্রহণ লাগিয়াছে"। তৎক্ষণাৎ নগর মধ্যে শত শঙ্খনাদ সেই কথাই প্রচার করিল। ঘড়ি ঘণ্টা ও কাঁসর নাদে, শঙ্খ নাদে কোলাহলে লোক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। হিন্দুর প্রাণ তখন কুম্ভীর ভুলিল—সন্ন্যাসীর কথা ভুলিল। দলে দলে লোক স্নান করিতে গঙ্গায় নামিল। স্নান করিল, তর্পণ করিল, তীরে উঠিয়া জপ করিতে বসিল। লক্ষ জপ আরম্ভ হইল, দান ধ্যান আরম্ভ হইল। পুরশ্চারণ আরম্ভ হইল। খোল করতালে তাল বাজিল, শতকণ্ঠের হরিনাম সেইতালে সুরলয় মিশাইল। সকলে কুম্ভীর ভুলিল, সন্ন্যাসী ভুলিল। যে ভুলিল না সে কোন মতে হাঁটুজলে ডুব দিয়া পলাইয়া আসিল—ধ্যানে কুম্ভীর দেখিতে লাগিল, তার জপ হইল না।

এমন সময় সহসা একটা হাহাকার পড়িয়া গেল।

দ্বারে শব্দ হইল—বাহির হইতে কণ্ঠস্বর বলিল "খুব জমিয়াৎ—বেহুঁস, সাড়া নেই, এত ডাক্‌চি"। আমি, কেও, যদু বাবু, বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। যদু বাবু আসিয়াই বলিলেন "কালিয়ে গেছি নল্‌টা দাও দেখি, কি বাদল, শীতকালে কি পাপ, ভীনসের কাছে আর একটা প্লানেট; আর একটা ষ্টারই হোগ আর প্লানেটই হোগ, ওয়েষ্ট আকাশে little to the South—Venesকে apex করে ঠিক যেন isossceles triangle—Baseটা ছোট হচ্চে রোজ রোজ কম্‌চে। আধ হাত টাক্ বাকি আছে। কি একটা transit or conjunction হচ্চে, আমাদের পৃথিবীর atmosphereএ বোধ হয় আঘাত লেগেছে, তাতে আবার পূর্ণিমা, সে দিন চাঁদের সভা না শোভা, দূর সভা নিকট জল, হয়েছিল। তাই বাদলা। ফাদার লাফোঁর উচিৎ এগুণো বলে দেওয়া কি মিটিওরোজলি-ওয়ালাদেরও বলে দেওয়া উচিৎ।

আমি। রাখ তোমার সায়ান্স্। যেটি গোণে সেইটি ভুল। বলেছিল না বর্ষা খুব আর্লি হবে আর কাটিবাড় জলে ভেসে যাবে। সেখানে যে জলকষ্ট—দুর্ভিক্ষ। জল, হবার জন্য রাজা দেশশুদ্ধ সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াচ্চে। বাবা চুপ কর, গল্পটা মাটি করো না। ঠাণ্ডা হয়ে তামাক খাও, চুপ কর।

যদু। কিসের গল্প।

রাম। সেই গ্রহণ আর সন্ন্যাসী। —অপূর্ব্ব চন্দ্রদত্ত;

যদু। ওঃ আমি তোমার মুখে আগেই শুনেছি, নুরূপ; কুকীজাতি

রাম। একটা হাহাকার উঠ্‌ল। ঐ কুমীর, ঐ ও বেশ।

নিলে নিলে, যা যা, গেল গেল, হায় কি হল, সর্ব্বনাশ।

ঘাটের জল ঘূর্ণায়মান, ক্রমে একটি বীচীচক্র স্পষ্ট একটি। আর একটি। ক্রমে জল স্থির হইয়া আসিতেছে গঙ্গার দিকে। তখন একজন বলিয়া উঠিল—যা হোগ্ সন্ন্যাসী

তখন সকলে শ্মশানে দৃষ্টিপাত করিল। পুরশ্চারণ ভু অষ্ট্রেলিয়া একবার শ্মশানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। কিন্তু কই সন্ন্যাসী ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সেই চিম্‌টা, সেই দণ্ড। সন্ন্যাসী কোথা গেল? কমণ্ডলু আছেন। শ্মশানের লোকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। তখন ঐ কুমীর, ঐ কুমীর আবার শব্দ উঠিল। গঙ্গাবক্ষে ঠিক গড় স্থলে কুমীর আবার ভাসিয়াছে, সম্পূর্ণ দশ বার হাত ভাসিয়াছে। নিয়তি না দেখাইয়া কুমীর ভক্ষণ করে না, তাই মুখে করিয়া শিকার জড়ভুকরণে তুলিয়া সূর্য্যকে দেখাইতেছে। ওটা কি শিকার? যোড়হাত দুটি ন নাই। চক্ষু মুদিত, জটাভার তেম্‌নি আছে, বিভূতি এখনও সমস্ত ধুইয়া য বাহির শিকারটি সেই সন্ন্যাসী, যিনি বলিয়াছিলেন "লেকেন কাক ফিন বোলেগা কোন্ আদ্‌মিকো কুম্ভীর লেগা।" দাঁড়কাক আর দ্বিতীয়বার ডাকে নাই। তাই তাঁর বলা হয় নাই, কোন্ আদ্‌মিকো কুম্ভীর লে চয়

কমণ্ডলুর কোন সংবাদ কেহ দিতে পারিল না। তিন দিন পরে এ র জন স্নান করিতে গিয়া কি পায়ে ঠেকিল বলিয়া তুলিয়া দেখে—একটা কমণ্ডলু।

আমি। হাঁ এই ঠিক অদৃষ্ট।

রাম। কেমন?

যদু। Pure accident.

সেই সময় শোনা গেল, রাস্তায় একজন গাহিয়া যাইতেছে—

সদানন্দময়ি কালি মহাকালের মন মোহিনি।
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মাগো মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥

শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা।

TORN PAGES.

নৌকার দাঁড়ী মাঝি প[illegible]হিত্য সমালোচন।
কাচ চক্ষু হইতে না[illegible] আশ্বিন। 'সাহিত্য-সংহিতা' আষাঢ়। 'সাহিত্য
তৎক্ষণাৎ নগর মধ্যে [illegible]র্থ সংখ্যা ও অতিরিক্ত সংখ্যা। 'নব-প্রভা'
কাঁসর নাদে, শঙ্খ না[illegible]ভাদ্র পর্য্যন্ত। 'বঙ্গদর্শন' আশ্বিন পর্য্যন্ত। 'প্রদীপ'
তখন কুম্ভীর ভুলি[illegible] ভাদ্র পঃ। 'সাবিত্রী' শ্রাবণ পঃ। 'উদ্বোধন' ভাদ্র
গঙ্গায় নামিল। [illegible] শ্রাবণ পঃ। 'চিকিৎসক ও সমালোচক' শ্রাবণ পঃ।
বসিল। লক্ষ [illegible]। 'বামাবোধিনী' ভাদ্র পঃ। 'ভারতী' কার্ত্তিক পঃ।
হইল। খোল[illegible]হাজনবন্ধু' শ্রাবণ। 'ভাস্কর' শ্রাবণ। 'স্বাস্থ্য' শ্রাবণ।
লয় মিশাইল[illegible]
কোন মতে [illegible]শালা খুলিব।
লাগিল, ত[illegible]কুলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতি দেখিয়া পূর্ণ
এম[illegible]রলাম। দ্বিতীয় ছবি "গাছের তলে" বোন্ ভাইকে দোলনায়
দ্বা[illegible] এও বেশ। তারপর কাঁকড়া প্রবন্ধে রকম রকম কাঁকড়ার
সাড়া নে[illegible]বড়া [illegible]। ইহাতে অনেক বুড়ারও বিদ্যা বাড়িবে। "খেলা"
দিলাম। [illegible]টে [illegible] মুকুলে, ফুটে নাই। বিড়ালকে চিনিতে কষ্ট হয় নাই,
কি বাদল, [illegible] হইত বলা যায় না। অভিজ্ঞ বলেন, কাঁকড়া ভক্ষণে গুরু
একটা ষ্টার[illegible]বারে নষ্ট হইয়া যায় ও স্পর্শে বীজের সংস্কার আবশ্যক; তাই
South[illegible]হইতে দূরে রহিলাম। কিন্তু গেছো চোর কাঁকড়া দাড়া দিয়া বড়
Bas[illegible]লা ধরিয়া সজোরে নারিকেল গাছে তুলিয়া লইতেছে, এ দৃশ্য
কি এ[illegible]সংবাদও অনেকের পক্ষে।
mo[illegible]হিত্য। যোগেশচন্দ্র রায়; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; এবং আশ্বিনে
[illegible]রে সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বোখারার নির্ব্বাসিত যুবরাজ, যুবরাজের
[illegible]র ও শরীর রক্ষক। আর সাহিত্যের চিত্রশালায় বিদেশী ছবি—(১)
নয়তি চিত্র, (২) মীনকেতনের তরণী আর (৩) শীতার্ত্ত মদন। সকলগুলিই
বেশ।

প্রদীপ। পরিব্রাজক বেশে জলধর সেন, কবি নবীনচন্দ্র সেন। রণ-
রঙ্গিণী রমণীর মধ্যে—১ খৃষ্টিয়ানা ডেবিস্, ২ হানা স্নেল, ৩ মেরী সেলিয়েঙ্ক,
৪ থিয়রণ ডি মেরিকোর্ট। ভাদ্রে—হরিসাধন মুখো; বনবাসে সীতা।
দার্জ্জিলিং, চিন্‌বাটী লুপ, ঘুম ডাইনী, নেপালী কুলী, নেপালী মেয়ে,

চৌরাস্তা, ফিরিওয়ালা এবং ডাণ্ডি। আশ্বিন ও কার্ত্তিকে—অপূর্ব্ব চন্দ্রদত্ত;
কৌমুদী; মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র; "আমিবা"র* বিভিন্নরূপ; কুকীজাতি
[পুরুষ ও মেয়ে]; কুকীর বস্ত্রবয়ন; কর্ণ কুন্তী সংবাদ। এও বেশ।

আমিবা অমর।

মহাজন বন্ধু। চিনিপটীর কহিনূর স্বর্গীয় সৃষ্টিধর কোঁচ।

সাহিত্য সংহিতা। গণন যন্ত্র।

চিকিৎসক ও সমালোচক। ৺যোগেশচন্দ্র মুখো।

সুধা। পরিব্রাজকবেশে শ্রীমৎ বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর অষ্ট্রেলিয়া
যাত্রা।

স্বাস্থ্য। শারীর সংস্থান।

একজন সমালোচক পূর্ণিমায় ছবি থাকে না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন।
পূর্ণিমায় যে একেবারে ছবি থাকে না এমন নহে। পাঠকও তাহা জানেন,
তবে ন মাসে ছ মাসে। সে যাহা হৌক, আমরা ছাইতে না জানিলে গড়্
চিনিতে পারি। সাময়িক পত্রে হাফটোন প্রভৃতি ছবির দিন দিন উন্নতি
দেখিয়া আমরা আহ্লাদে নৃত্য করিতেছি। ইংরেজী পঞ্চের অনুকরণে
গোপাল ভাঁড়, হরবোলা ভাঁড়, পঞ্চানন্দ বাহির হইয়াছিল, এখন নাই।
কতদিনে 'লণ্ডন নিউস' বা 'গ্রাফিকে'র মত সাময়িক পত্র বঙ্গে বাহির
হইবে? ছবির কোন কথা বলিতে গেলেই কুন্তলীন প্রেস মনে পড়ে।
আমরা কুন্তলীন প্রেস ও হরসুন্দর প্রেসের লোকজনের মঙ্গলের নিমিত্ত
জগদম্বার নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি। ছবির একটু পরিচয়
থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী এবং পারিষদসহ বোখারার
নির্ব্বাসিত যুবরাজের সহিত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ করিতেছি।
একটু পরিচয় না থাকিলে রসভঙ্গ হয়। ভবাণীর ভ্রুকুটীভঙ্গী ভূধর অবশ্য
বুঝিবেন না।

এইবার প্রবন্ধ-পরিচয় লউন।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। গৌড়ের অবস্থান, হুমায়ুন ও শের সাহ, (সাহিত্য)।
সংগ্রাম সাহ, বারাণসী, রণরঙ্গিণী রমণী, সাজাহান বাদসাহের রাজৈশ্বর্য্য
(প্রদীপ)। অশোকের কালনিরূপণ, ভারতবর্ষীয় ইস্‌ফস্ ফেবল, (বঙ্গদর্শন)।

*অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয়। এককোষী জীব। পঙ্কে থাকে।

#298 to 303. FOLIOS ARE TOO MUCH BRITTLE, FILMING IS NOT POSSIBLE.

ঐতিহাসিক প্রস্তাব, ভেটিকান (সুধা)। ভুবনবিখ্যাত রোমনগরের প্রথম পত্তন (অন্তঃপুর)। রাঙ্গামাটী বা কর্ণসুবর্ণ, শঙ্কর ও শাক্যমুনি, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ (সাহিত্য পরিষৎ)। সরফরাজ খাঁ (বীরভূমি)। ভারতের বৌদ্ধমহিলা ও প্রাচীন ভারতে লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি (সাহিত্য সংহিতা)। বুয়ার জাতির ইতিহাস (নবপ্রভা)। প্রাচীন কলিকাতা (প্রয়াস)।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। পৃথিবীর অভ্যন্তর; অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; গৃহসংস্কারবিৎ শম্বুক [সাহিত্য]। মঙ্গলের গ্রহে বিচিত্র; অমর জীব [প্রদীপ]। জড় কি সজীব?; নিউটনের দুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন; অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার [বঙ্গদর্শন]। চিত্রাঙ্কণ [ভারতী]। চস্‌মা [মহাজন বন্ধু]। আহার [নবপ্রভা]। গণন যন্ত্র [সাহিত্য সংহিতা]। নবনীত বৃক্ষ; কামিনীর কেশ [বামাবোধিনী]। ভগোল পরিচয়; স্বরজ্ঞান [হিন্দু পত্রিকা]। অমৃতত্ব [উদ্বোধন]। টিটবার কিউলসিস ও প্রফেসর কচ; হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান [স্বাস্থ্য]। ইন্দ্রায়ু সন্ধানে [ভাস্কর]। মুষ্টিযোগ [অন্তঃপুর]। গোরক্ষা; হোমিওপ্যাথী ভৈষজ্যতত্ত্ব [চিকিৎসক]।

শিল্প ও ব্যবসা প্রভৃতি। রঙ্গপুরে চিনির কল, ভারতে শিল্পশিক্ষা, সন্দেশের হিসাব, ভারতভূমি [মহাজন বন্ধু]। ভারতীয় শিল্প [ভাস্কর]।

জীবন-চরিত। মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র, ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর [প্রদীপ]।

কালীকৃষ্ণ মিত্র ১৮২২ খৃ অব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন, পিতার নাম শিবনারায়ণ মিত্র, তিনি ছাতু বাবুর নিকট আত্মীয়। হেয়ার স্কুলে বিদ্যারম্ভ। তিনি উদ্ভিদ্ ও কৃষিবিদ্যা, নিদান শাস্ত্র, স্পিরিচুয়ালিজম্, যোগশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় সমধিক আনন্দ লাভ করিতেন। কৃষি বিদ্যা বিষয়ক য়ুরোপীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া তিনি কৃষক, ও অন্যান্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতেন। বারাশতে এই জন্য একটি উদ্যান করিয়াছিলেন ও তাহাতে যন্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া শেষ বয়সে কেবল হোমিওপাথী লইয়া থাকিতেন। ১৮৯১ সালে অক্টোবর মাসের থিয়জফিষ্ট পত্রিকা বলেন যে স্পিরিচুয়ালিজম্ সম্বন্ধে তিনি একটি সম্পূর্ণ লাইব্রেরী রাখিয়া যান। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্ম

তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদুঃখ নিবারণই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যশোলিপ্সা তাঁর ছিল না, জীবিতাবস্থায় কাহাকেও ফটো লইতে দেন নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকার তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি প্যারীচরণের মাদকনিবারণী সভার জন্য ও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন এবং "হিতসাধক" ও এডুকেশন গেজেটের নিয়মিত লেখক ছিলেন।

চিকিৎসক। ৺যোগেশচন্দ্র মুখো, বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা। রাণাঘাটে থাকিতেন, রাণাঘাট ভিক্টোরিয়া কেমিকেল ওয়ার্কসপের প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক ও সমালোচক পত্রের একজন পৃষ্ঠপূরক ছিলেন। ইঁহার জীবনী প্রকাশে সাধারণের কি উপকার হইবে?

জহিরুদ্দীন আহাম্মদ। ১৮৪৮ জন্ম। মৃত্যুকালে ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বড় লাটের অবৈতনিক চিকিৎসক মনোনীত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার অতিরিক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষক ছিলেন।

উদ্বোধন। রামানুজ চরিত।

মহাজনবন্ধু। সৃষ্টিধর কোঁচ। জন্ম হয় দাদপুরে (গোবরডাঙ্গা—২৪ পরগণা)। ১২৪১ সালে। পিতার নাম রামচন্দ্র কোঁচ। মৃত্যু ১৩০৬। ইনি চিনির ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কলের চিনি ব্যবহারে ইনিই প্রথমে উদ্যোগী হন। পরে ঘৃতের ব্যবসাও করেন।

মুকুল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যশোরে সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম রাজনারায়ণ। জন্ম ১২৩০। বিশপ কালেজে পাঠকালে গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত ও হিব্রু অধ্যয়ণ করেন। পরে মান্দ্রাজ গমন করেন ও ইংরেজী কাগজের সম্পাদক হন। ৮ বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন, আসিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় নাটক রচনা করেন। পরে কাব্য রচনা করেন। শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা এইগুলি তাঁহার রচিত নাটক। তাঁহার কাব্য তিলোত্তমা সম্ভব, বীরাঙ্গনা, মেঘনাদ বধ। বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইয়া আসেন কিন্তু পসার হয় নাই। ১২৭৯ সালে মৃত্যু।

অন্তঃপুর। স্বর্গগতা প্রসন্নময়ী দেবী (শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর স্ত্রী)।

বামাবোধিনী। স্বর্গীয়া মহারাণী ফ্রেডারিক। ৺বামাসুন্দরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বীরভূমি। ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। জন্ম ১২২০। চাঙড়ীপোতা (খিদিরপুর হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণ)। পিতার নাম ৺হরচন্দ্র ভায়রত্ন। বিদ্যাশিক্ষা প্রথমে পাঠশালা, পরে সংস্কৃত কালেজ। তখন ঐ কালেজে ইংরেজী পড়া হইত না। নিজে ইংরেজী পড়িয়াছিলেন। "বিদ্যাভূষণ" উপাধি পাইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হন। পরে সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষের সহকারী হন। ইহার প্রধান কীর্ত্তি "সোমপ্রকাশ"। মৃত্যু ১২৯১, ৮ই ভাদ্র।—সারদাপ্রসাদ সোমপ্রকাশ প্রকাশের সমস্ত উদ্যোগ করিলে কিরূপে বিদ্যাভূষণ তাহা হস্তগত করেন, সে সংবাদ দেখিলাম না। জীবনীর উদ্দেশ্য প্রশংসা নয়।

নবপ্রভা। দাস রঘুনাথ। ধনীর পুত্র ছিলেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যের কাছে আত্ম সমর্পণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে কঠোর বৈরাগ্য সাধন করেন এবং যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে পতিত মহাপ্রসাদ খাইয়া প্রাণধারণ করিতেন। পিতা ৪০০ মুদ্রা পাঠাইলে গৌরাঙ্গ সেবায় তাহা ব্যয় করেন। গৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কক্ষস্থিত গুঞ্জমালা ও গোবর্দ্ধনশিলা উপহার দেন। মহাপ্রভুর দেহত্যাগের পর বৃন্দাবন গমন করিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীক্ষেত্রে ১৪ বৎসর ও বৃন্দাবনে ৪১ বৎসর কঠোর সাধনার পর ১৫০৪ শকে ৭৬ বৎসর বয়সে লীলা সম্বরণ করেন। আশ্বিন মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাঁহার তিরোভাব উৎসব হয়, অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞীর করম চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

ইহাকেই গৌরাঙ্গ গ্রাম্য কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন; দীনবন্ধু মেস্টর জর্জ্জ।

সাহিত্য পরিষৎ। কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস ও কবি মুকুন্দ (জগন্নাথ বিজয় প্রণেতা)। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ।

সুধা। ৺নীলকণ্ঠ মজুমদার ১৮৫৫ সালে মেদিনীপুর পাথরা গ্রামে

জন্ম। মৃত্যু ১৯০১। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন. কটক র‍্যাভেন্সা কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত। হিমারণ্য, হাজারা, শ্রীক্ষেত্র (সাহিত্য)। প্রবাসীর পত্র (প্রয়াস)। কণকপুরের রাজা (ভারতী)। মেঘরাজ্যে, হিমাচলবক্ষে, বৈদ্যনাথ (প্রদীপ)। লঙ্কাদ্বীপে (সুধা)। বনবাসিনীর পত্র [বামাবোধিনী]। বেহারে বাঙ্গালিনী [ভারতী]।

ভাষা আদি। বঙ্গীয় বর্ণমালা, পারস্যভাষা ও সাহিত্য [ভারতী] পালি-ভাষার অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থ [পন্থা]। বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বুদ্ধ দেবের মহা-পরিনির্ব্বাণ [সাহিত্য পরিষৎ]। অভিধান আলোচনা [প্রদীপ]। বঙ্গভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা [হিন্দুপত্রিকা]।

ধর্ম্ম প্রবন্ধ। সত্ত্বগুণ সংগ্রহ [মহাজনবন্ধু]। মানবজীবন, রামকৃষ্ণ কথামৃত, বহুত্বে একত্ব, সদাশিব, জগৎ [উদ্বোধন]। মহদ্বাক্য, রামচন্দ্র ও জাবালি মুনির কথোপকথন, গীতা ব্যাখ্যা, [বামাবোধিনী]। নিত্যমিলন, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ [সাবিত্রী]। "পন্থা"র প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ। সারসত্যের আলোচনা (বঙ্গদর্শন)। সাংখ্যদর্শন, ধম্মপদং, বেদান্তদর্শনের সাধারণ প্রতিপাদ্য [সাহিত্য সংহিতা]। বৌদ্ধধর্ম্ম [সাহিত্য পরিষৎ]। আর্য্যজীবন, অদৃষ্ট খণ্ডন [সুধা]। কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, উপনিষদের কথা, আত্মজ্ঞান ও আত্মবিসর্জ্জন, রাজসিংহাসন, অদ্বৈতবাদ, কর্ম্মবাদ, পুনর্জন্ম ও থিয়োজফিষ্ট সম্প্রদায়, সাধকের প্রথম অবস্থা, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম [নবপ্রভা]। ব্রহ্মচর্য্য [ভাস্কর]। হিন্দুপত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ।

বিবিধ। বাঙ্গালীর শ্রেণী বিভাগ, পুলিশ সংস্কার, বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ হাস্যরস, কল্যাণেশ্বর মহাদেব [ভারতী]। যৌনসম্মিলন [সাহিত্য]। কার্য্য-মূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি, তিন মিত্র, জাতীয় জীবন রক্ষা [প্রদীপ]। মহিলার পরিচ্ছদ [অন্তঃপুর]। নেশন কি? রাষ্ট্র ও নেশন, বিরোধমূলক আদর্শ, পল্লীর সেকাল ও একাল [বঙ্গদর্শন]। বাঙ্গালীর ভ্রমণ [সুধা]। আমাদের দুঃখকাহিনী [নবপ্রভা]। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা [বীরভূমি]।

খাঁটি সাহিত্য, উপন্যাস, কবিতা, গ্রন্থ সমালোচন ইত্যাদির পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের রেওয়া দেখিয়া বিচক্ষণ পাঠক সাহিত্যের গুদামের অবস্থা, খাতার অবস্থা ও লহনার অবস্থা এবং লাভলোকসান

সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া বিদায় হইব।

সুধা [দুই খণ্ড] ও মহাজনবন্ধু নূতন পাইয়াছি। সাহিত্য সংহিতার অস্থায়ী সম্পাদক হইয়াছেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নৃসিংহ বাবু ছাড়িয়া দিয়াছেন। নূতন লেখকগণের মধ্যে এক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর আবির্ভাব দেখিতেছি, কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্যগগণে মন্মথকৃষ্ণ উল্কারূপী এক লেখক দেখিয়াছিলাম—অনেকস্থলেই আলোক প্রদান করিয়াছিলেন—এক্ষণে নিবিয়া গিয়াছেন। এবার সাহিত্যগগণে ধর্ম্মানন্দ ধূমকেতুর উদয় দেখিতেছি। "সুধা"য় তাঁর পরিব্রাজকবেশে অষ্ট্রেলিয়া যাত্রার ছবি দেখিলাম, আরও জানিলাম from a photo received from Brisbane in Australia. তিনি স্বয়ং বলিতেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ, তদ্ব্যতীত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ প্রভৃতি বহুতর দেশে পরিব্রজন করিয়া কামিনীর কেশ সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি।" তিনি নানাবিদ্যার প্রস্রবণ একেবারে খুলিয়াছেন, তোড়ে অনেক সাময়িক পত্র ভাসিয়া যাইতেছেন। নব্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র বামাবোধিনীকেও ত্যাগ করেন নাই। শুনিতেছি "এই প্রবন্ধের লেখক শৈশব, বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ় প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত সুতরাং যুবতী কামিনীর কেশ বর্ণনায় তাঁহার মনে দ্বিধ উপস্থিত না হইবারই সম্ভাবনা।" ভাল। আরও শুনিতেছি, তিনি "শ্রীমৎ বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।" আরও উত্তম। কিন্তু তিনি কি ভরসায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বামাবোধিনীতে এই সংবাদ প্রচার করিলেন? "বোধ হয় ইহা অনেকের জানা নাই যে, কুমারী অথবা সম্পূর্ণরূপে পতিস্পর্শরহিতা স্ত্রীলোকের মাথার সামান্য পরিমাণে কেশ লইয়া যদি কাঁচি দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করতঃ কাঁচা আনারসের সহিত মিলাইয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা পাকস্থলীতে স্পর্শ করিবার অনধিক তিন ঘণ্টা কাল মধ্যে নিশ্চয় গর্ভস্রাব হইয়া যাইবে; পরীক্ষিত সত্য।" আর কি ভরসায় শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি. এ, ব্রাহ্ম সম্পাদক ও প্রবর্ত্তক, বামাবোধিনীর উনচত্বারিংশ জন্মোৎসবের পর, কোন্ রুচির খাতিরে স্ত্রীলোকদিগের ও

বালিকাদিগের ও বিধবাদিগের অবগতির জন্য এই সংবাদ বামাবোধিনীতে ছাপাইলেন? লেখক মেয়েদের পেটফেলা শিখাচ্চেন আর বল্‌চেন "পরীক্ষিত সত্য"। চাবুক না পিনালকোড না অপরাধীল ফিরাইয়া দেওয়া কিরূপ বিধান হওয়া উচিৎ পাঠক বিবেচনা করিবেন। অথবা ভুলিয়াছি, ধূমকেতুর আগমনে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। যদি এই ধূমকেতুর পুচ্ছ দেখিতে চান তবে সুধার "লঙ্কাদ্বীপে" দেখিবেন। মার্দ্রাস [?] প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ রেলওয়ে ষ্টেশনে ফিরিঙ্গী ও মেটেফিরিঙ্গী ও পুলিসপ্রভু ও কর্ম্মচারীদিগের "রক্ষিতা যুবতী"দিগের সহোদর আত্মীয় * * কুলীরূপে কলিযুগে বিরাজমান। ইহারাই কুলীন কুলী। আর যে সকল ব্যক্তিরা রেলওয়ের "সোকীন সাধু"দিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে সংগোপনে নিশিযোগে আনয়ন করে, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলী।" "বাবা"জীর রসিকতা দেখিবেন? "আমি তোমার বাসা চিনি তবে আসি" এই কথাটির I sugar your nest then I eighty অনুবাদ করিলে যেমন সুন্দর ইংরেজী হয় টোটিকোরিণের ইংরেজীও প্রায় তদ্রূপ, * * I am my father's prostitute—"বাবা"জী আবার অদৃষ্টবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। পারশীয় বয়েদ্ ঝাড়িয়াছেন। আমরা তাঁহাকেই বলি—

"দল্‌পিঁপিঁ দল্‌পিঁপিঁ দলের বিতর বাসা।
আড়্‌ডী নাই, উড়্‌ডী নাই, মানুষ খাবার আশা॥"

পাঠক যদি না বুঝিয়া থাকেন ত তাঁহারই কথায় ভাঙ্গিয়া দি "জুঁক" যারে ইংরাজরা লিচু কয়। লোকা ধোবার যাত্রার দলে শ্রীমন্তের সিংহল যাইবার কালে বাঙ্গালমাঝি আসে, গিরিশ ঘোষের কমলেকামিনীতেও বাঙ্গালমাঝি এসে বলে "হ্যাদে দ্যাখ্ উঠ্‌লোরে ফুর ফুরে বা, বৌসোনা তুই ফিরে চা," "বাবা"জীরও লঙ্কা গমনে বাঙ্গালমাঝি আসিয়াছে আর গাহিয়াছে "দু কথা শুনিয়ে দিব লো ও তোর নিঠুর কালা বাঁকা শ্যামে" আবার "শাক বাজায়ে পাণি আনে একি চমৎকার"। লঙ্কা ভ্রমণের ল ত ছেলে মানুষ, এখনও ৯ আরম্ভ হয় নাই। ওদিকে জলধরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যদি "হিমাচল থারটি ডাউলিউশন" হয়, তাহা হইলে বাবাজীর আমার লঙ্কা ৩৬০ ডাউলিউশনের কেবল শিশিধোয়া মাত্র। "সুধা"য় এইরূপ ভ্রমণকাহিনী উপলক্ষে দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী উচিৎ কথাই বলিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়েরা বুঝি লঙ্কার কথা শুনিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। আমার কথা বর্ত্তমান আর্য্যসমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিৎ। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ, তস্য চর্ব্বণ। স্বাধীন গবেষণার দিকে কেহ কেহ অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া আশা হয়। সাহিত্য ধরিয়া দিতেছেন, হরিসাধনের "গুলবদন বেগম" বিভারিজ সাহেবের স্ত্রীর বস্ত, তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া হরি বাবু গ্রহণ করিয়া ভারতীতে স্বরচিত বলিয়া

প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাহৌক এই উপলক্ষে "সাহিত্য" "হরিসাধন বাবু" ও "প্রবাসীর" মধ্যে যে কলহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভাল নহে। তাঁহাদের দেখা উচিৎ মাথার উপর শকুনি উড়িতেছে। ডাকপুরুষ বলেন "রোগে রূপ নাশ, কোঁদলে জাতি নাশ"। বিজ্ঞানরাজ্যে জগদীশচন্দ্রের ন্যায় আরও অনেকের প্রবেশ করা উচিৎ, এখন ত কলিকাতায় চন্দ্রের অভাব নাই। জীবনচরিতের দুর্দ্দশা দেখাইবার জন্য আমরা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। দেখিবেন স্বার্থানুসারে জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসার পক্ষে যোগেশ আর মহাজনবন্ধুর পক্ষে সৃষ্টিধর কোঁচ যেমন সকলের পক্ষে কি তাই? অপরে কেন এ কষ্ট সহ্য করিবে? জীবনী কি লিখিলেই হইল, না যারতার জীবনী লেখা উচিৎ? এ বিষয়ে আশু সাবধান না হইলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট আছে। পুরাণ কথা লিখিতে গেলেও একটু বার্ণিস চাই। মুকুলে মধুসূদনে সে বার্ণিশ নাই। ভাষা সম্বন্ধে সাময়িক পত্রের দিন দিন অবনতি হইতেছে, যে কোন প্রবন্ধ হইতে আমরা উদাহরণ দিতে পারি। বর্ত্তমান কালে অপসারী উকীল ও মক্কেলের যে সম্বন্ধ, সম্পাদক ও লেখকগণের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ। সম্পাদক মহাশয়গণ কঠোর না হইলে ভাষা যায় যায়। এখন লোকে ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন, বঙ্গসাহিত্যে এটা ধর্ম্মযুগ, তাই সাময়িক পত্রে অধিক পরিমাণে ধর্ম্মকথা থাকিবে। কিন্তু ইহারও একটা মতের বাঁধনি চাই। বাঁধনি লইয়া আমরা চিরকাল যে চীৎকারটা করিয়া আসিতেছি তাহা কি পণ্ড হইবে? বিবিধ প্রবন্ধে দেখিবেন মৌলিকতার অভাব। আজও কি তর্জ্জমার দিন যায় নাই—আজও কি লোকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবে না। নদী বিস্তৃতা হইলে গভীরা হয় না, ইহা সার সত্য। যাঁর গুদামে মাল নাই তিনি বহু খরিদদারের মন রাখিবেন কি উপায়ে? যাঁহার প্রতিভা আছে, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু সে কটা লোকের আছে। শুনিয়াছি জিনিয়াস্‌কেও বড় খাটিতে হয়—খাটিবার ইচ্ছা কি সকলের হইয়াছে? খাস সাহিত্যের হাটে মাল নাই বলিলেও চলে। যেখানে আছে সেখানেও দ্রুতরচনার দোষ সকল পদে পদে লক্ষ্য। সাময়িক পত্রের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমাদের আশা মিটে নাই তবে আমরা অসন্তুষ্ট নহি। ভরসা করি যুগধর্ম্মের ফল শীঘ্র ফলিবে। আমরা যে ভাবের সমালোচন আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক অথচ বিনিময়ে কি পাইব, তাহা জানি না। এরূপ সমালোচনে যে প্রবন্ধের বিশেষ পরিচয় থাকিবে না তাহা নহে, স্থানাভাব না হইলে, আমরা সারবান প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধার করিয়া দিব, ভরষা করি জগদম্বার কৃপায় বঙ্গসাহিত্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তবে সম্পাদক মহাশয়গণের যেরূপ পরিশ্রম করা উচিৎ তাহার পূর্ণতা প্রদর্শন করিলেই সকলে চরিতার্থ হইবে।

মৃত্যুর পর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই ত যোগের ফল—ভগবান প্রাপ্তি। একজন লেখক বলিয়াছেন, ...বান প্রাপ্তি হইতেছে, grandest of all Sciences সকল বিজ্ঞানের ...ব গৌরবময় বিজ্ঞান। অর্জ্জুনের কিন্তু একটা ভাবনা হইয়াছিল, যাহা ...পনার আমার হইবার কথা। আজ যোগ আরম্ভ করিলাম কিন্তু কোন...নে তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল—শেষ হইল না, তখন কি হইবে? আর তিনি ...ই কথা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাও ...রিয়াছিলেন। "হে কৃষ্ণ, প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগে লিপ্ত হইয়া পরে ...থিল্য বশত মনের চঞ্চলতা হওয়ায় যোগসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে ...র কি গতি হইয়া থাকে?" ইত্যাদি এই সংশয় ছেদন জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা ...রিলে ভগবান যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেবকুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

ইত্যাদি ৬অ-৩০ হইতে ৪৫।

...ভগবান কহিলেন,—হে পার্থ, ইহলোকে কি পরলোকে তাহার ...শ নাই, যেহেতু হে বৎস, কল্যানকারী কাহারও দুর্গতি হয় না। ৪০। ...ভ্রষ্ট পুণ্যকারিগণের লোক সকল পাইয়া বহু বৎসর বাসসুখ অনুভব ...শুদ্ধ শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ৪১। অথবা যোগ...ধীমান যোগীদিগের কুলে জন্মেন, এমন যে জন্ম ইহলোকে ইহা নিশ্চয়ই ...ভ। ৪২। হে কুরুনন্দন, সেই দেহে পূর্ব্ব দেহের সেই বুদ্ধিযোগ লাভ ..., তদনন্তর আবার সুসিদ্ধি লাভ করিতে যত্ন করেন। ৪৩। সেই ...ভ্যাস বশত অবান্তর হেতুতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, আর যোগের ...জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করে। ৪৪। কিন্তু যতমান্ যোগী

প্রযত্ন হইতে পাপ পরিশুদ্ধ হয়েন, অনেক জন্ম সংসিদ্ধ হইয়া তাহার পর পরাগতি লাভ করেন। ৪৫।

তবেই দেখা গেল যোগভ্রষ্ট হইলেও ভয় নাই। এ ব্যবসায়ে লোকসান নাই, সবই লাভ। এখন পাঠকের মনে হইবে তবে ত যোগ করা উচিৎ—কি করিয়া করিব? গীতায় ভগবান তাহাও বলিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহা মাদার টিন্‌চার। পরে অনেক গ্রন্থে তাহার নানা প্রকার ডাইলিউসান হইয়াছে। একটু নমুনা দেখুন—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিন কুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ।
মনঃসংযম্য মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগীনিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

গীতা ৬ষ্ঠ ১১-১৭

পবিত্র স্থানে বস্ত্র চর্ম্ম বা কুশনির্ম্মিত নাতিনীচ অনধিক উচ্চ স্থিরাসন রচনা করত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়াসংযত হইয়া মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া ঐ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগসাধন করিবে। ১১, ১২ দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে অচল রাখিয়া কোনদিকের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রক্ষা করত প্রশান্তচিত্ত নির্ভয় মৎপরায়ণ মন্মনা ব্রহ্মচারী হইয়া মনকে সংযত করত যুক্ত হইয়া উপবেশন করিবে। ১৩, ১৪। এই প্রকারে যোগী সতত মনকে সমাহিত করিয়া সংযত চিত্ত হইয়া

নির্ব্বাণ প্রাপনীয় আমাতে অবস্থানরূপ পরমা শান্তিলাভ করে। ১৫। হে অর্জ্জুন, অত্যাহারীর যোগ হয় না, আর অনাহারীরও যোগ হয় না, অতি নিদ্রালুর যোগ হয় না এবং অতি জাগ্রতেরও যোগ হয় না। ১৬। পরিমিত আহারবিহারকারী, পরিমিত সকল কার্য্যকারী এবং পরিমিত নিদ্রাজাগরণশীল ব্যক্তিরই দুঃখহানিকর যোগ হইয়া থাকে। ১৭।

বুদ্ধদেব যোগী ছিলেন পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখনও সকল উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যেই যোগ আছে। শাক্ত বৈষ্ণব ত বড়কথা। নেড়া, বাউল, কবীর, দরবেশ ইহাদের মধ্যেও যোগ আছে, তাহাদের গান শুনিলেই বুঝা যায়। "চেয়ে দ্যাখ্ সড়ক্ পানে। ফুটেছে সোণার কমল, চাঁদ চেয়ে সে নিরমল, মলাতে তার কর্ব্বে কি, আপনি আলোক ঐ বিমানে॥" রামপ্রসাদের ষট্‌চক্রভেদের গান পূর্ব্বেই উদ্ধার করিয়াছি। প্রসাদও গাহিয়াছেন

সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥

রামপ্রসাদ আবার একস্থানে গাহিয়াছেন—

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী সুখে সাধ নেই লহনা।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সু প্রকাশ,
মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা।

আবার—

কালী কালী বল রসনারে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার, সারথি তার রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় করে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়ে শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হইলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করো নারে।
ওমন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥

কালীপদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মর্ম্ম।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ ল ক্ষ ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব স অন্তে চারি পত্রে মায়াডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তরে ষড়্দলোপরবাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু শিব ভৈরবী ডাকিনী॥
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নিবীজধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়্দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরনর্ণ ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্রবীজে সুধাক্ষয়ে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥

ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ভাল এখন থাক্, পরে বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে যে সকল যোগীসম্প্রদায় আছে, তাহাদের নাম পূর্ব্বে একবার করিয়াছি, আবার এখানেও করিতেছি। কনফট্, অঘড়, মচ্ছেন্দ্রী, ভর্তৃহরি, শরেজীহার, ডুরীপার, কাবিপা, অঘোরপন্থী, রামপন্থী যোগী, সিদ্ধিকেরাণি ইত্যাদি। মোটের উপর ভারতে যাবদ্ ত্রয়োদশ প্রকার যোগী আছে, তাহাদের একটু বিবরণ দিয়া অপর কথা আলোচনা করিব। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে যোগসিদ্ধ হন তাঁহাদের নাম সিদ্ধযোগী, সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধযোগীর নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক যোগসিদ্ধ হইয়াছেন, ইহা জানা কথা। হঠদীপিকার প্রথম উপদেশে কতকগুলি নাম আছে। শৈবসন্ন্যাসীদের যেমন উপাধি গিরি, পুরী, যোগীদের সেইরূপ উপাধি আছে। যথা আদিনাথ

এক্ষণে হঠদীপিকার নামগুলি এই, আদিনাথ, মৎসেন্দ্র, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশর, মন্থানভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরী, পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, অক্ষয়, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিণ্টিনী, ভল্লটি, নাগবোধ, খণ্ড, কাপালিক। হঠদীপিকা বলেন—

ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি যে॥

ইহাদের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। গোরক্ষপুর, পেসোয়ার, দ্বারকা, হরিদ্বার এবং দাক্ষিণাত্যের কাজলি যোগীদের প্রধান স্থান।

কন্‌ফট্ যোগী। হিন্দী কান্=কান, ফট্=ছিদ্র; ইহাদের কর্ণ ছিদ্র হইতে নাম হইয়াছে, ইহারা শৈব। শিবাবতার গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের প্রবর্ত্তক। গোরক্ষনাথের উপদেশ অনুসারে ইহারা হঠযোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। ইহারা দীক্ষাকালে কর্ণের ছিদ্র দুইটিতে দুইটি কুণ্ডল ধারণ করেন; শিবের কর্ণে কুণ্ডল আছে বলিয়া ইহারাও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করেন। এই কুণ্ডল প্রস্তর, গণ্ডারের শৃঙ্গ বা বেলোয়ার নির্ম্মিত। কুণ্ডলের দুইটি নাম মুদ্রা ও দর্শন, শেষোক্ত নামানুসারে কণফট্ যোগীরা দর্শনীযোগী বলিয়াও প্রসিদ্ধ। শৈবসন্ন্যাসীর মত ইহাদের সব বেশভূষা অর্থাৎ পরিধান গেরুয়া, মস্তকে জটা, শরীর ভস্মলেপন, ললাটে বিভূতি-ত্রিপুণ্ড্র। যোগী বুঝাইবার জন্য ইহারা গলায় "সেলি"তে "নাদ" ধারণ করেন। নাদ ও সেলি দেখিলেই বুঝিতে হইবে এ ব্যক্তি যোগী। সেলি একটি রঞ্জিত ঔর্ণসূত্র, নাদ—দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র বিশেষ। ইহারা বহু গুরু মানেন যে মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেয় সে গুরু; যে কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করাইয়া দেয় সে গুরু; যে জ্যোৎমার্গে প্রবেশ করায় সেও গুরু। ইহারা হয় তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে ভ্রমণ করেন না হয়, দলবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক শিবমন্দিরের 'পূজারী কণ্‌ফট্ যোগী।' তীর্থস্থান হইতেছে পেশোয়ার (গোরক্ষ-ক্ষেত্র), হরিদ্বার (গোরক্ষ-সুড়ঙ্গ), দ্বারকা (গোরক্ষ-ক্ষেত্র) এবং নেপাল (পশুপতিনাথ)। কলিকাতার নিকট দমদমার কাছে (গোরখ্ বাস্‌লী) একটি স্থান আছে, সেখানে একটি দেবালয়ে শিব কালী হনুমান

প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি আছে ও তিনটি নরমূর্ত্তিও আছে; যথা, গোরক্ষনাথ, মৎসেন্দ্রনাথ ও দত্তাত্রেয়। কিন্তু গোরক্ষপুরে এই সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। এই স্থানের প্রথম মন্দির আলাউদ্দীন ও পরে দ্বিতীয় মন্দির প্রস্তুত হইলে বাদসাহ অওরঙ্গজেব ভগ্ন করিয়া দেন ও মুসলমানের মসীদ প্রস্তুত করেন। যাহাহৌক যোগী বুদ্ধনাথ যে মন্দির পরে প্রতিষ্ঠা করেন তাহাই অদ্যাপি বর্ত্তমান। এখানে আরও দুইটি মন্দির আছে একটি হনুমানের ও অপরটি পশুপতিনাথের। কেহ কেহ বলেন গোরক্ষনাথ কবীরের সমসাময়িক। কবীরের "বীজেক" গ্রন্থে গুরু গোরক্ষনাথের কথা আছে। সুলতান সেকেন্দরলোদী এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন (১৪৮৮-১৫১৮ খৃঃ অঃ)। গোরক্ষনাথ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন যথা; গোরক্ষ সংহিতা, গোরক্ষ শতক, গোরক্ষ কল্প, গোরক্ষ সহস্র ইত্যাদি। বেঙ্গল প্রবিন্সিয়াল রেলওয়ের মাহানাদ গ্রামে একটী ষ্টেসন আছে, পাণ্ডুয়া হইতে দুই ক্রোশ ও ত্রিবেণী হইতে চারি ক্রোশ হইবে। এইখানে কণ্‌ফট্ যোগীরাজার একটি আবাস আছে। তাহার অনেক ভূসম্পত্তি। যোগীরাজ গত হইলে শিষ্য উত্তরাধিকারী হন। এখানে জটেশ্বর শিব আছেন ও বশিষ্ঠ গঙ্গা এক্ষণে একটি জলাশয় মাত্রে পরিণত হইয়াছে। জনপ্রবাদ আছে যে একদা মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত হয় ও তাহা হইতে বায়ু সংযোগে উচ্চ নাদধ্বনি সমুত্থিত হইলে দেবগণ আগমন করিয়া উক্ত শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গা স্থাপন করেন। ঐ নাদ হইতে গ্রামের নাম মহানাদ হইয়াছে। আরও প্রবাদ আছে, একদা পাণ্ডুয়া হইতে মুসলমানগণ গিয়া মহানাদ আক্রমন করেন। মহানাদের হিন্দুরাজার সৈন্যগণ যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয় অমনি বশিষ্ঠগঙ্গার জল সেচন করিবামাত্র জীবিত হইয়া উঠে। মুসলমানগণ মৃতব্যক্তিকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাপার কি জানিতে উৎসুক হইলে ঐ কথা পরে প্রকাশ হইয়া যায়। তখন ছদ্মবেশে একজন মুসলমান যোগীবেশে মাথার জটায় গোমাংস লইয়া গিয়া কোন সুযোগে সন্ধির সময় গ্রামে প্রবেশ করিয়া বশিষ্ঠগঙ্গায় অবগাহন স্নান করে। সেই অবধি বশিষ্ঠগঙ্গার সঞ্জীবনীশক্তি চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের জয়লাভ ও ঘটনা স্মরণার্থ পাণ্ডুয়ার মন্দির নির্ম্মিত হইল। পেঁড়োর-মন্দির এখনও বর্ত্তমান।

কণ্‌ফট্‌যোগীরা দ্বারপরিগ্রহ করেন না। বিষয়ী মহানাদের যোগীর ন্যায় রাজস্থানের মিবার প্রদেশের একলিঙ্গ শিবের গোস্বামীরাও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল টড তাঁহার "রাজস্থান" পুস্তকে আরও বলিয়াছেন যে নাগাদের ন্যায় এই কণ্‌ফট্ যোগীদের আপনাদের একটি সৈন্যদল ছিল এবং আবশ্যক বুঝিয়া তাঁহারা অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

অওঘড়যোগী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মগিরি প্রবর্ত্তক। ইহারাও শৈব। ইহারা সর্ব্বপ্রকারে কণ্‌ফট্‌যোগীদিগের ন্যায় কেবল মাত্র কর্ণে ছিদ্র করিয়া কুণ্ডল পরিবার নিয়ম নাই।

মচ্ছেন্দ্রী। গুরু গোরক্ষনাথের পিতার নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ। তাঁহারই নামানুসারে এই সম্প্রদায়, কেন না তিনিই প্রবর্ত্তক। অনেক বৌদ্ধগ্রন্থে যোগী মৎসেন্দ্রনাথের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ইনি কি না বলা দুষ্কর। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না বলা যায় না।

ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি যোগীরা ভর্তৃহরিকে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দেন।

শারঙ্গীহার। শিব ও শক্তি বিষয়ক গান করিয়া বেড়ান ও তৎসঙ্গে শারঙ্গ বাজাইয়া থাকেন। এইরূপে ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ভিক্ষা গ্রহণকালে ভৈরবের নাম উচ্চারণ করেন। কখনও বা গান না গাহিয়া শুধু "ভৈরব" বলিয়া ভিক্ষা করেন।

ডুরীহার। বস্ত্রবিক্রেতা। এই সম্প্রদায়ের যোগীরা নিয়মপূর্ব্বক কার্পাস বা পট্টসূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র বয়ন করেন পরে বিক্রয় করেন। কামাখ্যা অঞ্চলে বিচুটি সূত্রের বস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক বয়ন করিবার রীতি আছে, তাহাতে অবিবাহিতা বা দেবদেবীনিবেদিতা কুমারীগণেরই পূর্ণ অধিকার।

কাণিপা। ইহাদের কর্ণছিদ্র কণ্‌ফট্‌দিগের ন্যায় বড় নহে। সাড়ে তিন ফুলের মধ্যে গেরুয়া ধারণ করে। শ্মশ্রুধারণ ও গলায় সেলি ধারণ করে, "নাদ" ধারণের রীতি নাই। ইহারা তুবড়ী বাজাইয়া ও সর্প খেলা দেখাইয়াও ভিক্ষা করে। ইহারা স্ত্রীপুত্র ও পশু সঙ্গে লইয়া দেশপর্য্যটন করে ও গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠে তাম্বু খাটাইয়া অবস্থান করে। ভিক্ষার জন্য নগরে যায়। ইহারা গোরক্ষপুরে গিয়া গুরু গোরক্ষের নামে দীক্ষা গ্রহণ করে। এক সময়ে ইংরেজ বাহাদুর ইহাদিগকে দোষী ভ্রমণকারীর

দলের (criminal tribes) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা কর্ণ ছিদ্রে যে কুণ্ডল ধারণ করে, তাহার নাম "দর্শন"। দর্শন, পিত্তল কাঁসা দস্তা বা রৌপ্য কি অপর ধাতু নির্ম্মিত কুণ্ডল। শৈবসন্ন্যাসীদের ভাষায় গেরুয়া, বিভূতি ও কমণ্ডলু প্রত্যেকে একটি ফুল। খর্পর সুরা ফুল নহে আধখানা। যিনি সাড়ে তিন ফুলধারী তিনিই পূর্ণ শৈবসন্ন্যাসী।

অঘোরী বা স্বর্ভঙ্গী যোগী। স্বর্ভঙ্গী নামান্তর। যে সকল অঘোরপন্থী কর্ণে ছিদ্র করিয়া কুণ্ডল বা দর্শন ধারণ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হন, তাঁহারাই অঘোরপন্থীযোগী। অক্ষয় বাবু নিজ পুস্তকে এই সম্প্রদায়ের উপর বিস্তর গ্লানিসূচক বাক্যবাণ বরিষণ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য প্রমান দিতেছি। (১) "নানাবিধ ঘৃণিত ও কুৎসিৎ ব্যবহার করে।" (২) "আমার সুপরিচিত একটি ভদ্রলোক একবার গয়াধামে গমন করেন। তিনি একদিবস একটি অঘোরী ও অঘোরিণীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা মদ্যপান করিতে করিতে সমীপস্থ হইল ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষার লোভে অনতিবিলম্বেই দিবাভাগে সকলের সাক্ষাতেই স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল, ইত্যাদি।" (৩) "কোন কোন অঘোরী এক একটি অঘোরিণী সঙ্গে রাখে ও তাহাকে লইয়া যারপর নাই অকথ্য ও অশ্রাব্য ব্যবহার করিয়া থাকে।" এখন আমাদের কথা। নং ১ নং ২ জন্য বলা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহার দেখিয়া সম্প্রদায়কে গালি দিতে নাই। ভদ্রলোকটি কি করিয়া জানিলেন যে সে অঘোরী, তাহার উল্লেখ বা বিচার নাই। না জানিয়া শুনিয়া ছাপান ও গম্ভীর পুস্তকে এরূপ লিখিতে নাই। নং ১ সম্বন্ধে আমরা এইটুকু জানি যে কোন কোন সাধনায় বীভৎসরস আয়ত্ত করিতে পারিলে শীঘ্র ফল লাভ হইয়া থাকে। সে গুহ্য কথা এখানে কেমন করিয়া বলিব? "মদ্যমাংস ভক্ষণ, সর্পাদির অস্থি ও পশ্বাদির কপাল ধারণ" সকলের পক্ষে ঘৃণার্হ নহে।

যোগিনী বা নাথিনী। স্ত্রীলোক যোগসাধনা করিলে যোগিনী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাদের নামান্তর নাথিনী। ইহারা শৈবসন্ন্যাসী ও যোগীদের ন্যায় গেরুয়া আদি শৈবচিহ্ন ধারণ করেন ও ইচ্ছামত কর্ণে মুদ্রা বা অঙ্গে অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। স্ত্রীলোক শক্তিরূপ বিধায়, ইহাদের সাধনা ও যোগ শীঘ্র ফল প্রসব করে।

সংযোগী। ঘরবারী সন্ন্যাসীদের ন্যায় যে সকল যোগী দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন তাঁহারা সংযোগী নামে অভিহিত হন।

অক্ষয় বাবু তাঁহার পুস্তকে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমানকালের যোগীগণ অধিকাংশই প্রবঞ্চক এবং "কলিতে যোগসিদ্ধ হয় না, কলিতে তপস্যাও সিদ্ধ হয় না"। ইহার উত্তরে প্রথমে অক্ষয় বাবুর কথাতেই বলিব "এক্ষণে অপরাপর অনেক ধর্ম্মের ন্যায় যোগধর্ম্মও একরূপ প্রবঞ্চনার উপায় হইয়া উঠিয়াছে"। আর কলিতে যোগ ও তপস্যা সিদ্ধ হয় কি না তদুত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি, বহুসংখ্যক কলির সাধকের নাম করিয়াছি ও রামকৃষ্ণ পরমহংস, তোতাপুরী, রামপ্রসাদ প্রভৃতির যোগসিদ্ধির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। আমরাও স্বচক্ষে একজনকে বালক অবস্থায় দেখিয়াছি, আবার কিছুদিন হিমাচল অবস্থানের পর যোগসিদ্ধির অবস্থায়ও দেখিয়াছি। তিনি যে প্রবঞ্চকের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে এই বলি যে যতদিন ধরাধামে মানব থাকিবে, যতদিন মানবের মন থাকিবে ততদিন ধর্ম্মে কর্ম্মে যোগে ক্রিয়ায় সমাজে, আহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই এমন কি পুস্তক লেখায়ও প্রবঞ্চনা থাকিবে। কেন তিনি ত নিজেই দত্তাত্রেয় সংহিতায় এই শ্লোক দেখিয়াছেন—

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতত্তু সাঙ্কৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেশধারিণঃ॥
অন্নপান বিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল।
উচ্চাবচৈর্ব্বিপ্রলম্ভৈর্যতস্তে অশনালবঃ॥

অর্থাৎ "সাঙ্কৃতি, যোগক্রিয়াই যোগসিদ্ধির কারণ ইহা সত্য জানিবে। যাহারা শিশ্নোদরের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে যোগীর বেশ ধারণ করে, তাহাদের কিরূপে যোগসিদ্ধি হইবে? এরূপ বেশধারী ব্যক্তিরা ভোজনাসক্ত; তাহারা অন্নপানবিহীন হইয়া থাকে, সকলকে নানাপ্রকারে বঞ্চনা করে।"

তিনি নিজে আরও লিখিয়াছেন—"মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডধারী কষায়বর্ণ বস্ত্র, নারায়ণ শব্দ উচ্চারণকারী, জটাযুক্ত, ভস্মলিপ্ত, নম শিবায় এই শব্দ উচ্চারণকারী, বহুমূর্ত্তিপূজক, এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়াও যদি ক্রূর হয় অথবা যথাবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না করে, তবে কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? —দত্তাত্রেয় সংহিতা।

সন্ধ্যাগমে শোন নদীর প্রতি।*

কেগো তুমি হেথা নিরালায়?
লোকালয় পরিহরি,
কি বাসনা বুকে করি,
রহিয়াছ মগ্ন হেন মহাসাধনায়।

তোমার ও বিভল পরাণ,—
স্বচ্ছদর্পণের মত,
দেখাইছে অবিরত,
মানবের চক্ষে যেন সারাবিশ্বখান।

তব পূত হৃদয়ের মাঝে,
প্রণয় আবেশে গলি,
তারাবধূ পড়ি ঢলি',
সাজায় তোমারে কিবা মনোময় সাজে।

হেরি তাহা হেন মনে ভায়—
হীরক খচিত বাস,
ঢালিছে মধুর হাস,
পরশি বরাঙ্গ তব বিভল হিয়ায়।

তব রূপে উধাও পরাণ,
তাই স্বর্ণশশধর,
লুটি ও হৃদয়পর,
সাধিছে লইতে তার প্রেম অর্ঘ্যদান।

পবিত্র সৈকত বেলাভূমি,
সুবর্ণ কণিকা মত,
ঝলিতেছে অবিরত,
নাচিছে বিভল প্রাণে তব পদ চুমি।

*কৈলওয়ারে প্রবাহিত শোন্ নদী দৃষ্টে লিখিত।

হেরি সেই পূত সুষমায়,
মনে হয় তব তরে,
প্রফুল্লিত সোহাগ ভরে,
সাধনা মন্দির রচি অবশ হিয়ায়—

আছে তব প্রেম মুখ চেয়ে,—
স্বচ্ছকায়েগো তোমার,
প্রতিবিম্ব পড়ি তার,
সারা বিশ্বখান যেন গেছে প্রেমে ছেয়ে।

দুই তীরে তরু অগণন,
গুরুপদে শিষ্য যেন,
দেখিগো নমিছে হেন,
নত মাথে মুক্ত প্রাণে তোমার চরণ।

মাঝে মাঝে শুভ্র কাশ ফুল,
আরাত্রিক—দীপমত,
শোভিতেছে অবিরত,
স্নাত সেই সুসমায় তব দুই কুল।

ইংরাজের সেতু বক্ষ মাঝে,
দাঁড়াইলে তারোপর,
কি যেন গভীরতর,
বিশ্বের মহান্ গীতি মরমেতে বাজে।

শুনি সেই সুনীরব গান,
সংসারের অনিত্যতা,
বৈরাগ্য বিষাদ ব্যথা,—
জাগিয়া, বৈরাগ্যে যায় ভরিয়া পরাণ।

যে দিকেতে নয়ন ফিরাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শুধু,
দেখি গো করিছে ধূ ধূ,
অসীমে সসীম আমি মিশাইয়া যাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

সাহিত্য সম্বাদ।

(গুণরাজ খাঁর "গোবিন্দবিজয়"।)

সমালোচ্য গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কি 'গোবিন্দবিজয়' ছিল, নিশ্চয় বলা যায় না। কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থে ইহার দুই নামই দৃষ্ট হয়। নাম যাহাই হউক, আসলে কিন্তু একই কথা। ইহা ভাগবতের বঙ্গানুবাদ মাত্র। আমরা কেবল দশম স্কন্ধের অনুবাদ পাইয়াছি।

ইহার প্রণেতার নাম মালাধর বসু। গৌড়ের সম্রাট হোসেন সাহ হইতে ইনি 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন; তদবধি ইনি ঐ উপাধিতেই পরিচিত আছেন। আমরা যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহার এক স্থানে মাত্র 'মালাধর' নাম পাইয়াছি, আর সর্ব্বত্রই 'গুণরাজ খাঁ' নাম দৃষ্ট হয়। বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মালাধরের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই হস্তলিপিতে মোটেই দেখা যায় না। কবির

*সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা আমাদের দেখা নাই।

আত্মবিবরণের মধ্যে এই হস্তলিপিতে কেবল—

"বাপ মোর ভগীরথ মাও ইন্দুমতী।
তাহার প্রসাদে মোর নারায়ণে মতি॥"

এই দুই ছত্র ভিন্ন আর কোন কথা নাই। হস্তলিপির তারিখ ১১৫১ নদী। পত্র সংখ্যা ১৩৭। অনুমান, এই গ্রন্থে সার্দ্ধসপ্তসহস্র পদ আছে। পুরাতন কাগজে দুই পৃষ্ঠে লেখা। সুতরাং গ্রন্থখানি যে প্রকাণ্ড, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ ধৈর্য্যের এক বিরাট নিদর্শন।

দীনেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থে কবির জীবনী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই লিখিয়াছেন; এখানে আমরা তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) ইহার অনুবাদ আরম্ভ হয় ও সাত বৎসরে সমাপ্ত হয়। সুতরাং ইহার রচনাকাল চারি শত বৎসরের উপরে। ভাষা কিছু জটিল। গুণরাজ খাঁ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার লেখনীমুখে ভাষা কর্কশ বা দুর্ব্বোধ হয় নাই, স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছে। মধ্যে যেখানে রাধিকার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সেইখানেই ইহার ভাষা কোমল মধুর হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকা বঙ্গসাহিত্যে যে অপূর্ব

সৌন্দর্য্যরস নিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? দীনেশ বাবুর গ্রন্থে সৌন্দর্য্যলিপ্সু পাঠক সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন। কেবল ইহার কবিত্বসুষমা প্রদর্শন জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে; ইহাতে প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল বিশেষত্ব আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে, অদ্য সংক্ষেপে তাহার কয়টী প্রদর্শন করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পরে সাহিত্যাতিহাসে এ গুলির ঐকান্তিকী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইবে।

এই কয় শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভাষার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এখন ক্রিয়া ও শব্দবিভক্তি সকল রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। কালে তাহা কি রূপে পরিণত হইবে, কে বলিবে? পূর্ব্বকালের অনেকগুলি শব্দ প্রাচীন রূপ রক্ষা করিয়াছে; এখন অনেকগুলিই 'অপ্রচলিত শব্দ' পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সপ্তমী বিভক্তির 'এ' বা 'তে'কে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। প্রাচীন কবিগণ এই সকল নিয়মাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই অসঙ্কোচে লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে ভূরি পরিমাণে রহিয়াছে। মনে করুন, 'দেশে' এই সপ্তম্যন্ত শব্দটি বড় জোর 'দেশেতে' বা কোথাও যতির খাতিরে 'দেশমাঝে'. কি ঐরূপ আর কিছু লিখিতে পারি কিন্তু প্রাচীন কবিগণ নির্ভয়ে 'দেশএ', লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রাচীন সাহিত্যে 'করয়ে', 'আছয়ে' ইত্যাদি রূপের যে এত ছড়াছড়ি, তাহাও ঐ 'এ'কার যোগ না হওয়ায় হইয়াছে। আমরা নাম পুরুষে 'করে' (কর+এ) লিখি। এই 'এ'কার কোথাও বা 'য়'কার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন 'করএ', 'করয়' ইত্যাদি। বস্তুতঃ আধুনিক প্রয়োগ লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, ঐ 'য়', 'এ'কারই হওয়া উচিত। এই 'এ'কার, 'য়'কারে কিরূপে পরিণত হইল, ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর আলোচনার বিষয়। উত্তম মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায়ও 'এ'কার বা 'য়'কার প্রয়োগ আছে। অধুনা উত্তমপুরুষে আর ঐরূপ ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না, মধ্যম পুরুষেও কচিৎ হইয়া থাকে।

সপ্তম্যন্ত পদে 'এ'কার যোগ না করিয়া এই গ্রন্থে অনেক শব্দ প্রযুক্ত

হইয়াছে; কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম—লিপিকরেরা 'এ'কার স্থলে 'য়'কার লিখিয়াছেন।

১। 'শুকমুখে শুনিলেক পাপের পাপাশয়।
উগ্রসেন রাজা হইল মথুরা দেশয়॥'
'জয় জয় শব্দ হইল নন্দের নিলয়।
বৃদ্ধকালে পুত্র হইল নন্দের ঘরএ॥'
'আসিয়া যশোদা লৈলা গোবিন্দ কোলএ।'

এখানে অপরাপর বিশেষত্বগুলি ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে।

২। ২য়া বিভক্তের 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগ।

'বাপুক যে দূর করি, শিরেত যে ছত্র ধরি,
দুরন্ত যে অতি উগ্রবীর্য্য।'
'শিশু ভাব করি তাক না করিয় হেলা'।
'সভাক পাঠাইয়া দিল দ্বারিকা নগরী'।

৩। তোহর=তোমার। তোহক=তোক=তোমাকে। মোত=মোকে বা মোতে।

'মোর কাছে আইল আজি তোহর মরণ।'
'তোহক প্রসন্ন আজি যমের কারণ॥'
'দৈবকী অষ্টম গর্ভ মোত দিবা আনি।'

৪। কোথাও 'জন্য' অর্থে এবং কোথাও সপ্তম্যন্ত স্থলে 'রে' যোগ।

'ভোজনেরে স্নান করি নন্দ আইল ঘর।'
'ছাড়িয়া গোকুল বৃন্দাবনেরে চলিল।'
'প্রভাতে ভোজন করি গোঠেরে চলিল।'

৫। লড়িল=চলিল। এই গ্রন্থে এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। সর্ব্বত্রই একই অর্থ। বর্ত্তমানকালে কোন কোন দেশে (যেমন চট্টগ্রামে) 'নাড়া' (অপসৃত করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'এত বোলি লড়িলেক হরাসিত মনে।'
'রাজার আদেশে বগ লড়িল তথাই'
'এতেক বোলিয়া হরি লড়িলা সত্বরে।'

৬। করসি, খায়সি, করন্তি ইত্যাদি রকমের ক্রিয়া অনেক আছে;

যথা— 'ইন্দ্র ছাড়ি দেবগণ, ভয়ে চমকিত মন,
অসুরেরে করন্তি সেবন।'
'দধি খাও ভাণ্ড ভাঙ্গ করসি ক্রন্দন।'
'দ্বারিকার মুখ হইয়া যায়ন্তি ধাইয়া।'

৭। বালা, আবাল=বালক।

'ছিকা ভরি অন্ন লইল সকল ছাওয়াল।
বৎসক রাখি ভাত খাইমু সকল আবাল॥'
'বড় শত্রু হইল মোর নন্দঘোষ বালা।'

৮। হনে=হন্তে=হইতে।

'ছিকা হনে দধি দুগ্ধ পাড়িল শ্রীহরি।'

প্রাচীন সাহিত্যে ইহার নানারূপ; হন্তে, হোন্তে, হোতে, হতে, হৈতে। মূল প্রাকৃত 'হিংতা'।

৯। উয়ারি=গৃহ। শব্দটি কোথা হইতে আসিল?

'সব ধনে পূর্ণ হইল নন্দের উয়ারি।'
'মোর ঘরে আন যদি সেই বনচারী।
পুড়িয়া করিব ছালি সকল উয়ারি॥'

প্রাচীন কবি দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রানী'।

১০। নাহিবারে=স্নান করিবারে।

'গোকুলের নারী সব নাহিবারে যাএ।'

১১। আউদল=আলুথালু, অবিন্যস্ত।

'ধাইয়া যাএ নন্দঘোষ আউদল চুলে।'

১২। নাগাইত=জামিন।

'রাই বোলে নাগর কানু পার কর তুহ্মি।
আসিবারে দান দিমু নাগাইত হৈল আহ্মি॥'

১৩। এভো=এবেও। চট্টগ্রাম সদরে এখনও এইরূপ ব্যবহার আছে।

'শুন শুন চন্দ্রাবলী এভো ঘুম যাও।'

১৪। তোমরার=তোমাদের।

'তোমরার লাগিয়া হৈল এতেক অবস্থা।'

১৫। বউহারি = বউয়ারি, বধূ।

'বরাই বোলে জিজ্ঞাসাএ প্রয়োজন কি।
কুলের বউহারি সব গোয়ালের ঝি॥'

১৬। জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' স্থলে 'নি' এখনও এই অঞ্চলে প্রযুক্ত হয়।

'তুমি নি দেখিলা কোথা গেল চক্রপানি।'

১৭। করাগ = মুক্তি, খালাস।

'তিনবার বোলে বুড়ী দিয়া তিন তালি।
দোষের করাগ হইল শুন বনমালী॥'

আর্ত্তি = ইচ্ছা। 'কৃষ্ণ দেখিবারে আর্ত্তি সকল সভার।'

১৮। ছুটি = ছটা।

'যুবতী সিন্দূর পৈরে কৃষ্ণ পীত ধটি।
মেঘের মধ্যেতে যেন বিজলীর ছটি॥'

১৯। সমাই = সকল। 'সমূহ' সব্দের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকা সম্ভব।

'কি করিলা ওহে নন্দ কৃষ্ণের বচনে।
কোপে ইন্দ্রে আসি করে সমাইর নিধনে॥'
'অদ্ভুত দেখিলেক সমাইর মনে।'

২০। খানি = খান, খণ্ড।

'চক্র এড়ি গদা গোটা কৈল খানি খানি।'

২১। অক্ষেমা = ক্রন্দন, আক্ষেপ।

'না কর অক্ষেমা দূত স্থির কর মন।
হেন জন আনিতে তুহ্মি না কর গমন॥'

২২। মুকাইয়া = মুক্ত করিয়া। মাইকেলিক ক্রিয়ার সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

'বন্ধন মুকাইয়া দ্বিজ তিরস্কার কৈল।'

২৩। ভাউজ = ভাজ, ভ্রাতৃজায়া। এই দেশের মুসলমানগণ 'ভাউজ' হিন্দুগণ 'ভইজ' ব্যবহার করেন।

তবে ত রুক্মিণীদেবী সম্ভ্রমে উঠিয়া।
না বোলিলা কিছু দেবী ভাউজ দেখিয়া॥'

২৪। মাঞিয়া = মেয়ে। ঠিক চট্টগ্রামী প্রয়োগ।

'মাঞিয়া ছাওয়াল মারি কোন প্রয়োজন।'

২৫। আইল = আলি।

'জল শুখাইলে আইলে বান্ধিয়া কি কাজ।'

২৬। গোহারি = গোহার, নিবেদন বা বিজ্ঞাপন।

'অহে ত গোহারি যাইব কংস বরাবরে।
চোর বান্দে রাজা যেন তোমারে দণ্ড করে॥'

'গোহারি যাইব' অর্থে 'নালিশ করিব' এইরূপ অর্থই প্রশস্ত।

২৭। ঘোরা = আবৃত করা। এই অঞ্চলে অদ্যাপি এই প্রয়োগ আছে।

'পাটের পাছুরা পৈরে নেতের ওরণ।
বি চিত্র কাচুলী পৈরে সর্ব্বাঙ্গে ঘোরণ॥'

২৮। অথান্তর = বিপদ, জঞ্জাল।

'আমি যদি জানি হৈব এমত অথান্তর।
তবে কেন ছাড়ি আসিতাম নিজ ঘর।'

প্রাচীন সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। কোন কোন স্থলে 'অন্যথা' অর্থেও ইহার প্রয়োগ দেখিয়াছি। যেমন—

'নিশ্চয় কহিল আমি নহে অথান্তর।'
কৃষ্ণরাম দত্তের 'রাধিকামঙ্গল।'

২৯। নিমেখে = নিমেষ ত্যাগ করে।

'রূপ দেখিয়া কেহ না নিমেখে আঁখি।
কেহ বোলে এইরূপ নিশিদিশি দেখি॥'

তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মাইকেলই এইরূপ ক্রিয়ার একমাত্র উদ্ভাবয়িতা নহেন।

৩০। আড়েগোরে = নিভৃতে, অলক্ষ্যে।

'গুরুজন ভয়ে যেই আসিতে না পারে।
আড়েগোরে থাকিয়া কৃষ্ণের মুখ চাহে॥'

চট্টগ্রামে অদ্যাপি এই শব্দ প্রচলিত।

৩১। পোঝা = বোঝা। এতদঞ্চলে ঠিক এইরূপ প্রয়োগ হয়। 'পুঞ্জ' শব্দের সহিত সাদৃশ্য।

'পোঝা বান্ধি সব শিষ্যে মস্তকে করিয়া।
চলিতে সময় মেঘে বরিষে আসিয়া॥'

'চলিতে সময়'—'চলিবার সময়'; এ আর এক বিশেষত্ব নহে কি?

৩২। কৃত্যা = (সম্ভবতঃ) কপটতা।

'শিশুকাল হোতে হরে পরের রমণী।
কৃত্যা করি বড় বড় রাজায় হরে প্রাণি॥'

কবিবর দৌলত কাজীও এই অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে বলা উচিত, 'কৃ' এই বর্ণটি প্রাচীনকালে 'হ্ন' এইরূপ লেখা হইত। আরও একটি অক্ষর ছিল, তাহাও এখন নাই। যেমন, 'আড়ি' লিখিতে আমরা 'ড়' লিখি, তখন 'আড্রি' লেখা হইত। এই সব উঠিয়া গেল কেন?

৩৩। 'সমাধান' শব্দ এখন কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, সকলেই জানেন; নিম্নের বাক্যে কি অর্থ অনুসৃত হইয়াছে, বিচার করুন—

'গাভী দোহাএ কেহো দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোন জনে॥'

৩৪। 'দোসরি মোহরি' কি? কোন কোন গ্রন্থে 'দোহরি মোহরি' দেখিয়াছি।

'যুদ্ধ জিনি দুই ভাই আইলা মধুপরী।
নানাবিধি বাদ্য বাজে দোসরি মোহরি॥'

৩৫। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে 'পাষণ্ডি', 'থোপনা', 'চাক ভাঁয়রি' 'আগলি' এবং 'ধামলী' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখুন।

(ক) প্রেতভূত সঙ্গে ভ্রম পাষণ্ডির ভেশে (বেশে?)।
ব্রাহ্মণ আসিয়া কেনে করহ পরশে?

(খ) 'ফটিকের স্তম্ভ বৈদূর্য্য আঙ্গিনা।
প্রবাল মাণিক্য মুক্তা পাটের থোপনা॥'

(গ) 'ধরিয়া পাকাএ কৃষ্ণ চাক ভাঁয়রি।'

অর্থাৎ 'চাকা ঘুরিবার মত', এই অর্থ?

(ঘ) 'সোহাগে আগলি হইল জানিল সতিনী।'

(ঙ) 'হাস পরিহাসে লোকা বাহে বনমালী।
থাকিয়া থাকিয়া বরাই গাহএ ধামালী॥'

'ধামালী'র অর্থ 'গীত' নহে কি? এই শব্দের অনেক প্রয়োগ আমরা দেখিয়াছি। ধামারী, ধামাই, ঢামারি, ধাবাই ইত্যাদিরূপেও ইহার প্রয়োগ

আছে। 'ধামাল' নামে একটি 'তাল'ও আছে। ইতিপূর্ব্বে* আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

এই গ্রন্থে আরও অনেকগুলি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহাদের প্রয়োগ একরূপ সাধারণ বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। অনেকগুলি এখনও লৌকিক ভাষায় প্রচলিত আছে। আমরা সেই শব্দগুলির এখানে নাম করিয়া যাইতেছি—

লড়ি = লড়ি বা লাঠি, মেলানি = বিদায়, লেউটিয়া = ফিরিয়া, পিঁড়ি = (বসিবার আসন বিশেষ), বারি = (মারিবার দণ্ড বিশেষ), সাঁচোর = সাঁতার, গছাইয়া = গচ্ছিত করিয়া, ফাল = লাফ, খাটিল = মুদ্রিত করিল, ফাঁফর = ব্যাকুল, খাঁথার = কলঙ্ক, মোহর = মোর, আমার; নিয়রে = নিকটে, পেলাইয়া = ফেলাইয়া, গোবিন্দাই = গোবিন্দ যতিরক্ষার খাতিরে নিরর্থক সম্প্রসারণ মাত্র। 'মোহর', তোহর ইত্যাদি শব্দও এইহেতু গঠিত। কোয়র = কোঙর বা কুমার। উল্লিখিত প্রায় শব্দগুলিই এখনও এই সকল অর্থে কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যসুলভ আর আর সব বিশেষত্বগুলি এই কাব্যে দৃষ্ট হইবে। উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া, কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী, উত্তম পুরুষের ক্রিয়া স্থলে, থাইমু, বলিমু (কখনও বা 'বলব'), পলাইলুম বা পলাইলু, নাম পুরুষে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া প্রভৃতির প্রয়োগ সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হইবে। এখন অনুজ্ঞায় আমরা 'করিও' লিখি; প্রাচীনকালে 'করিয়', 'করিঅ' (ক্বচিৎ 'করিও') লিখিত হইত। এই উভয় অকারের 'ও'কারে পরিণতি লক্ষ্য করার বিষয় বটে। অধুনা কোন কোন লেখক 'করিয়ো' ইত্যাদিরূপও লিখিতেছেন; দেখিতেছি। অসমাপিকা ক্রিয়া সকল 'আ' এবং 'য়া' উভয় দ্বারাই লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে 'আ' একবারে উঠিয়া গিয়াছে।

উপসংহারকালে আমাদের প্রিয় প্রাচীন সাহিত্যসেবকদিগকে কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অধুনা প্রাচীন সাহিত্যের পুঁথিগুলির প্রতি অনেক মহাত্মার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে; 'পরিষৎ সভা' দ্বিমাসিক

*পূর্ণিমা ৮ম বর্ষ ১৩০৭, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'সাহিত্য সম্বাদ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পত্রাকারে প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সকলই অতি আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কথা এই যে, প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার কিরূপে হওয়া উচিত? অবিকল হওয়া উচিত? না সংশোধন হওয়া উচিত? দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের প্রস্তাব বিশদ করিতেছি।

জএ জএ শব্দ হইল নন্দের নিলএ।
বৃদ্ধকালে পুত্র হইল নন্দের ঘরএ॥

ইহা অবিকল রাখা আবশ্যক কি না?

শ্রীআবদুল করিম।

হিংসার পরিণাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেন্দ্র বাবু কহিলেন,—"তবে কি নিশ্চয় যাইবেন?"

আমোদিনী কহিলেন,—"হাঁ, নিশ্চয় যাইব। এখন এখানে আপনার ও আপনার স্ত্রী রত্নাবলীর অন্নদাস হইয়া থাকিতে পারিব না। একদিন, যে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলাম, এখন দাসীভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া সে গৃহে বাস করিবার সামর্থ্য আমার নাই।"

ব্রজেন্দ্র। আমার গৃহে, আমার বা আমার স্ত্রী রত্নাবলীর দাসী হইয়া থাকিবেন কেন? এতদিন যেমন এ গৃহে গৃহলক্ষ্মী ছিলেন—সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, এখনও তাহাই থাকিবেন।

আমোদিনী। এখন এ সংসারে গৃহকর্ত্রীও যা, অন্নদাসও তাহাই। বিষ্ণুবল্লভ বাবুও একদিন তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে তাহাই বলিয়াছিলেন; শেষ, দু'বছর যে'তে না যে'তে, দুটী অন্নের জন্য অনাথিনী শিশুপুত্র লইয়া কতই না কাঁদিয়াছেন!

ব্রজেন্দ্র। আমাকেও কি তবে বিষ্ণুবল্লভ বাবু বলে করিলেন? কথা কয়টি বলিতে ব্রজেন্দ্র বাবুর চ'খে জল আসিল।

আমোদিনী। দয় কি? পুরুষ জাতকে বিশ্বাস কি?

ব্রজেন্দ্র। আজ একাদিক্রমে পনেরো বৎসর আমায় দেখিয়া আসিতেছেন; এই দীর্ঘকাল পরে আমার সম্বন্ধে আপনার কি এই ধারণা জন্মিল?

আমোদিনী। এ দশ বৎসর আপনার ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, সেই উপার্জ্জন করিতেন; সুতরাং অসদ্ভাবের কোনই কারণ ছিল না। ইচ্ছায়

ব্রজেন্দ্র। আর এখন।

আমোদিনী। এখন তিনি নাই, তাঁর সে উপার্জ্জন নাই। তখন আপনার যে, আর সে ভয় বা সঙ্কোচ আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি?

ব্রজেন্দ্র। আছে কি না একবার তাহার তো পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য?

আমোদিনী। যদি, আপনার হতভাগিনী ভ্রাতৃবধূ ও তাহার ভাগ্যহীন শিশুপুত্রের প্রতি, আপনার এতই স্নেহ থাকে, আর যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাস মাস তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিবেন এবং তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব, তাহাদের প্রতি আপনার যথেষ্ট স্নেহ আছে।

ব্রজেন্দ্র। তবে নিশ্চয় যাইবেন।

আমোদিনী। হাঁ, নিশ্চয়, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ব্রজেন্দ্র। যাইবার পূর্ব্বে একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না কি?

আমোদিনী। ভাবিয়া দেখিয়াছি। যে দিন বিধবা হইয়াছি, সেই দিন হইতে, আজি এই দীর্ঘ দুই মাস দিবারাত্রি কেবল ভাবিয়াছি; ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, যে পর্য্যন্ত প্রমোদকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্তি না হয়, যে পর্য্যন্ত সে উপার্জ্জনক্ষম না হয়, সে পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে বাস করাই আমার কর্ত্তব্য।

এবার ব্রজেন্দ্র বাবু আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অগ্রভাগে আপনার অশ্রু-পরিপ্লাবিত নয়নধারা মার্জ্জনা করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তবে তাহাই হউক; আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে আপনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাহাই করিবেন। তবে বিদায়কালে আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা, প্রমোদকৃষ্ণকে মানুষ করিয়া, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দাদার পুত্র বলিয়া পরিচিত করিবেন। আর প্রার্থনা, দৈনিক একখানি করিয়া পত্র লিখিবেন। আপনি দৈনিক যেমন শিবপূজা করিয়া থাকেন,—দৈনিক শিবপূজা আপনার যেমন একটা কর্ত্তব্য কাজ,—আমাকে দৈনিক একখানা পত্র লেখাও তেমনি কর্ত্তব্য মনে করিবেন। ইহা ছাড়া, আপনার নিকট আমার আর দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই।

TORN PAGES.

পত্রী আমি,—আমিও যত সত্বর পারি ভাগলপুরের বাস উঠাইতেছি; সকলই এ শ্মশানক্ষেত্রে আর বাস করিব না,—করিতে পারিব না।” এই পাগল বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজেন্দ্র বাবু আমোদিনীর চরণবন্দনা করিলেন; তারপর একবার,—জীবনে শেষ একবার প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমোদকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন, অশ্রুপূর্ণ দীন নয়নে হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ ভরে একবার একবার করিয়া কতবার শিশুর মুখ চুম্বন করিলেন; তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুকে তাহার মা’র ক্রোড়ে দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার শয্যায় যাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া অতীতের সেই সুখ-স্মৃতি স্মরণ করিয়া নীরবে আপন মনে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। এদিকে, সেই মুহূর্ত্তে আমোদিনী পুত্র প্রমোদকৃষ্ণকে লইয়া, পিতা রাধা-গোবিন্দ মুখুয্যা মহাশয়ের সহিত পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগলপুরের বাঙ্গালী পল্লীতে এক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেন,—কৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনাথ বাবু ভাগলপুরে ওকালতি করিয়া মাস মাস বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু, হঠাৎ আজ দুই মাস হইল, সন্ন্যাসরোগে তিনি ইহসংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ বাবু ওকালতি করিয়া, জীবনে প্রচুর উপার্জ্জন করিলেও, একমাত্র অমিত-ব্যয়িতার ফলে, মরিবার সময়, স্ত্রীপুত্রের জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে কৃষ্ণনাথ বাবুর বিশ্বাস ছিল যে তিনি এতদিন বড় যত্নে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া, আপনার কনিষ্ঠ সহোদর ব্রজেন্দ্রনাথকে মানুষ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া উপার্জ্জনক্ষম করিয়া রাখিয়া গেলেন; সুতরাং তাঁহার অভাবে তাঁহার মুন্সেফ্ ভ্রাতা তাঁহার শিশুপুত্র ও অনাথা বিধবা স্ত্রীকে অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন; ব্রজেন্দ্র বাবুও করিতেন। কিন্তু, হঠাৎ স্বামী বিয়োগের পর, আমোদিনী এই দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া নিভৃতে আপনার মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কি বুঝিলেন—কি ভাবিলেন বলিতে পারি না; তবে দুই মাস পরে, যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন; তখন দেবরের শত অনুরোধ—শত উপদেশ উপেক্ষা করিয়া, আমোদিনী স্বামীর

পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি পাঁচ সহস্র মুদ্রায় দেবরের নিকট বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও পুত্র প্রমোদকৃষ্ণকে লইয়া পিত্রালয়ে বাস করিবার ইচ্ছায় পিতার সঙ্গে পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন।

আমোদিনীর পিত্রালয়ে যাইবার দুই দিন পরে ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহার পত্নী রত্নাবলীকে একখানি পত্র লিখিলেন। ইতি পূর্ব্বে, কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর দেড় মাস পরে, হঠাৎ মা’র পীড়ার সংবাদে মা’কে দেখিবার জন্য, রত্নাবলী আপনার শিশুপুত্র সুশীলকৃষ্ণকে লইয়া তাঁহার পিতার কার্য্যস্থান কানপুরে গিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু রত্নাবলীকে লিখিলেন—

স্নেহের রত্ন!

ইতিপূর্ব্বে তোমার পত্র পাইয়াছিলাম। দুই একদিন মধ্যে তোমাকে আনিতে যাইতাম, পাঁচ দিনের বিদায়ও পাইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি তোমার আসা হইতেছে না; আপাততঃ কিছুদিন পিত্রালয়েই বাস কর। গত পরশ্বদিন, জানি না, কেন, কি ভাবিয়া বউঠাকুরাণী শ্রীমান্ প্রমোদ-কৃষ্ণকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়াছেন। কিসে কি হইল বুঝিলাম না। তবে, শুনিলাম, যতদিন প্রমোদকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, যতদিন উপার্জ্জনক্ষম না হয়, ততদিন তিনি পিত্রালয়েই বাস করিবেন। এখানে আমার ও তোমার অন্নদাস হইয়া বাস করিতে পারিবেন না। আমি কত অনুনয়-বিনয় করিলাম, কত অনুরোধ করিলাম, কত উপদেশ দিলাম; কিন্তু স্ত্রীসুলভ চপলতায় তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কি করিব, উপায় নাই; কঠিন পাষাণের ন্যায় সবই আমাকে সহ্য করিতে হইবে। তবে শ্রীমান্ প্রমোদকৃষ্ণের জন্য আমার চিত্ত বড় ব্যাকুল,—কাজকর্ম্ম কিছুই ভাল লাগিতেছে না। প্রমোদ যে আমার গলার মালা,—আজি এই দীর্ঘ চারি বৎসর যে প্রমোদকে চক্ষের আড়াল করি নাই,—আমি যে সুশীলের অপেক্ষায় প্রমোদকে অধিক ভালবাসি; সেও যে আমায় কাকা বলিয়া পাগল। কি করিব, আমি হতভাগ্য, নহিলে, আমার অদৃষ্টে বিধাতা এরূপ ব্যবস্থা করিবেন কেন? কি করিব, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। এখন ভালয় ভালয়, দাদার এই যৎসামান্য শেষ স্মৃতিচিহ্নখানি—এই প্রমোদকৃষ্ণ কুশলে থাকিলেই আমি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিব। আমার যেরূপ চিত্তগ্লানী উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তুমি আমার স্নেহের রত্ন! তুমি নিকটে থাকিলে

অনেকটা শান্তিতে থাকিতাম। কিন্তু, তাহা হইতেছে না। আমি আর এ শ্মশানে বাস করিতে পারি না; তাহাই স্থির করিয়াছি; আপাততঃ, তিন মাসের বিদায় লইয়া, একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া চিত্তের কতকটা প্রসন্নতা জন্মিলে, তারপর, একটা নূতন স্থানে বদ্‌লি হইয়া পরে তোমাদিগকে লইয়া আসিব। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন তুমি সুশীলকে লইয়া পিত্রালয়েই বাস কর। মধ্যে মধ্যে প্রেমপরিপূর্ণ পত্র লিখিয়া, আমার চিত্তের অপ্রসন্নতা দূর করিতে যত্ন করিও। আর অনুরোধ, শত অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, বউঠাকুরাণীকে পত্র লিখিয়া, তাঁহার প্রবৃত্তিস্রোত ফিরাইতে চেষ্টা করিও। অদ্য এই পর্য্যন্ত। ইতি

তোমারই
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ।

ব্রজেন্দ্র বাবু যে দিন রত্নাবলীকে পত্র লিখিলেন, ঠিক তাহার এক সপ্তাহ পরে জন্মশোধ ভাগলপুরের বাস উঠাইয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমোদিনী যথা সময়ে পিত্রালয়ে আসিলেন। আমোদিনীর পিতা রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যশোহরের কোন রাজা উপাধীধারী একজন জমিদারের ম্যানেজার। ম্যানেজারী করিয়া বেশ দুইদশ টাকা উপার্জ্জন করিতেন এবং দেশে মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট ছিল।

রাধাগোবিন্দ কন্যা দৌহিত্রকে লইয়া আপনার গৃহে আসিয়া এক সপ্তাহ কাটাইলেন; তারপর সপরিবারে কার্য্যস্থানে আসিলেন।

এদিকে ভাগলপুর ছাড়ার দিন হইতেই প্রমোদকৃষ্ণের সেই চির হাসি রাশি হঠাৎ কোথায় নিভিয়া গিয়া, শিশুর সেই সরল প্রফুল্ল মুখ বিষাদের কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিল। শিশুর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আমোদিনী ও তাঁহার মাতা প্রথম প্রথম ভাবিলেন যে, হঠাৎ দীর্ঘকাল পরে নূতন স্থানে ও নূতন লোকের মধ্যে আসিয়া শিশুর হাসিরাশি দূর হইয়াছে; কিন্তু দুইদশ দিন পরে, সকলের সহিত পরিচিত হইলে, আবার শিশুর মলিন মুখে স্বর্গের মোহন হাসি ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু, একদিন এক দিন করিয়া এক মাস কাটিল, কিন্তু শিশুর সেই বিষাদরাশি আর অপসারিত

হইল না,—হইবার আশা নাই। এইরূপে, আরও কয়দিন কাটিল; তারপর হঠাৎ, একদিন সন্ধ্যা হইতে কি একটা বায়না করিয়া শিশু কাঁদিতে লাগিল। শিশুর মা ও দিদিমা শিশুকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কত যত্ন ও কত চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই শিশুকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। শিশু আপনার মনে, আপনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া, দিদিমা'র ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। তখন শিশুর দিদিমা শিশুকে আপনার ক্রোড়ে শোয়াইয়া, স্নেহে শিশুর গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছিলেন—"ঘুম আয় রে আয়।"

শিশু অমনি অর্দ্ধমুদিত নয়নে, দিদিমা'র ক্রোড়ে শুইয়া শুইয়া, আপনার মনে দিদিমা'র সুরে সুর মিশাইয়া কহিতে লাগিল—

"কাকা আয় রে, আয়,
রত্ন আয় রে, আয়,
ভাইটী আয় রে, আয়।"

* * *

এইরূপে, আরও কয়দিন কাটিল। ভাগলপুর ছাড়ার প্রায় দেড় মাস পর, হঠাৎ প্রমোদকৃষ্ণের জ্বর হইল,—জ্বর বড় প্রবল। জ্বরের অজ্ঞানাবস্থায় শিশু আপনার মনে শুধু বলিত, "কাকা আয় রে, আয়, রত্ন আয় রে, আয়, ভাইটী আয় রে, আয়।" জ্বরের প্রথমাবস্থায় আধুনিক প্রথানুসারে প্রথম ডাক্তার বাবুর চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সরকারী ডাক্তার এম্, বি, ম্যানেজারের দৌহিত্র; সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। একুশদিন ধরিয়া, অতীব যত্নসহকারে চিকিৎসা করিয়াও, ডাক্তার বাবু কোন ফলই দেখাইতে পারিলেন না। এদিকে শিশুও দিন দিন শয্যার সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। প্রবল জ্বর—তাহার উপর সেই প্রলাপ। দিন নাই, রাত্রি নাই, শিশু রোগযন্ত্রণায় কখন হাসে, কখন কাঁদে; আবার কখন সুর ধরিয়া, "কাকা আয় রে, আয় ইত্যাদি বলে।

এইরূপে আরও কয়দিন গেল। এক মাসেও যখন ডাক্তারী চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফল ফলিল না, রোগের কিছুমাত্র উপসম হইল না; তখন ডাক্তার বাবু হার মানিয়া অন্যপথ দেখিতে উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। ডাক্তার

বাবুর উপদেশানুসারে আমোদিনীর পিতা, অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া বৈদ্য ডাকিলেন।

বৈদ্য আসিলেন। রাজসরকারের প্রাচীন চিকিৎসক পঞ্চানন গুপ্ত মহাশয় আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় আসিয়া প্রথমে মুখুয্যা মহাশয়ের বাচনিক রোগের মূল কারণ সব শুনিলেন; তারপর শিশুর পাশে আসিয়া বসিয়া, কাচের ভাঙ্গা চস্‌মাখানি নাকের উপর দিয়া, অতীব যত্ন সহকারে একবার শিশুকে দেখিলেন, তারপর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, চক্ষু জিহ্বা পরীক্ষা করিলেন; আবার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। এই প্রকার দীর্ঘকাল ধরিয়া কখন নাড়ী, কখন জিহ্বা, কখন চক্ষু পরীক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে চরক শুশ্রুতের বচন আওড়াইয়া অনেকক্ষণ অনেক প্রকারে পরীক্ষা করার পর আবার অপরাহ্ণে আসিব বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

* * *

আবার বৈকালে বৈদ্য আসিলেন। শিশুকে দেখিলেন। একবার একবার করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া শিশুকে দেখিলেন,—দেখিলেন যে, শিশুর অমন অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কোমল কমলকোরকের লাবণ্যরাশি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া, কেবলমাত্র অস্পষ্ট ছায়ায় পরিণত হইয়াছে। তারপর দেখিলেন শিশু দিদিমা'র ক্রোড়ে অর্দ্ধমুদিত নয়নে শুইয়া শুইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে অর্দ্ধ নিদ্রাজড়িত স্বরে, "কাকা আয় রে, আয়," ইত্যাদি বলিতেছে।

কবিরাজ মহাশয় শুনিলেন। শিশু একবার একবার করিয়া কতবার আপনার মনে আপনি ঐরূপ বলিল, তাহার সংখ্যা নাই। বালকের এই কয়েকটী কথা শুনিবার পর, কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করতলস্থ কপোলে আপনার মনে আপনি কি ভাবিলেন; তারপর, এই বিশ্বগণ্য ডাক্তারদের চিকিৎসার গুণপনা ভাবিয়া একটু ঈষৎ হাসি হাসিলেন; আবার পরক্ষণেই চিকিৎসার সময় অতীত হইয়াছে ভাবিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তারপর, আমোদিনীর পিতাকে কহিলেন, "মুখুয্যে মশাই, আপনার দৌহিত্রের রোগ নির্ণয় করিয়াছি; এখন একবার আপনার দুহিতাকে ডাকিয়া আনুন।"

কবিরাজের কথামত, আমোদিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "আপনাকে আমি যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি

কে একে তাহার উত্তর দিন।" এই বলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনার দেবর আছেন?"

আমোদিনী। আছেন।

চিকিৎসক। তিনি খোকাকে ভালবাসিতেন, কি?

আমোদিনী। হাঁ, ভালবাসিতেন। আমোদিনী বর্ত্তমানকালের কথা না বলিয়া অতীতকালের কথা কহিলেন।

বৈদ্য। কেমন, খুব ভালবাসিতেন?

আমোদিনী এবার ছোট গলায় কহিলেন, "হাঁ"।

বৈদ্য। আপনার দেবর পুত্রী আপনার যা', আপনার শিশুকে ভালবাসিতেন কি?

আমোদিনী। বাসিতেন।

বৈদ্য। তবে সেখান হইতে আসিলেন, কেন?

আমোদিনী। এখন সেখানে তাঁহাদের অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে বলিয়া।

বৈদ্য। কেন?

আমোদিনী। এতদিন তাঁহার ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, তিনি প্রচুর উপার্জ্জন করিতেন; সম্ভবতঃ তাঁহারই খাতিরে এতদিন ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন। এখন তিনি মৃত, আমি বিধবা অনাথা সুতরাং তেমন ভালবাসিবেন, তেমন ভক্তি করিবেন কি না, কেমন করিয়া বলিব?

কবিরাজ মহাশয় এবার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ভুল, আপনি বিশেষ ভুল বুঝিয়াছেন। প্রকৃত, যে ভালবাসা,—সে অকৃত্রিম ভালবাসা, শিশুর সরল হৃদয়ে যে অকৃত্রিম ভালবাসার দানা পড়িয়াছে, সেই অকৃত্রিম ভালবাসার মধ্যে কখন কৃত্রিমতা থাকে না,—থাকিতে পারে না। আর সেই পবিত্র ভালবাসা, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে সমভাবে থাকে।" এই বলিয়া চিকিৎসক চুপ করিয়া, আবার কি ভাবিতে লাগিলেন।

কবিরাজকে চুপ করিতে দেখিয়া, আমোদিনী মলিন মুখে কহিলেন, তবে, এখন কি করিতে হইবে, বলুন।

বৈদ্য। বলি। রত্ন কে?

আমোদিনী। রত্ন—রত্নাবলী আমার যা', (দেবরপত্নী)।

বৈদ্য। তাঁহাকে খুড়িমা বা কাকিমা না বলিয়া, রত্ন বলিয়া ডাকে কেন?

আমোদিনী। আমি বয়ঃকনিষ্ঠা বলিয়া স্নেহ করিয়া তাহাকে রত্ন বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছিলাম, সেই সূত্রে খোকাও তাহাকে রত্ন বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে।

বৈদ্য। তাঁহার প্রকৃতি কেমন ছিল?

আমোদিনী। পূর্ব্বে ভালই ছিল।

বৈদ্য। আর এখন?

আমোদিনী। জানি না।

আমোদিনীকে প্রশ্ন সমাপন করিয়া, চিকিৎসক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে আপনার মনে আকাশপাতাল কত কি ভাবিলেন। তারপর স্নেহপূর্ণ মধুর স্বরে ধীরে ধীরে আমোদিনীকে কহিলেন, "মা, আপনি বুদ্ধিমতী হ'য়ে, এতদূর নির্ব্বোধের কার্য্য করিলেন কেন? শিশুর সরল হৃদয়ে, তাহার স্নেহময় খুড়া ও স্নেহময়ী খুড়িমা এবং স্নেহাস্পদ ছোট ভাইটী,—ইহাদের বিচ্ছেদে শিশুর হৃদয়ে যে বড় একটা আঘাত লাগিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। এখন এই রোগ হইতে শিশুকে রোগমুক্ত করিতে হইলে, শিশুকে তাহার খুড়া, খুড়িমা ও ছোট ভাইটীর নিকট রাখিতে হইবে; নতুবা এ রোগে আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা অতি অল্প। আর যেই সাক্ষাৎ যত সত্বর হয়, শিশুর জীবনের পক্ষে ততই শুভ; নতুবা সময় অতীত হইলে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশি। একে তো সময় অতীত হইয়াছে, তাহাতে আবার শিশু যেমন দিন দিন শীর্ণ হইতেছে, তাহাতে আমার উপদেশানুসারে না চলিলে, পরিণামে আক্ষেপ করিতে হইবে।" এই বলিয়া গোটাচারি ঔষধের বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, কবিরাজ মহাশয় সে দিনকারমত বিদায় হইলেন।

সহসা কবিরাজের কথা শুনিয়া আমোদিনীর হৃদয় ভবিষ্যৎ বিপদ্‌পাতের আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কবিরাজ মহাশয় বিদায় হইলে পর, সেই দিন রাত্রিতে নিভৃতে বসিয়া অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমোদিনী দেবরকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিলেন—

ঠাকুরপো!

ক'দিন আপনার পত্র পাই নাই,—আমিও পত্র লিখি নাই, ইচ্ছা করিয়াই লিখি নাই। যাহাহউক, আপনার হিত কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাপেরবাড়ী আসিয়াছিলাম; এখন সেই পাপের ফলে, বুঝি আমি আমার প্রমোদকে জনমের মত হারাই। আজি এক মাস হ'তে প্রমোদ জ্বরে কাতর,—শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এতদিন ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু কিছুমাত্র ফল পাই নাই, বরং দিন দিনই অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, অদ্য বাবা, কবিরাজ মহাশয়কে আনাইয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় প্রাতে আসিয়া একবার দীর্ঘকাল রোগীকে দেখিয়া দেখিয়া, শেষ বৈকালে আসিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন। আবার বৈকালে আসিয়াছিলেন। প্রায় এক প্রহর ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রমোদকৃষ্ণকে দেখিলেন। তন্দ্রাভরে এতদিন প্রমোদকৃষ্ণ সতত বলিত, "কাকা আয় রে, আয়, রত্ন আয় রে, আয়, ভাইটী আয় রে, আয়।" কবিরাজ মহাশয়ের আসিবার পরও দুই চারিবার প্রমোদকৃষ্ণ এই কথাগুলিন বলিয়াছিল। কবিরাজ শিশুর এই কথাগুলিন একমনে শুনিয়া শুনিয়া, আপনার মনে কত কি ভাবিলেন; তারপর, তিনি আপনার ও রত্নের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন আমাকে করিলেন। তারপর, আমার প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া, আমায় কহিলেন, "শিশুর এই রোগের ঔষধ নাই। তবে যত সত্বর শিশুকে তাহার খুড়া ও খুড়িমা এবং ছোট ভাইটীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ততই মঙ্গল; নতুবা সুফলের আশা খুব কম।" একদিন, আমি আপনার সরল হৃদয়ে কঠিন আঘাত করিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হয়, সেই পাপেরই এই কঠিন—কঠিনতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে,—হইবে। আমি যতদূর জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস প্রমোদকে আর বাঁচাইতে পারিলাম না। ভগবান্ মার পাপে শিশুকে গ্রাস করিতে বসিয়াছেন। স্নেহের ঠাকুরপো! আমি পরস্ত্রীকাতরা

বুদ্ধিহীনা অবলা, বুঝি নাই, না বুঝিয়া আপনার নিকট শত অপরাধে অপরাধিনী। এখন আপনি আপনার এই কুলক্ষয়কারিণী বউঠাকুরাণীর শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই পত্র পাঠমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া রত্ন ও সুশীলকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিবেন। দেখিবেন, আমার জীর্ণবক্ষে আর ছুরি মারিবেন না। এবার হইতে, আমি আপনার বা রত্নের—কাহারো অমতে কোন কার্য্য করিব না। অধিক আর কি লিখিব, যাহাতে আপনার স্নেহের প্রমোদকে বাঁচাইতে পারেন, তাহারই উপায় করিবেন। ইতি

উন্মাদিনী

আমোদিনী।

যেদিন আমোদিনী ব্রজেন্দ্র বাবুকে পত্র লিখিলেন, তাহার পরদিন ব্রজেন্দ্র বাবুর স্ত্রী রত্নাবলীর একখানি পত্র তাহার হস্তগত হইল। রত্নাবলী পত্রে লিখিয়াছেন—

দিদি!

আপনার রত্নের শত সহস্র প্রণাম জানিবেন—ক'খান পত্র লিখিলাম; কিন্তু, আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ একখানিরও উত্তর পাইলাম না। আপনার শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছি, জানি না। যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, ছোট ভগ্নি বলিয়া, আপনার রত্নের সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া পত্র লিখিবেন। ক'দিন শ্রীমান্ প্রমোদকৃষ্ণকে দেখি নাই, তাহার সংবাদও পাই নাই; তারপর গত রজনীতে তাহার সম্বন্ধে একটা বিকট দুঃসপ্ন দেখিয়া, আমার চিত্ত বড় খারাপ হইয়াছে। তা'ই আপনার নিকট আপনার স্নেহের রত্নের শত অনুরোধ—শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমানের কুশল সংবাদে চিন্তা দূর করিবেন। আজি দীর্ঘ সাত বৎসরের ভালবাসা কি এত অল্পদিন—অল্পকারণে ছিন্ন করিলেন? কোন্ অপরাধে? যদি অপরাধ দেখিয়া থাকেন, ছোট ভগ্নীর সে অপরাধ উপদেশ দিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন? আমি চিরদিনই তো আপনার শ্রীচরণের দাসী ও সেবিকা, দাসীর শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া পত্র লিখিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

আপনার দাসী,

সেবিকা শ্রীরত্ন—

রত্নাবলীর স্নেহপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ পত্র পড়িয়া, আমোদিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমোদিনী রত্নাবলীর পত্র পাঠান্তে তখনই সংক্ষেপে পত্রের উত্তর দিলেন। পত্রে লিখিলেন—

স্নেহের রত্ন! এইমাত্র তোমার পত্র পাইলাম। রত্ন—ভগ্নি! তোমার দোষ নাই, সব দোষই আমার। আমি স্ত্রীসুলভ বুদ্ধির দোষে বুঝিতে না পারিয়া, নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতে বসিয়াছি। ভাগলপুর পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমান্ প্রমোদকৃষ্ণের সতত হাসিমাখা মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছিল; তারপর, আজি এক মাস অতীত হইয়াছে, প্রমোদকৃষ্ণ কাতর, বাঁচিবার আশা নাই। যেদিন জ্বর হইয়াছে, সেইদিন হইতে মুখে কেবল, "কাকা আয় রে, আয়, রত্ন আয় রে, আয়, ভাইটী আয় রে, আয়", কথা। অন্য কথা নাই। এতদিন ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছু মাত্র ফল হয় নাই, বরং দিন দিন শয্যার সহিত মিলাইয়া যাইতেছিল। দু'দিন হ'তে কবিরাজ মহাশয় দেখিতেছেন। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া এবং প্রমোদের কথা শুনিয়া, ঠাকুরপো, তুমি ও শ্রীমান্ সুশীলকে দেখিবার জন্য আনিতে উপদেশ করিলেন। প্রমোদ যদি বাঁচে, তবে তোমাদিগকে দেখিলেই বাঁচিবে; নহিলে তাহার জীবন রক্ষার আর কোনও আশা নাই। ঠাকুরপোকে তোমাদিগকে সহকারে আসিবার জন্য লিখিয়াছি। তুমি এতদিন যে, পিত্রালয়ে আছ, ভাবি নাই। যাহাহউক, স্নেহের রত্ন! তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমার হতভাগিনী দিদির একমাত্র প্রার্থনা, পত্র পাঠ তোমার দাদাকে সঙ্গে করিয়া, আসিও,—আসিয়া একবার তোমার স্নেহের প্রমোদকে স্নেহের চক্ষে দেখিও। এবার, তুমি আসিলে, আর কখনও ঠাকুরপো বা তুমি—তোমাদের অমতে কোন কাজ করিব না। এখন যাহা ভাল হয় করিও; তবে দেখিও দিদি, তোমার হতভাগিনীর গলায় ছুরি বসাইও না। ইতি

তোমার অভাগিনী দিদি

আমোদিনী।

* * *

ক'দিন কাটিয়া গেল। ব্রজেন্দ্র বাবুর পত্রের উত্তর আসিল না, ব্রজেন্দ্র বাবুও আসিলেন না। এদিকে, দিন দিন মৃত্যুর করালছায়া আসিয়া শিশুর

সেই আনন্দজ্যোতি-তুল্য মুখমণ্ডল মলিন করিয়া দিল। শেষ, আমোদিনী নিরুপায় হইয়া, আবার দুইখানি পত্র লিখিলেন, একখানি ব্রজেন্দ্র বাবুকে, দ্বিতীয়খানি রত্নাবলীকে। ব্রজেন্দ্র বাবুকে লিখিলেন—

ঠাকুরপো!

একবার আসিবেন। আপনার বিচ্ছেদে, আপনার আদরের প্রমোদ-কৃষ্ণ মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে। শত অনুরোধ, শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, শত দোষ ভুলিয়া একবার আসিবেন। ইতি

অভাগিনী
আমোদিনী।

রত্নাবলীকে লিখিলেন—

রত্ন! ভগ্নি! গত বুধবার পত্র লিখিয়াছি, বোধ হয়, পাইয়াছ। একবার আসিও, শ্রীমান্ সুশীলকে সঙ্গে করিয়া, একবার আসিও। দিদি! আসিয়া একবার স্নেহের চক্ষে প্রমোদকে দেখিয়া যাইও, অন্য প্রার্থনা আর নাই। ইতি

তোমার
আমোদিনী।

* * *

পত্র লেখার পরদিন টেলিগ্রাম আসিল,—টেলিগ্রাম আসিল কানপুর হইতে। টেলিগ্রাম রত্নাবলী করিয়াছিলেন। টেলিগ্রামের মর্ম্ম, "আমি অদ্য দশটার সময় সুশীলকে লইয়া কানপুর ছাড়িলাম। ভয় করিবেন না, ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাঁহারই আশ্রয় লইবেন। আমার স্বামী তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়া পঞ্চবটীতে আছেন। তাঁহাকে সত্বর, আইসার জন্য দ্রুত টেলিগ্রাম করিলাম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিন বুঝি আর কাটে না, প্রমোদকৃষ্ণের জীবনও বুঝি আর রক্ষা হয় না। যেদিন রত্নাবলীর নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল; সেইদিন রাত্রি শেষ হইতে শিশুর বিকার লক্ষণ দেখা দিল। বিকার প্রাপ্ত হইয়া, শিশু কেবল, "কাকা আয় রে, আয়, রত্ন আয় রে, আয়, ভাইটী আয় রে, আয়।" ঘন ঘন বলিতে লাগিল। আবার কখন বা বিকারমুখে, "ঐ কাকা এল" "ঐ রত্ন এল" "ঐ ভাইটী এল", বলিয়া সময়ে সময়ে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিত।

একমাত্র পুত্র—অভাগিনী বিধবার স্বামীর পরিত্যক্ত শেষ স্মৃতিচিহ্ন শিশুপুত্রের অবস্থা দেখিয়া, আমোদিনীর বুকের রক্ত পলে পলে শুখাইতেছিল। আর সেই সঙ্গে উন্মাদিনীর বদনে বিষাদের ঘন কৃষ্ণকালিমা রেখায় আচ্ছন্ন হইতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আত্মগ্লানী,—আমোদিনী নিজেই যে প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন! হায়! অভাগিনী নিজে ইচ্ছা করিয়াই, আপনার বুকে আপনিই বিষ শেল বিদ্ধ করিয়াছেন; এখন আর উপায় নাই, আশা নাই—প্রমোদ-কৃষ্ণের জীবন রক্ষার আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাই আমোদিনী ভগ্ন-হৃদয়ে নীরবে মরণাহত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। আর মনে মনে, ভাগলপুর পরিত্যাগের দিন, বিদায়ের দিন দেবর ব্রজেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, এখন কেবল তাহাই ভাবিতেছিলেন; আর এক একবার অশ্রুমোচনে হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার লাঘব করিতে চাহিতেছিলেন; কিন্তু, হায়, বিধাতা সে সাধেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেদিনও গেল। শিশু সমভাব; হ্রাস নাই, বরং বৃদ্ধি। আর সময়ে অসময়ে ক্ষীণকণ্ঠে সেই একমাত্র রব, "কাকা", "রত্ন", "ভাইটী"।

পরদিনও গেল। তারপরদিন অপরাহ্নে রত্নাবলী সুশীলকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্নাবলীকে পাইয়া, আমোদিনীর নয়নের বাঁধ খুলিয়া গেল। উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, আমোদিনী রত্নাবলীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "রত্ন—দিদি, আমার সর্ব্বনাশ আমি করিয়াছি, প্রমোদকে আমি মারিলাম,—এখন উপায় কি? আমার প্রমোদ আমায় ছেড়ে যায়! হায়! ঠাকুরপোর কথা শুনিলে, আমার এ দুর্দ্দশা হইত না"; এই বলিয়া শিশুহারা বনকপোতীর ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে রত্নাবলীও কাঁদিতে কাঁদিতে, "বাবা,

প্রমোদ, তোর রত্ন এ'সেছে" বলিয়া শিশুর বুকের উপর পতিত হইয়া, স্নেহভরে বার বার শিশুর মরণক্লিষ্ট বদনে চুম্বন করিতে লাগিলেন।

এবার রত্নাবলীর কাতর ক্রন্দনে ও স্নেহপরিপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বরে, হঠাৎ শিশু একবার নয়ন মেলিল। তারপর, কোটরগত নয়ন মেলিয়া, একবার রত্নাবলীর বদন প্রতি বিস্ফারিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিল; সেই ক্ষীণ মলিন আননে অল্প—অতি অল্প ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল, "রত্ন, আমার কাকা কৈ?" আরও কি বলিতে যাইতেছিল,—হরি! হরি!! পারিল না। হঠাৎ কুসুম-কোরক প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই, অভাগিনী বিধবা মা'র বুকে বিনামেঘে অশনিপাত করিয়া, চির দিনের জন্য ক্রোড় শূন্য করিয়া, অকালে স্বর্ণকুসুম কি জানি কোন অজানিত দেশে চলিয়া গেল,—কাকার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কাতর ক্রন্দন ধ্বনি পড়িয়া গেল এবং সহসা আমোদিনী বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

চাঁদের কথা।

হিন্দুর কাছে চাঁদের ভারি খাতির; কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত কি জ্যোতিষ কিছুতেই চাঁদ বাদ দিয়া নড়িবার উপায় নাই। যিনি জ্যোতির্ব্বিদের সাক্ষী, যিনি কবির অলঙ্কার ও উপমার স্থল, যিনি প্রিয়া বদনের স্মৃতি আনেন বা কখন অহঙ্কারী কবির হাতে পড়িয়া পদনখে মর্য্যাদা মাত্র প্রাপ্ত হন, যিনি গ্রহাচার্য্যের লগ্নস্থল, যিনি পূর্ণিমা অমাবস্যা দুই মূর্ত্তিতে সাধকের মনোরঞ্জন করেন, যিনি পুত্র কন্যার নামের সহিত যুক্ত হইয়াই গৃহিণীর নিকট নিস্তার পান না অপিচ ক্ষীরের পুলির আকার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বাধ্য হন, যিনি তিথি বিশেষে নদী বিশেষে মাঝি মাল্লার ভয়ের স্থল, যিনি বিশেষ বিশেষ রোগের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিজে রোগ বিশেষে ভুগিয়াছেন, সেই শশাঙ্কের নূতন করিয়া আর কি পরিচয় দিব। পূর্ণিমার তুলনা

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥"

এ কথা না তোলাই ভাল, বিশেষ যখন শশাঙ্কশেখর এক কলা ললাটে ধারণ করিয়া আছেন। আমরা আর্দ্রকের ব্যাপারী, আমাদের অর্ণবজানের সংবাদ রাখিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের "লক্ষ্মোদিয়া চান্দ্রমসীব লেখা"য় কাজ নাই। কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের পাশে চাঁদবদনী দাঁড়াল—আমাদের এই ভাল। এই-ই ভাল, এতদিন ছিল কিন্তু আর থাকে না। বিংশ শতাব্দীর কঠিন বিজ্ঞান চন্দ্র, উপমা, অলঙ্কার, কৌমুদী, প্রিয়ামুখ বা প্রিয়া-নখর সবই লৌহদন্তে চর্ব্বণ করিতে বসিয়াছিল। সব মৃত্তিকা হইবার উপক্রম, যায় যায় এমন সময় নাকি একটা আশার কথা উঠিয়াছে, তাই দুকথা বলিব মনে করিয়াছি। কিন্তু আজিকার কথায় চাঁদবদনীরা সুখ পাইবেন না অথবা পাইবেন কি না জানি না, তাহাতে আবার অ-চাঁদবদনী-দের সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে তাহাও ত বুদ্ধির মানরজ্জু মাপিয়া ইয়ত্তা করিতে পারিতেছি না। তাই যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং হিসাবে আমি প্রথমেই চাঁদবদনীদের (আরশি দিয়া দেখিয়া থাকুন আর না-ই থাকুন) আর অ-চাঁদ-বদনীদের (প্রিয়জন রসিকতা করিয়া থাকুন বা কন্দলস্থলে অপর কোন সাধ্বী দগ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকুন আর না-ই থাকুন) চরণের রেণু চাহিয়া চিত্তচাঞ্চল্য চিরনির্ব্বাসিত করিতেছি। চাষা বলিয়া চরণাঘাত করিলেও চেঁচাইব না। চিনিব যে চামুণ্ডা এই চণ্ডমুণ্ডকে চিরদিন মা বলিয়া ডাকিতে দিবেন, এ তাহারই চিহ্ন। অলমতি বিস্তরেণ কিন্তু, যে চন্দ্রের চন্দ্রালোকে চন্দ্রশেখরের বা কমলাকান্তের দপ্তরের জন্ম হয়, সে চন্দ্রালোক বন্ধ্যা নহে—অমাবস্যার দিনেও নহে, কত কি প্রসব করিতে পারে।

যখন শুনিলাম চন্দ্র আর শুধু নবগ্রহ নহেন, উপগ্রহ হইয়াছেন, তখন আর সাহিত্য চর্চ্চার আশা করি নাই। যখন শুনিলাম চন্দ্রে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কিছু নাই, কিছু নাই,—কেবল মরু, এমন কি জলটি বাতাসটি পর্য্যন্ত নাই, তখন আর প্রিয়ামুখের সহিত তুলনা করিবার সাহস রাখি নাই; কবিদের কাব্য ও কবিতা কর্ম্মনাশার কালজলে কবলিত হওয়াই উচিৎ মনে করিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম, চাঁদ কেবল দগ্ধমৃত্তিকা ও প্রস্তর স্তূপ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ সমস্ত বিহীন, তখন শ্মশানবাসী

চিতাভস্মলেপনকারী মহাদেবের ললাট-কলার সংলগ্নতা বুঝিয়াছিলাম বটে কিন্তু কোন্ সর্ব্বনেশে লোক শ্রীমতী রাধারাণীর বদনের সহিত সেই চাঁদের তুলনা করিতে প্রথমে সাহস পাইয়াছিল, তাঁহা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছিলাম। "মুখ খানা পূর্ণিমার শশী, তাহে মৃদু মৃদু হাসি হীরা শোভে চাঁচর কেশে বেণী"—যেন গালে এখনি চড় মারিতে আসিতেছে। চাঁদকে লইয়া যখন এইরূপ বিপদগ্রস্থ, তখন শুনিলাম, যা ভেবেছ তা নয়—things are not what they seem. তাই আমরা চাঁদের জয় দিতে অগ্রসর। চাঁদের জয়, প্রিয়া মুখের জয়, প্রিয়া নখরের জয়, কবির জয়, কবিতার জয়, কাব্যের জয়, মলয় পবনের জয়, বসন্তের জয়, বাসন্তী পূর্ণিমার জয়, পূর্ণিমার জয়, জয় জয়। সকলে একবার বল গো চাঁদের জয়। চোখবুজে একবার হৃদয় কমলে দেখ গো, "কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের পাশে চাঁদবদনী দাঁড়াল।"

আর রূপকে কাজ নাই, যখন জ্যোতির্ব্বিদের চমক ভাঙ্গিয়াছে। বৃদ্ধ সলোমন বলিয়াছেন—there is nothing new under the sun. জগতে কিছুই নূতন নাই। প্রাচীনতম জ্যোতির্ব্বিদ টোবিয়াস মেয়ার যখন দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন, তখন চন্দ্রে নদী ও সমুদ্র দেখিয়াছিলেন আর চাঁদের যে নক্সা তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাই নদী ও সমুদ্র আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিলেন চাঁদ মরুভূমি, জল নাই, বাতাস নাই, মেঘ নাই, বাষ্পার্ণব নাই, কিছু নাই কেবল আছে কতকগুলি আগ্নেয় গিরি ইত্যাদি। কাজেই মেয়ারের কথা চাপা পড়িয়া গেল, মেয়ার মূর্খ হইলেন। কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ সুখানি চ, আবার মেয়ারের দিন আসিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আবার ধীরে ধীরে মত ফিরিতেছে, এখন জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিতেছেন যে পৃথিবীর মত চাঁদে সব আছে—জল, বায়ু, বাষ্পার্ণব, মেঘ, বিদ্যুৎ, বরফ, উদ্ভিজ্জ। সুতরাং প্রাণী থাকাও অসম্ভব নহে। তাঁহা দূরবীক্ষণ সাহায্যে অনুমিত হইয়াছে, মেয়ার প্রদর্শিত সমুদ্র ও নদীতে এখন আর জল নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ বলিতেন, চাঁদে বাষ্পার্ণব নাই, কেন না কোন নক্ষত্রের দৃষ্টি চন্দ্রের কিনারা দ্বারা আবৃত হইলে বিকৃত দেখায় না, কিন্তু এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে কতকটা বিকৃত দেখায় বটে সুতরাং

পাতলা বাষ্পার্ণবও আছে। জ্যোতির্ব্বিদ আর্থার বেরী জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ পুস্তক লিখিয়াছেন—তাহার পর আর নূতন পুস্তক কেহ লেখেন নাই। বাষ্পার্ণব সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন শুনিবেন? "It is difficult to explain certain observations without assuming the existence of some atmosphere. চন্দ্রে কতকটা বাষ্পার্ণব আছে স্বীকার করিয়া না লইলে, চন্দ্রে যে সকল ব্যাপার দেখা যায়, কেন সে সকল দেখা যায়, তাহা বুঝান যায় না। তাই বেরী বলিয়াছেন, পাতলা বাষ্পার্ণব আছে।

বেরী বলিয়াছেন—চন্দ্রে যে সকল ব্যাপার দেখা যায় ইত্যাদি। কি ব্যাপার দেখা যায়? ফরাশিশ জ্যোতির্ব্বিদ শাঁর্ব্বো চন্দ্রে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছেন। চন্দ্রে আপীনাইন নামক একটি পর্ব্বতমালা আছে, তাহার এক প্রান্তে থিয়েটিটস্ নামক এক প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরির একটি গহ্বর হইতে কৃষ্ণধূম উত্থিত হইতে দেখিয়াছেন। সে বেশী দিনের কথা নহে, কয়েক মাস মাত্র গত হইয়াছে। ব্যাপার আরও আছে। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কেম্ব্রিজ নগরে হার্বার্দ্র কালেজ আছে। আচার্য্য পিকারীং এই কালেজের কর্ত্তা এবং একজন সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ। তিনি জামেকা দ্বীপের মণ্ডাবিলি সহরে গিয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে চন্দ্র দর্শন করিয়াছেন ও অনেক নূতন তথ্য অবগত হইয়াছেন, তিনি বলেন, চন্দ্রে বরফ আছে। প্রথমে শ্বেত উজ্জ্বল বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিয়া তিনি ফটোগ্রাফ লইতে আরম্ভ করেন। এইরূপ ফটো লইবার জন্য তিনি একটি বিশেষ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। চন্দ্রের একদিনে সূর্য্যের উদয় অস্তের মধ্যে পাঁচবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফটো লইয়াছেন। চন্দ্রের একদিন আমাদের ১৪ দিনের সমান। চন্দ্রের যে ভাগ আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সেই ভাগটিকে ১৬টি অংশে ভাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ফটো লইয়াছেন। এইরূপে ৮০খানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। তাহাতে অবশ্য জ্ঞাতব্য কোন কথাই জানিতে আর বাকি নাই। তাঁহাতে এই বুঝা যায় যে চন্দ্রে শ্বেতবর্ণ কোন পদার্থ আছে, তাহা সূর্য্যোত্তাপে কমে। প্রথমবারে পরীক্ষা করিয়া আচার্য্য পিকারীং কিছু বলেন নাই। দ্বিতীয়বার জামেকা গিয়া আবার পরীক্ষা করিয়াছেন, শেষ ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই যে চন্দ্রে বরফের প্রান্তর

আছে, সূর্য্যোত্তাপে তাহা গলিয়া কম হয়। পিকারীং সাহেব আরও বলেন যে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে যে চন্দ্রে বাষ্পার্ণব আছে।

পিকারীং সাহেব যে তুষার প্রান্তর দেখিয়াছেন, তাহা চন্দ্রের উত্তর ভাগেও গোলাকার, ইহার বিস্তার ত্রিশ ক্রোশ ও চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। পিকারীং সাহেব এইখানে বাতাস থাকারও প্রমাণ পাইয়াছেন। এই প্রান্তরের নাম প্লোটো প্রান্তর, ইহা পৃথিবীর প্রান্তরের মত নহে। কেবল এক বিষয়ে পৃথিবীর প্রান্তরের সহিত মিল আছে। বিসুবিয়স্ আগ্নেয়গিরির সানুদেশ যেমন নানা প্রকার বৃক্ষরাজি দ্বারা আবৃত ও পরিশোভিত এই তুষার প্রান্তরের পর্ব্বতমালার সানুদেশ সকলও সেইরূপ তরুরাজি পরিশোভিত। তুষার প্রান্তরেরও শ্বেত উজ্জ্বলতা নিরবচ্ছিন্ন নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড সকল দেখা যায়। সেই সকল কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড কখন ঘন হয়, কখনও পাতলা হয় এবং নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে। পিকারীং সাহেবের ফটোগ্রাফে এইরূপ বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। পিকারীং সাহেব বলেন, এইগুলি জীবিত তরুরাজিশোভিত ভূখণ্ড। বৃক্ষরাজির বৃদ্ধিতে ও পরিবর্ত্তনে কৃষ্ণবর্ণ ভূখণ্ড সকলের নানা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পিকারীং সাহেব দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া বলিতেছেন, চন্দ্রের পূর্ব্বকার অবস্থা যাহাইহৌক চন্দ্রে এক্ষণে যে বৃক্ষশোভিত প্রান্তর আছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পিকারীং সাহেবের ফটোগ্রাফে মেঘও দেখা যায়। সাহেব বলেন, চন্দ্রের আগ্নেয়গিরির "টাইকো" নামক গহ্বর হইতে মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল রেখা দৃষ্ট হয়। চন্দ্রের অপর স্থানেও যখন ঐরূপ উজ্জ্বল রেখা দৃষ্ট হয় তখা সূর্য্যোদয়ের কিছুদিন পরেই বা অতি অল্পদিন পরেই মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়। পিকারীং সাহেবের নিজের কথা শুনিবেন?

Whenever a bright streak has been observed on the moon, like those which radiate from the crater Tycho, there a few days after sunrise, will be found a cloud, and it is chiefly the conspicuous presence of clouds, combined with lack of shadows, that at the time of

full-moon makes the lunar detail in certain regions so difficult to distingulsh.

চন্দ্রে যখন বায়ু পাইলেন, তুষার পাইলেন, মেঘ পাইলেন, উদ্ভিদ পাইলেন, তখন প্রাণী পাইবেন না কেন? তাই বর্ত্তমানকালের জোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেছেন, চন্দ্রে প্রাণী থাকার খুব সম্ভাবনা। কিন্তু সে যাহাহৌক, এখন চন্দ্রের সহিত ললিত লবঙ্গলতাদের মুখের তুলনা চলে কি না বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "চাঁদবদনী" বলিলে—চন্দ্রে আগ্নেয়গিরি থাকায়, অগ্ন্যুৎপাত থাকায়, সুতরাং পোড়ারমুখী বলা হইল বলিয়া—ডিফামেশেনের নালিষ চলিবে না ত? ইহার মীমাংসাটা হয় চন্দ্রমাধব না হয় চন্দ্রবরকর করিলেই ভাল হয়। আমরা নজীর অনুসারে চলিব।

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে গীতামাহাত্ম্যে আছে—

গীতায়াঃ শ্লোক দশকং সপ্তপঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা॥ ৫৭

অর্থাৎ গীতার শ্লোক ১০টি, ৭টি, ৫টি, ৪টি, ২টি, ১টি বা আধটি যিনি নিত্য পাঠ করেন, তিনি অযুত বৎসর চন্দ্রলোকে বাস করেন।

হিন্দুর শাস্ত্র কি বলেন শুনিলেন?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রকৃতি, শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক। শ্রাবণের প্রকৃতি বেশ। "চিত্র" কবিতাটি ভাল। "স্বদেশানুরাগ"ও ভাল, তবে বুরগণের সঙ্গে ইংলণ্ডের অবস্থার যে তুলনা করা হইয়াছে, আমাদের মতে তাহা ঠিক নহে। নেপোলিয়ঁর সঙ্গে যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের যে অবস্থা, এক্ষণে বুরগণের সে অবস্থা নহে। ইংলণ্ডের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ তখন অনেক জাতি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সাধারণ বিপদের উপর সকলেই নিজের পূর্ণ বিপদ বুঝিয়াছিলেন ও প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড না থাকিলেও তাঁহারা যুদ্ধ

করিতেন। সুবুদ্ধি পাঠক বুঝিবেন, বূরদের সেরূপ অবস্থা নহে। একটি কথা। ছাত্রগণের জন্য লিখিত পত্রিকায়—যথা আখ্যানমঞ্জরীর গল্প তুলিয়া কথা বুঝাইতে হয়, সেখানে বৌদ্ধ সাহিত্যের গবেষণায় ফল কি? ব্যাকরণের নাম জানিয়া বালকদের কি হইবে? যাহাহৌক, ভাদ্রে ছাত্রগণের নাট্যাভিনয় দর্শন করা সম্বন্ধে টিপ্পনী (সম্পাদকের?) পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয়ে আর্দ্রবস্ত্র পরিহিতা আলুলায়িত কেশা রোহিনীকে গোবিন্দলালের অঙ্কে দেখিলে অনেক বালকের পরকাল একেবারে ঝাঁজরা হওয়া সম্ভব। "প্রতিবাদ" ছাপান ভাল হয় নাই। "প্রাকৃতিক বৈচিত্র" ও "ইংরাজ রাজত্ব" ভাল। "রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ১৮১১ খৃঃ "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" ও ১৮২৩ খৃঃ "তোতা ইতিহাস" নামে দুই খানি পুস্তক গদ্যসাহিত্যে রচিত হইয়াছিল।"

মুকুল, ভাদ্র। পূর্ব্ববৎ। "বীরনারী তারাবাই" উল্লেখযোগ্য। তারাবাই টোডা নগরের অধিপতি শূরতমের কন্যা। পাঠানেরা টোডা অধিকার করিলে শূরতম প্রতিজ্ঞা করেন, যে পাঠান তাড়াইয়া টোডা তাঁহাকে দিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই কন্যা দান করিবেন। পৃথ্বীরাজ সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। বীরনারী তারাবাইও পিতার অনুমতি লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধের দিন মহরম। পৃথ্বীরাজ ও তারাবাই নিক্ষিপ্ত শরে পাঠান টোডাপতির মৃত্যু হইল। ইতি মধ্যে সহসা একটি হস্তী আসিয়া তারার পথ রুদ্ধ করিল। তারাবাই অসি দ্বারা হস্তীশুণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। হস্তী চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল। টোডা অধিকৃত হইল, পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিলেন। "পৃথ্বীরাজ ইহার পরে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, সকল সময়েই রমণীকুলগৌরব তারাবাই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলেন। এরূপ শোভনীয় দৃশ্য পৃথিবীতে বড় অধিক দেখা যায় না।"

প্রয়াস, আশ্বিন। "কৃষি-শিক্ষা" ও "আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা" উল্লেখযোগ্য। প্রয়াসের পদ্য একটু কমাইতে হইবে।

৯ম বর্ষ—১০ম ও ১১শ সংখ্যা। মাঘ ও ফাল্গুন—১৩০৮।

পূর্ণিমা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

শ্রীবিভূপদ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল; শ্রীআবদুল করিম; শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি.এ.; শ্রীআনন্দময় শর্ম্মা প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। মৃত্যুর পর	৩৪৩
২। বঙ্গসাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর	৩৬৭
৩। মা	৩৭৬
৪। প্যারীমোহন কবিরত্ন	৩৭৭
৫। গ্রন্থ সমালোচনা	৩৮৮

বাঁশবেড়িয়া,

সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দে দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ ও ফাল্গুন—১৩০৮।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত—

লীলা (নূতন উৎকৃষ্ট বাঁধাই)	মূল্য ১।০
তমস্বিনী	" ১।০
ছোট গল্প সংগ্রহ	" ১৲
জীবন ও মৃত্যু	" ॥০
অমর সিংহ (যন্ত্রস্থ) সিপাহি বিদ্রোহের উপন্যাস	" ১॥০

তমস্বিনী সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অভিমত—

TAMASWINI is a faithful picture of Bengali domestic life and relates principally the story of an unfortunate youth, who ends his career on the gallows for murdering a prostitute, and of a girl who commits suicide by drowning on being discarded by her lover with whom she had eloped. Considerable power is shown in the delineation of characters and the plot is eminently suited for the study of important aspects of Bengali social and domestic life of the present day.—*Calcutta Gazette*, April 3rd, 1901.

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

THE TWENTIETH CENTURY

A MONTHLY REVIEW.

FEATURES.

1. Representation of different systems of religion and philosophy. 2. Study of Hindu thought. 3. Discussion of general politics and social questions. 4. Critical notices of literature, polite and serious. 5. Review of current affairs.

We shall make it our special endeavour to obtain articles from writers of distinction, so that the TWENTIETH CENTURY may possess the weight of knowledge and authority.

There will be no editorial articles on theology and anything of the nature of acrimonious controversy will be rigidly excluded from the pages of this magazine. Every article on any religious question will go forth with the *imprimatur* of the writer's name.

The June number contains an article on "A Brilliant Century in India" from the pen of our distinguished countryman Mr. R. C. Dutt,

Annual Subscription ... Rs. 4

Business office ... Madan Mutter's Lane, Simla, Calcutta.

পূর্ণিমা; ৯ম বর্ষ; ১০ম ও ১১শ সংখ্যা; মাঘ ও ফাল্গুণ, ১৩০৮ সাল।

মৃত্যুর পর।

(২৯)

যোগ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে অপরাপরের সঙ্গে পাতঞ্জল র্শনের ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের উল্লেখ করিতেই হইবে। কিন্তু পাঠক মহা-য়কে দর্শন ও পুরাণ সম্বন্ধে কিছুই বুঝান হয় নাই। বুঝান উচিৎ কেন া, মৃত্যুর-পর-ব্যাপারে উভয় শাস্ত্রই আলোচ্য; ইহার কোনটিই অসম্বন্ধ বা সংলগ্ন নহে। প্রথমে দর্শনের কথা অতি সংক্ষেপে বলিব, পরে পুরাণের থা বলিব, পরে যোগের অপরাপর কথা শুনাইব।

পাঠক মহাশয়, যোগীর কর্ণকুণ্ডলের নাম "দর্শন" শুনিয়াছেন, ইহা াহা নহে। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শনের "দর্শন"ও নহে। রামপ্রসাদ যে াহিয়াছেন—কালী যে কেমন ধন। ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥ তাহা নে আছে কি?

াবার,— মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোরকুঠারি ভোর হলে সে লুকাবেরে।
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

প্রসাদ ভক্তিভরে ভোর হইয়া আর এক স্থানে ভক্তির জোরে জ্ঞানকে চ্ছ করিয়া তারস্বরে তীব্র শ্লেষ সহকারে বলিয়াছেন—

"বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥"

দর্শন ছয়খানি। কপিল মুনির সাংখ্যদর্শন; পতঞ্জলি মুনির পাতঞ্জল র্শন বা যোগশাস্ত্র; কণাদ ঋষির বৈশেষিক দর্শন; গৌতম বা অক্ষপাদ হর্ষির ন্যায় বা অক্ষপাদ দর্শন; মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা-দর্শন (কর্ম্ম-মীমাংসা); আর বেদান্তদর্শন (ব্রহ্মমীমাংসা)। এই ছয়টি দর্শন, ছয়টি মত াত্র। কিসের মত? জগতের আদি কারণ নিরূপণ এবং মনুষ্যের মুক্তি বা

মৃত্যুর পর সদ্গতি সম্পাদন বিষয়ক পারমার্থিক মত। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ অবলম্বন করিয়াই কুশাগ্র ধীশক্তির প্ররোচনায় এই মত প্রকটিত হইয়াছে। সফল কি বিফল পাঠক নিজে বিচার করিবেন কিন্তু রামপ্রসাদ ভক্তিতে মজিয়া বলিয়াছেন—কে জানে গো কালী কেমন। ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥

সাংখ্য। সংখ্যা শব্দ হইতে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি। পঞ্চবিংশতি সংখ্যক তত্ত্ব হইতে সমস্তই হইয়াছে, এই দর্শন বলেন। সে পঁচিশটি তত্ত্ব বা পদার্থ হইতেছে—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, মন; পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, উপস্থ; পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। মহর্ষি কপিল এই সাংখ্য মতের প্রবর্ত্তক। "ঈশ্বরাসিদ্ধে" কেন না ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, এই বাক্য দর্শনে অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না বা প্রমাণ করা যায় না বলিলে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইল? তাহা ছাড়া সাংখ্য প্রবচনের ১।৯৮ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন "বেদ বাক্যের অর্থোপদেশ প্রমাণ, কেন না তদীয় কর্ত্তা যথার্থ অর্থ জানিতেন"। যিনি বেদ মানেন—বেদের দেবতা মানেন—তিনি ঈশ্বর মানেন না, ইহা কিরূপে হইতে পারে। তিনি ঋষি, তিনি মুনি অর্থাৎ সংলীন মানস, তিনি কোন বস্তুতে মন সংলীন করিয়া চিরজীবন তপস্যায় ও যোগসাধনে যাপন করিয়াছেন? অদ্যাপি গঙ্গাসাগরে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু কখনও নাস্তিকের পূজা করে নাই। তদ্ব্যতীত তিনি প্রকৃতি পুরুষ মানিতেন। প্রকৃতিকে জগতের আদি কারণ বলিয়াছেন। প্রকৃতির আর কারণ নাই। ইহা অমুল-মূল, ইহা জড় হইলেও সমুদয় বিশ্বব্যাপার করিতেছেন। তিনি পুরুষের সন্নিধান প্রযুক্ত বিশ্ব রচনা বা সৃষ্টিকার্য্য করেন। পুরুষ চেতন সুখদুঃখাদি শূন্য, অপরিণামী বা বিচার শূন্য এবং অকর্ত্তা কোন কার্য্য করেন না। পুরুষ সকলের আত্মাস্বরূপ। প্রকৃতি পুরুষের সহযোগে সৃষ্টি করেন এখন আত্মাই ত সব, যিনি আত্মা মানিলেন তিনি নাস্তিক কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

কপিল বলেন প্রকৃতির তিনটি গুণ আছে, সত্ব রজ তম। প্রকৃতি এই

তিন গুণের সাম্যাবস্থা, তিনটি যখন সমানভাবে প্রকৃতিতে থাকে, তখন কোন কার্য্য হয় না। গুণ অর্থাৎ রজ্জু; পুরুষ অর্থাৎ জীব, গো মহিষাদির ন্যায় এই তিন রজ্জু দ্বারা প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে।

কপিলের মতে সৃষ্টি এইরূপে হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে মহৎ হইয়াছে। মহৎ বুদ্ধিস্বরূপ যাহা দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা ঠিক হয়। মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কার কাহাকে কহে? আমি করিতেছি, আমার দেহ, আমার পুত্র, আমি পণ্ডিত, আমি ধনী ইত্যাদি অভিমান। অহঙ্কার ভেদে তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণের উৎপত্তি। রাজসিক অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত জন্মে। তন্মাত্র হইতে সৃষ্টি এইরূপে হয়। "শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে জল হয়, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ আর রস, ঐ চারিটি তন্মাত্র সহকারে গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশভুবন ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী কার্য্য জাত হয়।"

সাংখ্য মতে পূর্ব্বস্থিত বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট। আরও বলেন, কারণের কারণ, তাহার কারণ, সেই কারণের আবার কারণ এইরূপ পরম্পরা মতে কারণ থাকিলেও এক স্থানে গিয়া শেষ হইবে। যেখানে শেষ সেই আদিকারণ বা প্রকৃতি। ঘৃতের কারণ নবনীত, নবনীতের কারণ দধি, দধির কারণ দুগ্ধ, দুগ্ধের কারণ গো, এইরূপে গিয়া গিয়া শেষ হইবে সেই প্রকৃতি অর্থাৎ আদি কারণে। ডারউইন মহাশয় সাংখ্যের ১।৬৮ সূত্র অর্থাৎ কারণ পরম্পরা সূত্র সহিত যদি হিন্দুদের মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি দশ অবতারের কথা স্মরণ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, ডারউইন সাহেবের ইভোলিউসন থিওরী বা ক্রমবর্ত্তনবাদ হিন্দুর নিকট নূতন নহে।

সাংখ্য মতে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই হইতেছে সুখ। এই দুঃখ বা তাপ

অধ্যাত্ম, ভূত ও দৈব হইতে উৎপন্ন ; তাঁহাদের মতে সুতরাং দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই তিন প্রকারের। আধ্যাত্মিক দুঃখ—ব্যাধি বা প্রিয়বস্তুর বিয়োগ বা অপ্রিয় সংযোগ বা ষড়রিপু হইতে উৎপন্ন দুঃখ। আধি ভৌতিক—বায়ু, জল, মৃত্তিকা, অগ্নি বা পশু বা কীটাদি হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ। আর আধিদৈবিক—ঝড়, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রাঘাত, হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ তাহা। মনুষ্য মাত্রেই এই ত্রিতাপে জরজর, "সদত ত্রিতাপের জ্বালায় হৃদিভূমি যায় গো ফেটে, নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনায় পরমায়ু যায় দে ঘেটে" রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন। এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের উপায় কি? সাংখ্য উত্তর দিতেছেন "বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞানই এই মুক্তি সাধনের একমাত্র উপায়।" সুখ ও দুঃখ উভয়ই আদি কারণ বা প্রকৃতির কার্য্য। এই উভয়েরই নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্তি হইবে। প্রকৃতি ও পুরুষের যে ভেদজ্ঞান তাহাই তত্ত্বজ্ঞান।

কপিলের মতে ধর্ম্মও দুই প্রকার, অভ্যুদয়হেতু ও নিশ্রেয়সহেতু। ইহকালে ও পরকালে যাহাতে সুখসাধন হয়, তাহাই অভ্যুদয়হেতু; যেমন যজ্ঞ করা। আর যে ধর্ম্ম কেবল পরকালের জন্য যাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি, তাহাই নিশ্রেয়সহেতু; যেমন অষ্টাঙ্গযোগসাধন।

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলিয়াছেন "এইরূপ তত্ত্বানুশীলন করিলে আমি নাই, আমার শরীর নাই, কেন না আমি ভিন্ন শরীর ভিন্ন, আমি অহঙ্কার বর্জ্জিত, এই শেষ সিদ্ধান্তস্বরূপ এবং নিঃশংসয়িতাপ্রযুক্ত বিশুদ্ধ এই মাত্র জ্ঞানটি উৎপন্ন হয়"। এই জ্ঞানে মুক্তি হয়।

সাংখ্যমত না জানিলে হিন্দুশাস্ত্র বুঝিবার উপায় নাই। সকল শাস্ত্রে এমন কি উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ দেখুন। "যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, সমুদয় অচেতন বস্তুর মধ্যে চেতন যিনি এক হইয়া বহু এবং জীবের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, সেই সাংখ্য যোগের অধিগম্য ও সকলের কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে সকল পাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ২২২-২২৩ অধ্যায় দেখুন। মহাভারত বলিয়াছেন "সাংখ্য বিদ্যার পর আর বিদ্যা নাই; যোগবলের পর আর বল নাই।" মনুও সাংখ্যের মতের কথা বলিয়াছেন। সাংখ্যমত সম্বন্ধে এই পুস্তকগুলির নাম করিতে পারা যায়—সাংখ্য

প্রবচন, তত্ত্বসমাস (কপিল); সাংখ্যকার ও সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য (বিজ্ঞানভিক্ষু), সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বরকৃষ্ণ), সাংখ্যকারিকা ভাষ্য (গৌড়পাদ), সাংখ্যচন্দ্রিকা (নারায়ণ তীর্থ), সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (বাচস্পতিমিশ্র-বিরচিত)।

আমরা অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে এইটুকু এই স্থলে উদ্ধার করিলাম। সুবুদ্ধি পাঠক অনায়াসেই কারণ বুঝিতে পারিবেন। "অগস্ত্য কহিলেন, 'রঘুনাথ সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্ব্বিকল্প ও নিরুপাধি একমাত্র তুমিই বর্ত্তমান ছিলে। তুমি মায়ার বিষয় ও আশ্রয়। সেই মায়াকে তোমার শক্তি বলিয়া থাকে। তোমার ইচ্ছানুসারে সেই শক্তি তোমাকে যখন আবরণ করে, তদবস্থাতেই বেদান্ত-পরিনিষ্ঠিত মনীষিগণ তাহাকে অব্যাকৃত বলিয়া বর্ণনা করেন। এই প্রকারে উক্ত শক্তি দ্বারা আবৃত হইলেও তুমি নির্গুণরূপে বিরাজ করিয়া থাক। ঐ শক্তিকেই কেহ অবিদ্যা, কেহ সংসার, কেহ বন্ধ, কেহ মায়া, কেহ বা মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি নানা নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। রাম, এই মূল প্রকৃতি মায়াই তোমার দ্বারা সংক্ষোভ্যমান হইয়া মহত্তত্ত্বকে প্রসব করে এবং তোমারই প্রেষণা বশত সেই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে মহত্তত্ত্ব সংবৃত অহঙ্কার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে তামস অহঙ্কার হইতে প্রথমত সূক্ষ্ম তন্মাত্র সমূহ, তৎপরে ক্রমশ সেই সূক্ষ্ম তন্মাত্র সমূহ হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভূতগণের গুণসংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমশই অধিক। ভগবান্, রাজসিক বা তৈজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল এবং মন উৎপন্ন হইয়াছে। অনন্তর এই মন ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে সর্ব্বগত মহৎ ও সূত্রাত্মক লিঙ্গশরীর সৃষ্ট হইলে পর, স্থূলভূত সমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বিরাটপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, বিরাটপুরুষ হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ এবং কালক্রমে দেব তির্য্যক্ ও মনুষ্য প্রভৃতি নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সঞ্জাত হইয়াছে। রঘুবর, সুধীগণ বলেন তুমিই রজোগুণ অবলম্বন করিয়া বিরিঞ্চিরূপে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও সত্ত্বগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক, অতএব তুমিই জগতের সম্পূর্ণ কারণ। বুদ্ধিজ গুণ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক বৃত্তিত্রয় ত্বদীয় মায়ার সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণভেদে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। রঘুনন্দন তুমি ঐ তিন

হইতে পৃথক এবং নির্লিপ্তভাবে উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ;—তুমি অবিনাশী ও জ্ঞানস্বরূপ। যখন তোমার সৃষ্টিলীলা বিস্তার করিবার বাসনা হয়, তখন তুমি নির্গুণ হইলেও মায়াকল্পিত সম্বন্ধ স্বীকারপূর্ব্বক গুণবানের ন্যায় প্রতীত হও। বিদ্যা ও অবিদ্যা—মায়া এই দ্বিবিধভাবে বিভাসিত হইতেছে। যাহারা প্রকৃতিমার্গে বিচরণ করে, তাহারা অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয়, কিন্তু যাহারা নিবৃত্তিমার্গ নিরত, তোমার প্রতি ভক্তিমান এবং বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বিচার করিতে সমর্থ তাহারা বিদ্যাময় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যাহারা অবিদ্যার বশবর্ত্তী, তাহারা সর্ব্বদাই সংসারের জন্য ব্যাস্ত; কিন্তু যাহারা বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত তাঁহারা নিত্যমুক্ত। বিভো জগতে যে সকল মহাত্মা তোমার প্রতি ভক্তিমান্ ও মন্ত্রোপাসক, তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঐ বিদ্যার উদয় হয়, তদ্ভিন্ন কদাচ অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না। অতএব একমাত্র তোমার ভক্তবৃন্দই মুক্তিসুখের অধিকারী সন্দেহ নাই। ইত্যাদি।"

পাতঞ্জল দর্শন। মুনি পতঞ্জলির নামানুসারে এই দর্শন। ইহা যোগশাস্ত্র। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেন যে যোগশাস্ত্রের বয়ক্রম দুই সহস্রের কিছু উপর হইবে।

এই দর্শন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম করা যাইতে পারে—যোগসূত্র (পতঞ্জলি), পাতঞ্জলভাষ্য (বেদব্যাস), পাতঞ্জলসূত্র (নাগোজী ভট্ট), রাজমার্ত্তণ্ড (ভোজরাজারণ মঙ্গল), যোগবার্ত্তিক (বিজ্ঞানভিক্ষু)। একজন পতঞ্জলি পাণিণি ব্যাকরণের ভাষ্য প্রস্তুত করেন। তিনি ও দর্শন-প্রবর্ত্তক একই ব্যক্তি কি না অদ্যাপি কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

ভগবান পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং বলেন বিশ্ব রচনায় আরও একজনের প্রয়োজন, তিনিই "পরমেশ্বর (তিনিই) ষড়বিংশতি তত্ত্ব। সেই পুরুষ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় বর্জ্জিত; বিশ্বরচনার্থ ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণপূর্ব্বক বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এবং সংসার তাপানলে দহ্যমান প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।" ইহার আর একটি নাম "সেশ্বরদর্শন"।

[ক্লেশ পাঁচ প্রকার (১) অনিত্যে নিত্যবোধ; দুঃখে সুখ বোধ এইরূপ

ভ্রম, (২) আমি দেহ এইরূপ বোধ বা ভ্রম, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) মরণভয়। বিপাকের অর্থ জন্ম, আয়ু ও সুখ দুঃখ ভোগরূপ কর্ম্মফল। আশয় অর্থাৎ কর্ম্মজনিত বাসনা নামক সংস্কার, ইহা অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে এবং বীজরূপ ইহা হইতেই কর্ম্মফলের উৎপত্তি।]

মনুষ্যের নানারূপ চিত্তবৃত্তি আছে, এই চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ কিরূপে করিতে হয়? দর্শনের বিষয় রূপ, অন্তকরণকে রূপচিন্তা হইতে বিরত করিয়া ঈশ্বরে ন্যস্ত করিতে হয়। সেইরূপ শ্রবণের বিষয় শব্দ ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ। এই সকল বিষয় হইতে বিরত করিয়া অন্তকরণকে ধ্যেয় বস্তু পরমেশ্বরে লীন করাকে চিত্তবৃত্তি নিরোধ কহে। এই যোগের আটটি অঙ্গ আছে [১] যম, [২] নিয়ম, [৩] আসন, [৪] প্রাণায়াম, [৫] প্রত্যাহার, [৬] ধ্যান, [৭] ধারণা, [৮] সমাধি। (বিশেষ বিবরণ পরে) পাতঞ্জল দর্শনের মতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞানের নামান্তর বিবেকখ্যাতি। পুরুষ বা জীবাত্মা জড়ময় জগৎ হইতে নিতান্ত পৃথক্ এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। জীব স্ফটিকের ন্যায়, স্ফটিক শুভ্র, জীব ও চিন্ময়। অজ্ঞান বশত সংসারে আসিয়া আমি দুঃখী আমি সুখী আমি ভোক্তা আমি দ্রষ্টা ইত্যাদি বোধ করে। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় তখন অজ্ঞান রহিত হইয়া যায় ও কেবল চিন্ময়ত্ব বিদ্যমান থাকে। এই কেবল চিন্ময়ত্বের অবস্থাই কৈবল্য বা মুক্তি।

বৈশেষিক দর্শন। ঋষি কণাদ এই দর্শন সৃষ্টি করেন। তিনি "বিশেষ" নামে আরও একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। বিশেষ হইতে নাম হইয়াছে "বৈশেষিকদর্শন"। কণাদসূত্র কণাদসূত্রোপস্কার [শঙ্কর মিশ্র], কণাদসূত্রবিবৃতি [জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন], এইগুলি দ্রষ্টব্য। কপিল প্রকৃতি ও পুরুষকে নিত্য পদার্থ বলিয়াছেন। কণাদ নয়টি পদার্থকে নিত্য বলিয়াছেন; যথা; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন। এইগুলি দ্রব্য। পদার্থ কি কি? দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব এই সাতটি। গুণ-পদার্থ চব্বিশটি যথা; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ ও পুণ্য।

কর্ম্ম। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন এই পাঁচটি কর্ম্ম।

সামান্য। বস্তুর জাতি বা সাধারণ ধর্ম্মকে সামান্য পদার্থ বলে; যথা; ঘটত্ব, গোত্ব, পশুত্ব।

বিশেষ। যাবতীয় জড়পদার্থ পরমাণুযোগে উৎপন্ন কিন্তু বৃক্ষের আকার ও কটাহের আকার সমান নহে, যদিও উভয়ই পরমাণু হইতে। কণাদ বলেন বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে "বিশেষ" নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

সমবায়। সমবায় সম্বন্ধবিশেষ। ঘটের সহিত মৃত্তিকায়, কর্ত্তার সহিত কর্ম্মের, গুণের সহিত গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সম্বন্ধ ইত্যাদি।

অভাব। অভাব, না থাকা বা নিষেধ। অভাব চারি প্রকারের। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, ভেদাভাব ও অত্যন্তাভাব। কোন বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে না থাকা তাহাই প্রাগভাব। যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল বটে, এখন নাই, তাহা ধ্বংসাভাব। গৃহ ঘট নয় বলিলে গৃহ ও ঘটের যে প্রভেদবোধ আসে, তাহা ভেদাভাব ও এ ঘরে কাপড় নাই বলিলে বস্ত্রের যে অভাব সূচিত হয় তাহা অত্যন্তাভাব।

এই দর্শনের মতে সংস্কার তিন প্রকারের; স্মরণশক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং বেগ। বেগ উৎপত্তির কারণ ক্রিয়া, বেগ গতির কারণস্বরূপ।

এই দর্শনমতে মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। মৃত্তিকায় জলের বায়ুর পরমাণু নিত্য কিন্তু পরমাণু সমষ্টির যে রূপ তাহা অনিত্য। যেমন, মৃত্তিকার পরমাণু নিত্য, কিন্তু পরমাণু সমষ্টির রূপ যে ঘট তাহা অনিত্য। ঐরূপ জল বায়ু প্রভৃতির। পরমাণু নিত্য তাহার আর কারণ নাই। দুইটি পরমাণুতে দ্ব্যণুক, তিনটি দ্ব্যণুকে এক ত্র্যসরেণু হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া জগৎ রচিত হইয়াছে। পরমাণু কেহই সৃষ্টি করেন নাই।

কণাদের মতে অদৃষ্ট দ্বারা বা অদৃষ্ট কারণ বিশেষ দ্বারা উল্লিখিত পরমাণু সমুদয়ের সংযোগ সাধিত হইয়া বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীতে কর্ম্ম উৎপত্তি কিরূপে হয়? না, পৃথিবীতে সঞ্চালন, অভিঘাত এবং সংযুক্ত বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইতে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভিন্ন যে কর্ম্মের উৎপত্তি

তাহার কারণ কি? বৈশেষিক দর্শন বলেন, তাহার কারণ অদৃষ্ট। বৃক্ষে যে রস সঞ্চার হয়, পৃথিবীর যে ভূকম্পন হয়, মৃত্যুকালে দেহ হইতে যে প্রাণের বহির্গমন বা অপসর্পণ, দেহান্তরে প্রাণের বা মনের প্রবেশ বা উপসর্পণ, পাকস্থলীতে ভুক্ত ও পীত বস্তুর যে পরস্পর সংযোগ হয়, অগ্নিশিখার ঊর্দ্ধগমন, বায়ুর তির্য্যক গতি, সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুর সহিত পরমাণুর প্রথম সম্মিলন অর্থাৎ দেহের সহিত প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ—এই সকল কার্য্যের কারণ অদৃষ্ট। যাঁহারা বলেন কণাদ ঈশ্বর মানিতেন না, তাঁহাদের সহিত আমাদের একমত হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনের তৃতীয় সূত্রের "তৎ" শব্দ ঈশ্বর বাচক। আত্মা অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মা। কণাদের এই পরমাণুবাদ গ্রীসদেশে নীত হইয়াছিল, ডেমক্রিটস গ্রীসে এই মত প্রচার করেন। বর্ত্তমানকালে য়ুরোপে যে পরমাণুবাদ প্রচলিত তাহাও এই দর্শনের রূপান্তর। ড্যাল্টন তাহার প্রবর্ত্তক।

কণাদের মতেও ধর্ম্ম দুই প্রকার অভ্যুদয়হেতু ও নিশ্রেয়সহেতু যাহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি পরমপুরুষার্থ। অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির নামই মুক্তি। দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধনাশ হইলেই মুক্তির উদয়। শরীর ও মনের বিচ্ছেদই মোক্ষ। আত্মকর্ম্ম করিলে মুক্তি হয়। আত্মকর্ম্ম কি? শ্রবণ, মনন, যোগাভ্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, শমদম, আত্মা-দর্শন, পূর্ব্বস্থিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের বিচার, এই সকল কর্ম্ম আত্মকর্ম্ম। আত্মকর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ আমি দেহ নহি, আত্মা দেহ নয়, এই জ্ঞান হয়।

ন্যায়দর্শন। মহর্ষি গৌতম, গোতম বা অক্ষপাদ এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। এই ন্যায়দর্শনের বাঙ্গালায় এক সময়ে বহুল প্রচার হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সমুদয় স্থান হইতে লোকে নবদ্বীপে ন্যায় পড়িতে আসিত। ন্যায়দর্শন ও তস্য সহোদর বৈশেষিক দর্শনের আলোচনায় বাঙ্গালাকে অদ্যাপি কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে পুস্তকের তালিকার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। লীলাবতী [বল্লভাচার্য্য], বার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি [উদয়নাচার্য্য], বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা [বাচস্পতি মিশ্র], তর্কভাষা [কেশব মিশ্র], তর্কভাষা প্রকাশ [গোবর্দ্ধন মিশ্র], পদার্থ

দীপিকা [কোণ্ডভট্ট], চিন্তামণি [গঙ্গেশ উপাধ্যায়], ঐ চিন্তামণির "আলোক" টীকা [জয়দেব মিশ্র] এবং চিন্তামণি টীকা [মথুরানাথ তর্কবাগীশ], ভাষা পরিচ্ছেদ [বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য], সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী [বিশ্বনাথ], ন্যায়সূত্রবৃত্তি [বিশ্বনাথ], চিন্তামণি দীধিতি [রঘুনাথ শিরোমণি], দীধিতি টীকা [ভবানন্দ], ঐ দীধিতি টীকা [জগদীশ], ঐ টীকা [গদাধর], ঐ দীধিতি টীকা [কৃষ্ণদাস]।

একদল পণ্ডিত ষড়দর্শনকে নিরীশ্বর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত সাংখ্য সম্বন্ধে বলেন "তিনি (কপিল) ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।" বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে বলেন "আস্তিক মাত্রেরই স্বীকৃত পরম পদার্থ পরমেশ্বরের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন?" ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বলেন "গোতম ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিবেন এমন বোধ হয় না।" * * যখন বিশ্বকারণ নিরূপণ দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রধান প্রয়োজন তখন প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পৃথক্ নির্দ্দেশ না করা কোনরূপেই সঙ্গত ও সম্ভাবিত নয়, একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার পরসূত্রেই আবার মনুষ্যকৃত কর্ম্মকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইত্যাদি"। পাঠক মহাশয় দেখিবেন দত্ত মহাশয়ের কিরূপ ঝোঁক। একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলা হইয়াছে তথাপি তাহাকে নিরীশ্বর বানাইতে হইবে। গরজ বড় বালাই। পাঠক মহাশয় একবার সূত্রটি স্বয়ং দর্শন করুন। ন্যায়সূত্র ৪ অ, ১৯ সূত্রে বলেন—

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মফল্য দর্শনাৎ।

ঈশ্বর কারণ, কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না। ইহার অধিক আর কি চাই? গোতম ও কণাদ উভয়েই বেদ মানেন।

গোতম বৈশেষিক দর্শন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ঐ দর্শনের সমস্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, মৃত্তিকাদি চারিটি জড়পদার্থের পরমাণু সমস্ত ও দ্রব্য পদার্থের পরমাণু নিত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেবল "বিশেষ" পদার্থটি স্বীকার করেন নাই। তবে তর্কশাস্ত্রের উপযোগী আর ষোলটি বিষয় স্বীকার করেন। যথা; প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি। যদ্দ্বারা কোন বিষয় নির্ণীত হয় তাহা প্রমান। প্রমান চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান করিলেন, পর্ব্বতে অগ্নি আছে। অনুমানের পাঁচ প্রত্যঙ্গ;—

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপময়, নিগমন। কিরূপে পর্ব্বতে ধূম দেখিয় অগ্নির অনুমান করিতে হয়, দেখুন।

১। [প্রতিজ্ঞা] পর্ব্বতে অগ্নি আছে।

২। [হেতু] কেন না সেই স্থান হইতে ধূম উদ্গত হইতেছে।

৩। [উদাহরণ] যাহা হইতে ধূম নির্গত হয় তাহা অগ্নিবিশিষ্ট, যেমন রন্ধনশালা।

৪। [উপময়] এই পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে।

৫। [নিগম] অতএব এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে।

ন্যায়শাস্ত্রে "কার্য্যকারণ" পরিবর্ত্তে অপর শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা পারিভাষিক "ব্যাপ্য ব্যাপক"; "সাধ্য সাধন"। উপরের উদাহরণে ধূম ব্যাপ্য অগ্নি ব্যাপক; ধূম সাধন অগ্নি সাধ্য।

বর্ত্তমানকালে য়ুরোপে যে তর্কশাস্ত্র বা লজিগ প্রচলিত তাহার মূল হইতেছে, গ্রীসদেশে। অরিষ্টটল তাহার প্রবর্ত্তক। অরিষ্টটলের প্রণালীতে তিনটি বিষয় আছে, তিনি প্রতিজ্ঞা হেতু এই দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয় একবার ঐ দুইটি বাদ দিয়া পাঠ করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন।

উপমান। জ্ঞাতবস্তুর সাদৃশ্য হইতে জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞান সাধনকে উপমান বলে। যথা, গো সদৃশ গবয়।

শব্দ। বেদাদি আপ্ত বাক্যের উপদেশকে শব্দ বলে।

প্রমেয়। প্রমান দ্বারা যে নিশ্চিত জ্ঞান। ন্যায়শাস্ত্রে বার প্রকার প্রমেয়; আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (বার বার মরণোৎপত্তি) ফল, দুঃখ, অপবর্গ।

সিদ্ধান্ত। অনিশ্চিত বিষয়ের নিশ্চিত।

ন্যায়শাস্ত্রে আরও তেরটি বিচারের অঙ্গ আছে, সংশয়, প্রয়োজন, বচন, বিতণ্ডা, ছল, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি এই সকল বিষয় জানিবেন; জানিয়া দেহ আত্মা নয় এইটি নিশ্চিতরূপে বুঝিবেন। সেই জ্ঞানই মুক্তি। শরীর আত্মা নয় এই জ্ঞানই ন্যায়শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানে অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয় এবং জীবাত্মার সাক্ষাৎ হয়, তাহাই 'বিবেক'। সমাধিসাধন করিলে ঐ তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয়। "সমাধি সাধনার্থে যম নিয়মাদি

যোগানুষ্ঠান ও আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ক বাক্য দ্বারা মুক্তিলাভের ক্ষমতা জন্মে" ন্যায় সূত্র ৪ অ, ১১১ সূত্র।

মীমাংসাদর্শন। মহর্ষি জৈমিনী এই দর্শনের প্রবর্ত্তক, ইহার নামান্তর জৈমিনীদর্শন। শ্রুতি বিশেষের অর্থ সমর্থন ও স্থল বিশেষে শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করা এই দর্শনের উদ্দেশ্য। সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত করিয়া তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত করাকে অধিকরণ বলে। এই দর্শনের মতে বেদ নিত্য। শ্রুতি কথিত কর্ম্মকাণ্ডের আন্দোলন বিচার ও মীমাংসা আছে বলিয়া ইহাকে কর্ম্মমীমাংসাও বলে। বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বর্গভোগ ঘটে। স্বর্গভোগই পরম পুরুষার্থ। কর্ম্ম করিয়া ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করিতে পারিলে আরও ভাল। এই দর্শন মতে বেদ নিত্য অপৌরুষেয়, শব্দ নিত্য। জৈমিনি সূত্র ২।১।১৮ সূত্রে বলেন "নিত্যস্তু স্যাদর্শনস্য পরার্থত্বাৎ" অর্থাৎ শব্দ নিত্য কেন না অন্যকে অর্থবোধ করাইবার জন্যই উহার উচ্চারণ। উচ্চারণ মাত্রই যদি শব্দের ধ্বংস হইত, তাহা হইলে কেহ কাহাকেও শব্দের অর্থ বুঝাইতে পারিত না। শব্দ নিত্য চীনেরাও বলেন। একটি নিত্যশব্দ সকল অনিত্য শব্দের অন্তর্ভূত। সেই শব্দ ব্রহ্ম।

পূর্ব্বে যে অধিকরণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। অধিকরণের পাঁচ অঙ্গ, বিষয়, বিশয় বা সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর, মীমাংসা বা সঙ্গতি। বেদানুসারে ইন্দ্রযাগে উড়ুম্বরী স্পর্শ করিতে হয়, কাত্যায়ণ স্মৃতি অনুসারে তাহা আবৃত করিতে হয়। অধিকরণের মীমাংসা এইরূপ—

বিষয়। উড়ুম্বরী স্পর্শ ও আবরণ বিষয়ক শাস্ত্রের বিধি।

বিশয়। সংশয় এই যে স্পর্শ না আবরণ কি করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বপক্ষ। শ্রুতিবিধি ও স্মৃতিবিধির পরস্পর বিরোধ প্রতিপাদন করণ। স্পর্শ করিলে স্মৃতি অমান্য করা হয়; আবরণ করিলে বেদ অমান্য করা হয়;

উত্তর। পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন।

সঙ্গতি বা মীমাংসা। বেদকথিত ঔড়ুম্বরীর স্পর্শযোগ্য স্থান ত্যাগ করিয়া বাকি স্থান আবরণ করা।

গ্রন্থাদি। জৈমিনিসূত্র, শাবরভাষ্য [শবরস্বামী], বার্ত্তিক [কুমারিল ভট্ট], ময়ূখমালা [সোমনাথ], শাস্ত্রদীপিকা [পার্থ সারথী], মীমাংসা ন্যায়-বিবেক [ভবনাথ মিশ্র], ন্যায়মালাবিস্তার [মাধবাচার্য্য], ন্যায়াবলী দীধিতি [রাঘবানন্দ]।

শব্দব্রহ্ম শব্দনিত্য সুতরাং মন্ত্র ও নিত্য। দেবদেহ মন্ত্রস্বরূপ। অক্ষয়-কুমার দত্ত বলেন "যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বান গ্রহণ করিয়া ঘটে বা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভারবলে ঘট ও প্রতিমা একেবারে চূর্ণায়মান হইয়া যাইত।" ঐরাবত আলিপুরের পশু-বাটিকায় পাওয়া যায় মনে করা কেবল বুদ্ধির দোষ। বিধিবিড়ম্বনায় ঐরাবতের সূক্ষ্মদেহ আর মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারে নাই। অথবা পারিলেও রহস্যের খাতিরে তাহা চাপিয়া রাখা হইয়াছে।

বেদান্ত। এই দর্শনের নামান্তর ব্রহ্মমীমাংসা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মীমাংসা কর্ম্মমীমাংসা। বেদান্তসূত্র ১অ।১পা।২সূ বলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি লয় হয় তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ সত্যজ্ঞান ও আনন্দ, তিনি অনন্ত, তিনি সত্য আর সমস্তই মিথ্যা। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্ম আছেন বলিয়া আমাদের জগৎ আছে বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। (অধ্যারোপ)। সর্পভ্রম কাটিয়া গেলে যেমন রজ্জু বোধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জগদ্ভ্রম নষ্ট হইলে পরব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি হয়। (অপবাদ বা অপবাদন্যায়)। বেদান্তের মতকেই মায়াবাদ বলে। ইহারা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপর অর্থাপত্তি প্রমাণ বলিয়া আরও একটি প্রমাণ মানেন। স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাভোজন করেন না, বলিলে বুঝিতে হইবে তিনি রাত্রিভোজন করেন, নহিলে স্থূলকায় কিরূপে হইবেন বা থাকিবেন। ইহাই অর্থাপত্তি প্রমাণ। ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক মতে ইহা কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণ। বেদান্তবাদীরা মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াছেন। বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া আকাশ দর্শন করিলে খণ্ড খণ্ড দেখায় সত্য কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত নহে। সেইরূপ মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম ও পূর্ণ

ও মুক্ত। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও চিৎস্বরূপ। তিনি যে সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তারূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা অধ্যারোপমাত্র, জগৎ যদি মিথ্যা তাহার আবার সৃষ্টিকর্ত্তা কি? তিনি প্রকৃতরূপে অরূপ অকর্ত্তা, অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অদীর্ঘ, অহ্রস্ব, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বাক্যমনের অগোচর। মুণ্ডকোপনিষদে আছে, উর্ণনাভি যেমন উর্ণজাল সৃজন ও গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধি উৎপন্ন হয়, জীবিত মনুষ্যদেহে যেমন কেশ লোমাদি হয় সেইরূপ অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি। সে যাহাহৌক বেদান্তমতে জীব ও পরব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, জীব ব্রহ্ম ভেদ নাশ করিয়া আনন্দ লাভই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। মহাবাক্য দ্বারা জীব ব্রহ্মের অভেদ বুঝিতে হয়। মহাবাক্য এইগুলি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম (এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম) অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম), তত্ত্বমসি (তুমিই সেই ব্রহ্ম)। এই সকল মহাবাক্যের অর্থ চিন্তাই তত্ত্বজ্ঞান। আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইলে কেবল ব্রহ্মের চৈতন্যেরই স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই মুক্তি বা নির্ব্বাণ মুক্তি। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞান দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে বড়ই কঠিন। সুতরাং তিনি ওঁ (প্রণব) উপাসনা করিবেন, ওঁকার পরমাত্মাস্বরূপ। ব্রহ্ম উপাসনার চারি অঙ্গ—বিবেক, বৈরাগ্য, সাধন সম্পত্তি ও মোক্ষাভিলাষ। বিবেক কি? ব্রহ্মই নিত্য আর সকল অনিত্য এই জ্ঞান। বৈরাগ্য অর্থাৎ ভোগবিরাগ কি ইহকালের কি পরকালের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ। সাধন সম্পত্তি পাঁচটি, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি। শম=অন্তকরণের দমন; দম=ইন্দ্রিয়াদির দমন; উপরতি=সাধনের সময় অপর কর্ম্ম ত্যাগ; তিতিক্ষা=শীত উষ্ণাদি সহ্য করা; সমাধি=প্রমাদালস্য ত্যাগপূর্ব্বক একমনে ব্রহ্মধ্যান।

'শারীরিকভাষ্য ২ অ, ১ পা, ৩৪ সূত্রের ভাষ্য একস্থানে বলেন "ঈশ্বরকে মেঘের ন্যায় দেখিতে হইবে, মেঘ যেরূপ ব্রীহি যবাদির পুষ্টিসাধনের সাধারণ কারণ, আর ব্রীহি যবাদি যে পরস্পর সমান হয় না, তাহাদের বীজগত শক্তিভেদই যেমন তাহার অসাধারণ কারণ, সেইরূপ, ঈশ্বর, দেব মনুষ্যাদির সৃষ্টির সাধারণ কারণ,' আর দেব মনুষ্যাদির অবস্থা যে সমান নয় নিজ নিজ কর্ম্মই তাহার সাধারণ কারণ। এইরূপ 'সপেক্ষতা (ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা) প্রযুক্ত ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈঘৃণ্য দোষে দূষিত হইতে পারেন না।" সুতরাং জীবগণ পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে পরজন্মে সেইরূপ ফল ভোগ করে।

গ্রন্থাদি। ব্রহ্মসূত্র [ব্যাস], ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি [বৌধায়ন], শারীরিক মীমাংসা ভাষ্য [শঙ্করাচার্য্য], উহার টীকা [আনন্দগিরি], ব্রহ্মবিদ্যাভরণ [অদ্বৈতানন্দ], বেদান্তকল্পতরু মঞ্জরী [বিদ্যানাথ], ব্যাসসূত্রবৃত্তি [রঙ্গনাথ], বেদান্তসূত্র মুক্তাবলী [ব্রহ্মানন্দ], ভাষ্যরত্নপ্রভা [গোবিন্দানন্দ], ব্রহ্মসূত্রভাষ্য [ভাস্করাচার্য্য], বেদান্তসূত্রব্যাখ্যা চন্দ্রিকা [ভবদেব মিশ্র], বেদান্ত পরিভাষা [ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত], বেদান্তসিদ্ধান্তবিন্দু [মধুসূদন], বেদান্তশিখামণি [রাসকৃষ্ণ দীক্ষিত], বেদান্তকল্পলতিকা [মধুসূদন]। বেদান্ত কল্পতরু [অমলানন্দ]।

আরও কতকগুলি দর্শন আছে। "চার্ব্বাকদর্শন", চার্ব্বাক নাস্তিক তিনি বলেন, স্বর্গ অপবর্গ নাই, পরলোকে আত্মাও থাকে না। যজ্ঞে পশু হনন করিলে যদি স্বর্গ হয় তবে নিজ পিতাকে বলিদান দিলেই ত হয়। ইনি বলেন যতদিন বাঁচিবে, সুখে থাক, ঋণ করিয়া ঘৃত ভোজন কর। "রামানুজদর্শন" ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন বা মাধ্বাচার্য্যদর্শন বিষ্ণুপ্রধান। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, শৈবদর্শন, রসেশ্বরদর্শন, নকুলীশ পাশুপতদর্শন, শিবপ্রধান। বৌদ্ধগণের "শূন্যবাদ দর্শন" নাগার্জ্জুন প্রকাশ করেন (৪৩ পৃঃ খৃঃ) "আর্হতদর্শন" জৈনমত প্রতিপাদক।

বঙ্গসাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর।

সম্প্রতি আমরা 'কালিকামঙ্গল' নামক যে প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাকে "বঙ্গসাহিত্যে পঞ্চম বিদ্যাসুন্দর" অভিধান দিয়া অদ্য সংক্ষেপে তদ্বিবরণ পাঠকগণের নেত্রগোচর করিতেছি।

বররুচির বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান লইয়া আদৌ কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন; পরে রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন ও তাঁহার পরে গুণাকর ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি আর একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন জনের যশোবিভা পরিম্লান করিতে গিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। এতদিন বাঙ্গালী পাঠকগণ এই চারিখানি কাব্যের বিষয়ই অবগত ছিলেন।

ইহাদের পরে বা সমকালে আর কেহ ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, হয়ত কেহ এরূপ কল্পনাও করেন নাই।

সমালোচ্য বিদ্যাসুন্দরের কবিপ্রদত্ত নাম কালিকামঙ্গল। নাম বিষয়ে সকল বিদ্যাসুন্দরেরই সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গলে'র অন্তর্গত; কৃষ্ণরামের গ্রন্থের নাম কালিকামঙ্গল; কেহ কেহ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকে তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দরেরও সম্ভবতঃ ঐরূপ একটা নাম হইবে। কালী-মাহাত্ম্য-প্রচারই যে গ্রন্থগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা নামেই স্পষ্ট প্রকাশ।

আমাদের সমালোচ্য কাব্য-রচয়িতার নাম নিধিরাম কবিরত্ন। তাঁহার গোত্রের উপাধি আচার্য্য; সুতরাং তিনি লগ্নাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্ল্লভ আচার্য্য ও মাতামহের নাম গঙ্গারাম।* তাঁহার কাব্য হইতে তাঁহার জন্মস্থান বা তৎসম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্তিকালে তিনি রচনাকাল নির্দ্দেশে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

*'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"র ৭ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় বিদ্যাসুন্দর নামক যে পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রবন্ধালোচ্য 'কালিকামঙ্গল' একই গ্রন্থ। তখন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই হস্তলিপিতে একস্থানে নিম্নের দুটি চরণ বেশী দেখিয়াছি—

গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথাএ।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরাম গাএ॥

সুতরাং কবির গুরু ও মাতার নামও পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার বাসস্থানের নামোল্লেখ করেন নাই। পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠার অক্ষর উঠিয়া গিয়াছে, হয়ত সেইখানে কোন পরিচয় ছিল। পুঁথিখানি চট্টগ্রাম আনোয়ারার পাটনি-কোটা গ্রামে এক আচার্য্যের গৃহে পাওয়া গিয়াছে। তথায় খোঁজ করায় জানিলাম, পুঁথিখানি পটীয়া থানার চক্রশালা গ্রাম হইতে নকল করিয়া আনা হইয়াছিল। তাঁহারা আরো বলেন যে নিধিরামের বাড়ী নাকী চক্রশালায় ছিল। এখনও তথায় অনেক আচার্য্য ব্রাহ্মণের বাস আছে। কালিকামঙ্গলের আরম্ভ ভাগে নিম্নের অংশটুকু দেখা যায়—

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে কবি কৃষ্ণরাম জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম 'রায়মঙ্গল' রচনা শেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। দীনেশ বাবু অনুমান করেন, কৃষ্ণরামের কাব্যখানি লিখিত হওয়ার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ হয় নাই এবং তাহা কৃষ্ণরামের গ্রন্থের ৪০।৫০ বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছিল।

কবি রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

রায়গুণাকরের আনুমানিক জন্মকাল ১৭১২ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যুকাল পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় থাকিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাহা সমাপ্ত করেন।

প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্য ভারতচন্দ্রের পরে রচিত হয় কিন্তু কখন, তাহা আমাদের জানা নাই।

মালসী।

মাএর চরণে নিবেদি ধুয়া
জননী আগো মা!
হরে যারে হৃদে ধরে, সে পদ নি পাব নি রে,
অন্তরে জপিলে পাব নি।
তরাই জঙ্গম আদি, আমি কথ অপরাধি,
না জানি কোন পাপ কৈরাছি॥
দয়াময়ি নাম ধর, অধম তরাইতে পার,
আহ্মারে তরাইতে ক্ষতি কৈই।
আলি আকবর মতিহীন, মনের বাঞ্ছা অনুদিন,
ত্রাণ কর পদছায়া দিয়া॥

হিন্দুকবির গ্রন্থে মুসলমানের এ গানটি কোথা হইতে আসিল বুঝা কঠিন। ইনি কোন্ আলি আকবর বলিতে পারি না। কিন্তু চক্রশালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আজিমপুরে পূর্ব্বে আলি আকবর চৌধুরী নামে একজন বড় মুসলমান জমিদার ছিলেন। তাঁহার বংশ অদ্যাপি চট্টগ্রামে বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ইনিও কবি প্রায় সমকালীয় ব্যক্তি। তাঁহার কোনরূপ প্রসাদলাভার্থ কবি এই পদটি তাঁহার নামে লিখিয়া গিয়াছেন কি না, কে বলিবে?

আমাদের সমালোচ্য কাব্যের সমাপ্তিতে এই তারিখটি দেওয়া আছে—

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈব বিধি বিরচিত নিধিরাম শিশু॥

দেখা যাইতেছে যে, ১৬৭৮ শকাব্দাতে এই কালিকামঙ্গল রচনা সমাপ্ত হয়। সুতরাং গ্রন্থখানি ১৪৪ বৎসর পূর্ব্বে বা পলাশীযুদ্ধের বৎসর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে, এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্তির পাঁচ বৎসর পরেই, রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আরো জানা গেল যে, কবি রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, নিধিরাম কবিরত্ন,—বিদ্যাসুন্দর লেখক এই তিন কবিই সমসাময়িক। কবি কৃষ্ণরাম ৪৭।৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন, অনুমান করিলে তাঁহার মৃত্যুকালে ভারত-চন্দ্রের বয়ঃক্রম দুই এক বৎসর হইয়াছিল বলিতে পারা যায়; অপর দুই জনের হয় ত জন্মও হয় নাই।

ভারতের জন্ম সন যদি ঠিক হয়, তবে বিদ্যাসুন্দর সমাপ্তিকালে তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভারতের বিদ্যাসুন্দর সমাপ্তির পাঁচ বৎসর পরে নিধিরাম কাব্য রচনা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তখন শিশু। ইহা তাঁহার বিনয়-ব্যক্তি কি প্রকৃত কথা, কি করিয়া বলিব? প্রকৃত কথা বলিয়া মানিলেও কাব্য রচনার সময় তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের ন্যূন হইয়াছিল, আমরা মনে করি না। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, ১৬৫০ শকাব্দায় বা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে কবি নিধিরাম জন্মগ্রহণ করেন।

বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা বররুচি কৃত কাব্যে উজ্জয়িনী নগরীতে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরামও ঘটনাস্থান বর্দ্ধমান বলিয়া উল্লেখ করেন নাই কিন্তু রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র ঘটনাস্থল বর্দ্ধমান বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও ঘটনা স্থান 'উজ্জয়িনী' দেখিতেছি। এই কাব্যে আরো কয়েকটী পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। পরে দেখুন।

ভারতচন্দ্রাদিতে সুন্দরের পিতার নাম গুণসিন্ধু ও বাসস্থান কাঞ্চী বলিয়া বর্ণিত আছে, তৎস্থলে নিধিরাম গুণাসার ও রত্নাবতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রত্নাবতীস্থলে কয়েক স্থানে কাঞ্চী নামও দেখা যায়। বিদ্যার পিতা বীর সিংহ এই কাব্যে বিক্রমকেশরী নামে পরিচিত হইয়াছেন, আবার কোথাও বীর সিংহ নামও যে নাই, এমন নহে। ইহা হইতে আমরা আর দুইটি নূতন তথ্য জানিতেছি,—সুন্দরের মাতার নাম কলাবতী, বিদ্যার

মাতার নাম চন্দ্ররেখা। কবি সুন্দরের বাহন অশ্বটির 'ভুপা' নামটি দিতে বিস্মৃত হন নাই। মালিনীর কোন নামই দেখিলাম না।

অন্যান্য বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের কোন জন্মবৃত্তান্ত প্রকটিত হয় নাই কিন্তু এই কাব্য হইতে জানা যাইতেছে যে, সুন্দরের মাতাপিতা বহুদিন অপ্রসূতা-পত্য থাকিয়া বহু-আরাধন-তুষ্টা কালিকার বরে সুন্দরের মত পুত্ররত্নের মুখাবলোকন করেন।(১)

বিদ্যার বরান্বেষণার্থ মাধব ভট্টের ঘঠকালি-অভিযান ঠিকই আছে কিন্তু ভট্টমুখে বিদ্যার রূপগুণাদির কথা শুনিয়া সুন্দরের মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মূর্চ্ছা-ত্যয়ে উজ্জয়িনী যাত্রা। ভারতের বিদ্যাসুন্দরে আমরা দেখিয়াছি, বিবাহাদি অন্তে সুন্দর স্বদেশগমনোন্মুখ হইলে বিদ্যা বারমাসি গাহিয়া সুন্দরের মন ফিরাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু কবি নিধিরাম উজ্জয়িনীর পথেই সুন্দরকে দিয়া এক বারমাসী গাওয়াইয়াছেন।

মালিনীর বাজার গমনের কথা আছে কিন্তু বাজার হইতে মালিনী কি আনিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। পুঁথির এইখানে কয়েক ছত্র নাই বলিয়াই বোধ হইতেছে। পাঠ করিলেই ঐ স্থানে আরও কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয়।

বিদ্যার গর্ভসংবাদে রাণীর তিরস্কার ও কোটালের মারধরও কিঞ্চিৎ আছে। ভারতের কোটাল সুন্দরকে কি কৌশলে ধৃত করেন, সকলে জানেন। কবি নিধিরাম চোর ধরিবার এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়া-ছেন। বিদ্যামন্দিরের স্থানে স্থানে কপাটাদিতে সিন্দূর মাখিয়া দিয়া

(১)জ্যোতির্ব্বিদ্ কবি সুন্দরের জন্মলগ্নটিও দিতে আলস্য বোধ করেন নাই, এই দেখুন না—

সুরাসুর দুই গুরু বৈসে সপ্তমতে।
ঘটে বৈসে গণেশাদি মৃগমহীসুতে॥
কুমুদ সুহৃদসুত কামিনী আলয়।
বামনমর্দ্দনে বৈসে সিংহিকাতনয়॥
চন্দ্র সূর্য্য দৈত্য পূজ্য দেবাচার্য্য বুধ।
মহীসুত পদ্মরাজ সিংহিকার সুত॥
এ সকল তুঙ্গ কেহ কেহ উচ্চ ঘরে।
হেন হি সময়ে জন্ম সুন্দর কুমারে॥

কোটাল রজককে বলিয়া রাখে যে, সিন্দূরমাখা বসন পাইলেই রাজসরকারে সন্দেশ দিবে। এইরূপে সুন্দর ধরা পড়িতেছিলেন; মালিনীর উত্তরকৌশলে রক্ষা পান। মালিনীর বাড়ীর সুরঙ্গদ্বার অসংখ্য কটকে অবরুদ্ধ থাকে; সুতরাং সুন্দর গত্যন্তর না দেখিয়া সখীবেশে বিদ্যার নিকটেই থাকিতে বাধ্য হন। কোটালও বড় নাছোড়বান্দা,—সখীগণের পরীক্ষার জন্য একটী পরিখা খনন করাইয়া লয়। স্ত্রীবেশী সুন্দর খাত পার হইতে গিয়াই ধরা পড়েন। কোটাল সমীপে বিদ্যা অনেক নিষ্ফল কান্নাকাটি করিয়াছেন। মালিনীর প্রতি কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কি না, কবি বলেন নাই। আর আর বিষয়ে ভারতচন্দ্রাদির সহিত কোন অমিল নাই; তবে এই গ্রন্থে সে সবই সংক্ষিপ্তভাবে আছে মাত্র। চৌরপঞ্চাশতের কয়েকটী শ্লোক ত আছেই, তদতিরিক্ত কয়েকটী শ্লোকও পাওয়া যাইতেছে।

ভারতচন্দ্রের কবিত্বমুগ্ধ পাঠকগণের নিকট এই গ্রন্থের কবিত্ব বা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নয়। ভারতের পরে প্রাণরাম বিদ্যাসুন্দর লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া নদীকূলে বাসা নির্ম্মাণের মত বিফলপ্রয়াস করিয়া গিয়াছেন,—আমাদের এই কবি সম্বন্ধেও সেই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইতেছে। তবে ভারতচন্দ্রের কথা বিস্মৃত হইয়া এ কাব্য পাঠ করিলে যে ইহাতে তৎকালসুলভ কিছু সৌন্দর্য্য মিলিবে না এমন নহে।

পূর্ব্বে আমরা যে সুন্দরের বারমাসীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রায় ভারতের রচিত বিদ্যার বারমাসী হইতে অবিকল উদ্ধৃত। সামান্য পার্থক্য আছে মাত্র। তিনি কাব্যে আর কোথাও ভারতচন্দ্রের সম্পত্তি অপহরণ করেন নাই। আমাদের মনে হয় কোন খামখেয়ালী লেখকই পশ্চাৎ ভারতের বারমাসীখানি এই কাব্যে জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন।(২)

মাধব ভট্টমুখে বিদ্যার রূপ বর্ণনার কিঞ্চিৎ শুনুন—

সুন্দরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ।
কলঙ্কশরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥

(২)অন্য কর্ত্তৃক এইরূপ বিষয় বিশেষ প্রক্ষিপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল নহে। আলাওলের 'সয়ফল মুল্লুক ও বদিয়জ্জামাল' কাব্যে প্রকাশক হামিদুল্লা নিজেই বদিয়জ্জামালের বারমাসী লিখিয়া দিয়াছেন।

কষ্ট স্তব করে চান্দে পাই অপমান।
মাসে মাসে হরে জীএ না হএ সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হএ তুলনা।
আর কারে আনিয়া করিমু বিড়ম্বনা॥

* * *
* * *

খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ।
নয়ান দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেলো, মৃগ বন মাঝে।
চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥
তিলফুল যিনি চারু নাসিকার গঠন।
রূপ গুণ খগপক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জাএ আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর।
বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমশর॥
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হৈতে।
লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে॥

সুন্দরের প্রথম উপস্থিতিতে বিদ্যার উক্তিতে কিছু সৌন্দর্য্য আছে—

দুই জনের চারি চক্ষু হইল দরশন।
সাক্ষাতে দেখিলো যেন দ্বিতীয় মদন॥
লজ্জা পাইয়া বৈদগধি রৈলো খাটের হেটে।
ঈষদ্ হাসিয়া বীর বৈসে স্বর্ণ খাটে॥
হরিষে সুন্দরী করে লাস অভিলাষ।
কাহার ঘরের চোর আইল মোর পাশ॥
কোথার নাগর চোর আইল মোর ঘরে।
গৃহস্থ না গণি বৈসে খাটের উপরে॥
কি কারণে হাসে চোর কার কিবা দেখে।
না করে এমত কার্য্য লজ্জা যার থাকে॥
ওহে সখি! কি আশ্চর্য্য দেখরে জাগিয়া।
চোরে উপদ্রব করে কিসের লাগিয়া॥

এরূপ যৌবন মোর আশা করে চোরে।
নানা বেশ ধরে চোরে নানা লীলা করে॥
উপেক্ষি মরণ ভয় কেনে হৈলোঁ সাধ।
এরূপ যৌবন মোর চোরের প্রমাদ॥

ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শ্লোক গুলির দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, নিধিরাম কেবল বিদ্যা পক্ষেই অর্থ করিয়াছেন। একটী শ্লোকের অনুবাদ এই—

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং।
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীং॥
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং।
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

আমা প্রাণ কেমনি করে না দেখি বিদ্যারে। ঘোষা।
সে বিদ্যা সুন্দরী যেন ভুবনমোহিনী।
কনক কুসুম রেণু চম্পকদাম জিনি॥
প্রফুল্ল উৎপল ফুল ফুটিছে বদনে।
অঙ্গের ভূষণ মাত্র বিনোদ মোহনে॥
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চারু মদন বিলাস।
চান্দমুখে মৃদু হাসি তমঃ করে নাশ॥
খাইতে শুইতে মুই শয়নে স্বপনে।
সেই চান্দমুখী বিনে আর না লএ মনে॥
অখনেহ উঠে মনে পাসরিতে নারি।
কহ নবরত্ন সভা(৩) কি রূপে পাসরি॥
পুনি যদি পাই বিদ্যা তীর্থ নিরমল।
সেই জলে স্নান করি মরিলে সাফল॥
কাটিবা মারিবা রাজা মনে নাই ভয়।
না দেখিলুম সুন্দরীরে মরণ সময়॥
শুনিয়া চোরের মুখে কন্যার বাখান।
ক্রোধ হইল নরপতি অগ্নির সমান॥
কাটহ নিলাজ চোরে রাখিতে নাই কাজ।
চোরে বোলে আর শ্লোক শুন মহারাজ॥

(৩)কালিদাসাদি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নগণ বলিয়া বর্ণিত।

বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কারে বিদ্যার কৈফিয়তটি নিধিরামের নিজস্ব সম্পত্তি; ধর্ম্মভীরু, সরলচিত্ত পল্লীকবির লেখনীর উপযুক্ত কি না, একবার ভাবিয়া দেখুন—

সংক্ষেপে কন্যার কাছে বসিয়া বুঝাএ।
সংসারেতে অপকীর্ত্তি রাখিলি বিদ্যাএ॥
সাহস কেমন তোর চোর সমাইআ।
সঙ্গম করসি তুমি চোর যে লইআ॥
তোর বাপ নরপতি ভুবন পূজিত।
হেন অপকর্ম্ম কেনে কৈলা আচম্বিত॥
মাএর বচন শুনি সে চান্দ বদনী।
সাহস কপট ছাড়ি ভাণ্ডাএ জননী॥
শুন মাও তোমার বাক্যে মনে লাগে দুখ।
শরীর ভিতরে মোর হইছে কোন রোগ॥
সদাএ অজীর্ণ ভাব বহু দুঃখ পাম।
সপ্ত অষ্ট দিন অবধি গাও বেআরাম॥
ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্র নয়নে দেখিলুম।
সম্পূর্ণ সকলি ফল হাতে হাতে পাইলুম॥
স্বইচ্ছাএ শয্যা কৈলুম পাতিআ বিচনী।
সেই সে কারণে বুঝি উঠে মিছা বাণী॥
শয়নে বিবস্ত্র হইআ শুইলুম কৌতুকে।
সকৌতুকে ভূমিতে পোতলা কৈলুম নখে॥
সরোবর জলে গিআ পাএ পাএ বশি।
বিবশ হইআ মুই গোআইলুম নিশি॥
সুন্দী দোষে লক্ষ্মী চরিত্র কৈলু ভ্রষ্ট।
তেকারণে বুঝি আমার লক্ষ্মী হৈল নষ্ট॥

শ্রীআবদুল করিম।

মা।

আমি মরম ব্যথায় হয়েছি কাতর
তুমি দেখনা আমারে চাহিয়া,—
আমি বেদনা-চঞ্চল হয়েছি পাগল,
দেখে যাও বুঝি হাসিয়া।

মম হৃদয় ভাঙ্গিয়া নিরাশা কাঁদিছে—
মাগো ছিঁড়িয়া ফেলিছে আমারে,
শুধু আহত বাসনা বিফল রোদনে
ডেকে মরে যেন কাহারে।

আমি কতবার সাধি কাঁদি নিরবধি,
তুমি শুনে মা সে সব শোন না—
হায় কাঁদি আমি যত, হাস তুমি তত,
যাতনা বুঝেও বোঝনা।

ওমা আমি ডাকি যত 'এস তুমি কাছে'
তুমি দূরে যাও তত চলিয়া—
যদি আমি কভু বলি 'হাস একবার',
যাও মাতা অশ্রু ঢালিয়া।

আমি যাহা বাসি ভাল দিবস রজনী,
মাগো কভু ত সে সব কর না—
আমি আপন ব্যথায় আপনি পাগল,
জগদম্বে কর ছলনা!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

(২)

প্যারীমোহন কবিরত্নের কতকগুলি গান আমরা পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়কে উপহার দিয়াছি। অদ্য আরও কতকগুলি উপহার দিব। তিনি স্বভাব-কবি ছিলেন। ইতালী দেশবাসী একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে কবি ও সমাজদ্রোহী শিক্ষা দিয়া গড়া যায় না। তাহারা জন্মায়। কেমন সামান্য বিষয়ের উপর কবিতা লিখিয়াছেন, পাঠক মহাশয় আপনি বিচার করুন। প্রতিভার আর একটি গুণ এই যে, প্রতিভার কবিতা পুরাতন হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় প্যারীমোহন খাটি বাঙ্গালি কবি—ভেজাল নাই। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া জেলায় নিত্য ব্যবহার্য্য কলাইয়ের ডালের উপর আলু, মাছ, পাঠার মাস প্রভৃতির উপর প্যারীর প্রতিভার জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও প্রহসনের তীব্র শ্লেষ দেখিতে ভুলিবেন না। গানের ভিতর আসল কথা আছে।

মূলতান। একতালা।

১। (কলাই)

যত রকম ডাল আছে এ সংসারে কলায়ের কাছে সব শালা হারে।
আমরি কি মজা হয় গো আহারে দীকি ধরে যেন জুতো মারে॥
কোথা লাগে কাম্যকূপ কামধেনুস্বরূপ কল্পবৃক্ষ ফলে পায় না করে,
খেসারি মসুরি মুগ অরহর ছোলা, গরিবের পক্ষে আখাম্বা আছোলা,
ঘি মশলা না দিলে গলায় যায় না গেলা, পাতলা হলে খায় না নরে।
অনাহুতো অতিথি কুটুম্ব লোক এলে, গরম গরম ফেন ডেলে-ঢেলে দিলে,
যোগে যাগে দীনের দিন যায় চলে, সংক্ষেপে সম্ভ্রমে সারে।
হাঁসাবর্ণ বসবাস হাঁসখালি মূর্ত্তিভেদে নাম যার বিরি কালী
যার প্রতি প্রীতি করেন কালী, মা তাই মাসভক্ত বলি খান সাদরে॥
দিশি জাফরাণ হলুদ যাকে বলে, জলে গুলে তার এক বিন্দু দিলে
আদা লঙ্কা হিঙ্গে রিফাইন হলে সে সৌরভে কে রবে ঘরে?
বাঁকুড়া বর্দ্ধমান জেলার যত লোক কলায়ের মণ্ডে তারা বলে উপাসক
কোন কালে কোন ভোগে নাক রোগ সদা থাকে সুস্থ শরীরে॥

শীলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ি কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি
ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি হাঁড়ি হাতে করে দাঁড়ান দ্বারে।
তাতে যদি হয় টকের মাছের যাগ ভরণী নক্ষত্রে যেন মূলা যোগ
পেটে যেন ঢোকে ভস্মকীট রোগ সে যোগ কি কেউ মার্ত্তে পারে॥
খাসীর খাসা মাসে অনাটন হলে মাসকলায় তাতে গোঁজা দেওয়া চলে
ভুঁড়িমোটাবাবু করে তুলে ফেলে, মহাবায়ুর পিত্ত পলায় দূরে।
এমনধারা ডেলে দোষারোপ যে করে কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে
মাংসতুল্য গুণ মাসকলাই ধরে শিব লিখেছেন তন্ত্রসারে॥

ঝিঁঝিট। তেতালা।

২। (আলু)

আলুর সমান জিনিষ কিছুই নাই জগৎ সংসারে ভেবে দেখ ভাই
সুমিষ্ট বিধির সৃষ্ট বালাই লয়ে মরে যাই।
আলুর নাইকো ছোবড়া আঁটি আঁস ছাড়ালে সকলই শাঁস
শীত বর্ষা বারমাস পাওয়া যায়—
ঝালে কি ঝোলে অম্বলে যাতে দেবে তাতেই মেলে
দেবামাত্র গলে যায়
মরি কি সুতার, তার কি কব তার,
এমন আলু যে না ভালবাসে তার ভালবাসার মুখে ছাই॥
গোল গোল কি সুঠাম, যেন সাদা শালগ্রাম,
রাস নাম বিলাতী আলু বলে।
তরকারী দলে যত ভূমণ্ডলে আলুর নীচে সকল শালাই ঝোলে,
দেহে বাড়ে বল বাহ্যে হয় সরল রক্ত সাফ এক হপ্তা খেলে
বিনাশে কফ পিত্ত বাই॥
ভেজে খেলে যায় জলকাশি, বর্ণে হয় শশী দোষী
বারমাস টাট্‌কা থাকে ভাইরে—
মাগমরা পুরুষের পক্ষে, এমন জিনিষ ত্রৈলোক্যে
ভেবে দেখ আর কিছুই নাইরে,
খেয়ে ভাতে ভাত করে কুপোকাৎ
প্যারী হেসে বলে আলু যেন বিদেশে তোমায় পাই॥

ভৈরবী। একতালা।

৩। (মাছ)

মাছের মতন খাসা খাবার জিনিষ আর কিছুই নাই ভূমণ্ডলে।
ঘ্রাণে পঙ্কবৎ অন্ন চলে, কালিয়ে কাবাব কোপ্তা
পোলাও আদি জীনবৃক্ষে সব ফলে।
পঞ্চ মকারেতে প্রধান মীন মকার যানা হলে ক্রোধ হয় মা কালিকার
ভগবান হয়ে মৎস্য অবতার, নিমগ্ন ছিলেন জলে।
ঝোলে বাসুদেবের মন ভোলে, পুরী ফাউল করি পাঁউরুটি বিস্কুট,
যার নীচে সব ঝোলে।
শ্বেত রক্তবর্ণ সুন্দর সুঠাম, রুই মৃগেল কাৎলা নানাবিধ নাম,
যে না খায় তার ভগবতী বাম, মলে যায় নরকানলে।
তন্ত্রে স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বলে, আচার বাসি খেলে ইলিস মাছ স্বশরীরে স্বর্গে চলে।
মদের সঙ্গে পচা খেলে ভেঁটকী ঝুরো, অহোরাত্র সিদ্ধিসাধন রয় পুরো,
তার পিতৃলোক স্বর্গে সুখে নৃত্য করে, আনন্দে দুহাত তুলে।
বলে বংশে জন্মেছে কি সুছেলে, আবার টাট্‌কা এণ্ডাযুক্ত খেলে তপ্‌সে ভাজা,
চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে, মোটা চিংড়ী দিয়ে খেলে ছোলার ডাল, ভবসিন্ধু মাঝে
বাঁধে পুণ্যের আল, নির্ব্বাণমোক্ষ তার পক্ষে শক্ত গাল, হুরমুতের দাবী চলে।
কবিরত্ন কয় কৌতুকে, যেতে ইচ্ছা নাই গোলকে, থাক্‌বো এই ভূলোকে
চিংড়ী বারমাস যদি মেলে।
বিশেষত বাঙ্গালায় বাঙ্গালির পক্ষে, মৎস্য তুল্য দ্রব্য দেখা যায় না চক্ষে,
চক্ষে দৃষ্টি রয়, বংশ বৃদ্ধি হয়, দেহ থাকে সবলে।
বাঙ্গালায় তেল না মাখিলে, না মাছ খেলে, চক্ষু হয় কাণা ঘটে ব্যাধি নানা,
যায় অল্প কালে কাল কবলে।
অক্ষয় লেখক যিনি অক্ষয়কুমার দত্ত, তেল না মেখে মাছ না খেয়ে উন্মত্ত,
বাহ্যবস্তু ভেবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য কে না জানে কে না বলে।

কবির সুর। আড়খেম্‌টা।

৪। (পাঁটার মাংস)

সদ্যপাপ ধ্বংস পাঁটার মাংসেতে করে।
পাঁটার মাংস যে জন খায় গো বারমাস তার পাপ থাকে না শরীরে।

শিবের তন্ত্রেতে বলে, মধুকোষ খেলে, তার করতলে চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে, মলে কালের গালে কালী দিয়ে, যায় কালীপুরে থাকে নিষ্করে।
ক্ষীরোদ মহনকালে সুরাসুর দলে, সুধভাণ্ড জন্য যখন দ্বন্দ্ব ঘটালে, এ সুধা ভাণ্ড ছাগের অণ্ড, ঠাকুর লুকিয়েছিলেন ছল করে; গাওয়া ঘৃত দিয়ে তায় গরম মশলাতে মিশায়ে, অতি ভক্তিভাবে নিবেদন করিয়ে, কালিকায়, কুশম কুশম প্রসাদ যে জন পায়, তার পুণ্য ধরে না চরাচরে।
যারা অর্থ জানে না, করে মাংসেতে ঘৃণা, যে গুণ অনন্তমুখে বল্‌তে পারে না, মলে গতি হয় না, গঙ্গা পায় না, সে মাংসেতে যে রোষ করে।
মহাপ্রসাদে যায় দ্বেষ, মহামায়া দেন তায় ক্লেশ, মহানরকে মগ্ন হয় শেষ, সংসারে সে পায় না সুখলেশ, চিরদিন দুঃখে মরে।
পাঁঠার মধুকোষের চাম, সুন্দর সুঠাম, যদি কেউ কুঁড়োজালি করে জপে গৌরনিতাই নাম, নিতাই তার নিত্য পুরাণ মনস্কাম, অন্তে অগ্রদ্বীপাস্তরে।
এ বচন ছিল গোপনে, প্রচার হল এতদিনে, টীকে টীপ্পনিতে লেখা বেল্লিক পুরাণে, কবি বিদ্যাশূন্য বেল্লিক বাগীশ, বচন দিয়েছেন প্রকাশ করে॥

জংলা। একতালা।

৫। (বেগুণ)

কব বেগুণের গুণ যে কত।
গুণে সবাই বশীভূত, উচ্ছে ঝিঙেপটল কুমড়ো, কি কাঁচকলা
কে আছে বেগুণের মত॥
এমন আনাজ আর মেলে না ভূতলে, বারমাস প্রায় সব দেশে ফলে, ভেবে দেখ, কোন্ ব্যঞ্জনে না চলে, কেউ নয় বেগুণে বিরত।
সপ্তগুণ মাত্র লিখেছেন নিদান, নিদানের বোধ হয় না জেনে নিদান, কিবা রূপবান্; বেগুণ গুণবান্, ধরেন গুন কত শত॥
অল্প দামে অধিক পরিমাণে মেলে, পীড়াদায়ক নয় পেটভরে খেলে, এক গৃহস্থ কাবার একটি বেগুণ পেলে, কিন্তু মেলে যদি মনের মত॥
কাবাব হয় বেগুণে অতি চমৎকার, সুধা লজ্জা পায় এমনি তার সুতার, এ জন্মে ভোলে না খায় যে একবার, হ'য়ে থাকে অনুগত॥
দেবতার দুর্ল্লভ শীতে বেগুণপোড়া, কে নয় জগতে বেগুণ পোড়ার গোঁড়া, যে না খায় সে থাক্ পাপের কলা গোঁড়া, খায় না বোধ হয় পশু বড়!

আলু মটরশুঁটীর সঙ্গে হ'লে যোগ, ডাল্‌না নাম ধরেন ভগবানের ভোগ, ঋষির মন রসে, যোগীর ভাঙ্গে যোগ, হ'য়ে থাকে পদে নত।
ঘিয়ে ভেজে যখন বেগনি রূপ ধরে, গরম গরম যদি তোলা যায় অধরে, লুচি ফুল্‌কোলুচির সর্ব্বনাশ করে, দিলে পর্ব্বত পরিমিত।
ব্যাসনেতে হ'লে তিল পিটুলি ভাজা, গোল গোল যেন চাঁদসই খাজা, সাধ করে খায় কত রাজা প্রজা, কিনে আনে ক্রমাগত।
গোটা চারি গাছ যার ভিটেয় হয়, বার মাস বার্ত্তাকু তার গৃহে সঞ্চয়, কল্পবৃক্ষবৎ ফুরাবার নয়, ফলে ফল ভূতগত।
কবিরত্ন কয়, ওহে ভগবান্! এই বর আমারে কর হে প্রদান, বেগুণ যেন গৃহে থাকেন অধিষ্ঠান, সুখে ঝুরো লুসি নিয়ত॥

সুরট মল্লার। তেতালা।

৬। (কপি)

বড় চিংড়িতে কপিতে শীতে যদি হয়।
বড় সুখোদয়, এ কথা নিশ্চয়, ভাগ্যবানের ভাগ্যে ফলে
দুর্ভাগাদের ভাগ্যে নয়॥
আলু মটর মিশাইয়ে, অভিষিক্ত গাওয়া ঘিয়ে, জাফ্‌রাণ আদি মস্‌লা দিয়ে,
যখন পাক সমাধা হয়।
কি তরকারি বলিহারি, অনেকের দর্পহারি, মলিন মলয়াগিরি,
খোসবয়ের প্রবাহ বয়॥
সুধার সুগর্ব্ব করে রে খর্ব্ব, দুনিয়াতে যত জিনিস কপির কাছে বিষময়।
বসে কারপেটের আসনে, ঢেলে পবিত্র বাসনে, অশনের পূর্ব্বাহ্নে
যখন সম্মুখে প্রস্তুত রয়॥
মনোহর মূর্ত্তি হেরে, এম্নি মনে ইচ্ছা করে, গরম গরম দিই উদরে,
আর কি বিলম্ব সয়!
তুলে মুখে, ভাসি সুখে, যেন খেতে খেতে স্বশরীরে স্বর্গে যাচ্চি সে সময়॥
কল্কি পুরাণে লিখন, ছাগ মাংসের আস্বাদন, ধর্ম্মরাজের মুখে শুনে স্বয়ং বিষ্ণু নারায়ণ, লোভে পড়ে লক্ষ্মীপতী, করিলেন কপির উৎপত্তি, ছাগলের বদলে শাক উৎপাদন; মাংসের আস্বাদন, ধরে সেই কারণ, তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতে চলেন কপি মহাশয়।

কপি কৈয়ের ফলশ্রুতি, বর্ণিতে অসক্তি শ্রুতি, অসংখ্য গুণ ধরেন কপি স্বীয় গুণে গুণময় ফুলকপি মাছের ঝোলে, জগতে মন কার না ভোলে, অরুচি অসুর বেটা পরাজয়।

কবিরত্ন কয়, আমায় হও সদয়, এ কপি খায় না যারা, লোকে তাদের কপি কয়॥

সুবুদ্ধি পাঠক অনায়াসেই বুঝিয়াছেন সমাজদ্রোহীর উপর কবির খরতর দৃষ্টি; তিনি প্রহসন লেখেন নাই সত্য কিন্তু সমাজের পাপ তাঁহার চক্ষে ধূলা দিতে পারে নাই। সমাজ সংস্কারের উপর তাঁহার খরনজর সর্ব্বদাই পড়িয়াছিল। কবির সময়ে ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল আর যুবার দলাদলির ত ছড়াছড়ি। কবি লণ্ডড় লইয়া দাঁড়াইয়াছেন—

খাম্বাজ। একতালা।

৭। (দাড়ি)

চাঁপদাড়ি রাখা, চোকে চসমা ঢাকা ভয়ানক ঢং চেগেছে বাঙ্গলাতে।
এ পথের পথিক নম্বরে অধিক দেখা যায় কেবলই ইয়ং বেঙ্গলেতে॥
যাদের আঁতুড়েগন্ধ গায় পাওয়া যায়, চসমা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,
সে সংসাজা দেখে কার না হাসি পায়, গম্ভীরভাবে বসে থাকেন চেয়ারেতে।
ফিলজফার যেন ভাবচেন ফিলজফি, নবাবী আমলের পুরাণ মৌলবী,
বেদব্যাস কিংবা কালিদাস কবি, নিমগ্ন রয়েছেন থিওরি চিন্তাতে॥
চেনা যায় না এখন হিন্দুমুসলমান, চেহারা চকে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুয্যে কি রসুলবক্স রমজান, অনুমান করা কঠিন এক্ষণেতে।
দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ, দাড়ির সঙ্গে নাই ধর্ম্মের সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ, কামানো পয়সাটা পায় না নাপিতে।
প্রাচীন প্রণালী দিয়ে যমের বাড়ী, নকল তুলে নিতে ছুটে তাড়াতাড়ি,
সাহেবেরা চটা দেখে চাঁপদাড়ি, কবি কয় তবু প্রবৃত্তি দাড়িতে॥

বাহার। ঠুংরি।

৮। (হঠাৎবাবু)

কতক অফিসার, পামর ঘোর পাতকী নারকী নচ্ছার।
আধুনিক অন্তজের ছেলে, চটে যান পরিচয় নিলে,
কেউ মালা কেউ জেলে, বইত জলের ভার।

(সহরে) কাল বুট ষ্টকিং পায়, আলপাকার চাপকান গায়,
কড়া মেজাজ হঠাৎবাবু হঠাৎ অবতার।
জ্যাকেট পাণ্টুলেন আঁটা, কোঁকড়া চুলে বাঁকড়া কাটা,
এলেন যেন বিলাত থেকে চিনে উঠা ভার।
গলে চেন, রুমাল হাতে, শীলআংটী সব আঙ্গুলেতে,
পা পড়ে না পৃথিবীতে, এমনি অহঙ্কার।
বজ্জাতি সব হাড়ে হাড়ে, মনে মনে কাতলা পাড়ে,
জেল হয়েছে মামার বাড়ী মাসে যান দুবার।
সেকেলে মানুষ পেলে, ডাকেন পাস নেওসে ব'লে,
পয়সা সব পকেটে ফেলে, অমনি কাম্‌রা পার।
আহার শুনে হেসে মরি, রোচে না বেঙ্গলী কারী,
অক্‌স টং ফাওলকারী, দু সন্ধে আহার।
বাপ দেশেতে ক্ষেতে খাটে, মা বোনেতে চরকা কাটে,
রাঁড়কে শোয়ান ছাপর খাটে, পরান গুলবাহার।
বদ্‌মায়েশ নেশাখোর, দিবানিশি নেশায় ভোর,
জুত ছাতি ব্যাগ চোর, চোরের সর্দ্দার।
প'ড়ে দুপাত এ বির বই, বলেন না অল্‌রাইট বই,
হাত কাঁপে নাম কর্ত্তে সই, বিদ্যা চমৎকার।
পা ফেলে ইংলিশ চঙে, কথা কন ইংলিশ টঙে,
ধরা পড়ে যান রঙ্গে, আবলুসের আকার।
দ্বিজ কবিরত্ন বলে, এ দেশে না জন্ম হ'লে,
চল্‌তো নাকো এ বাবুদের ডান্‌হাতের ব্যাপার।

বাহার। পোস্তা।

৯। (উকিল)

সুখ নাই উকীল মহলে, ওকালতীর প্যাঁচ লেগেছে, উকীলের গোলে।
কোর্টে নাই মিছিল মাম্‌লা, ভাবছে বসে সকল আমলা,
উকীলেরা বেচ্চে স্যাম্‌লা, কিসে দিন চলে।
এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভুত,
হ'য়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদ্‌চে সকলে।

হরিঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ ঢুকচে কেউ বেরুচ্চে, নর্দ্দার বগলে।
পূর্ব্বে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়,
কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হাইকোর্ট সাম্‌লাময়, উকীল সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্চে হলে।
যাদের পসার হ'য়ে গেছে, আয় তাঁদের সমান আছে,
তাঁদের নাই হাজা শুকো বারমাস চলে।
* * * বাড়ি, করে যেমন কাড়াকাড়ি,
তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে।
যাদের না অন্ন যোটে, শাইনিং নাইকো মোটে,
জুট্‌ছে সব জেলকোর্টে, বোম্বেটের দলে।
কি দুর্দ্দশা কব কার, কেউ হ'চ্চে ব্যবসাদার,
বাসাখরচ চলা ভার, কবিরত্ন ঠিক বলে॥

বিভাস। একতালা।

১০। (পয়সা)

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল।
পয়সা ভিন্ন হয় না পুণ্য, মান্য গণ্য কে করে বল।
পয়সা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে, প্রাণের সহোদরে সমাদরে আলাপ করে না,—বন্ধুগণে তায় না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না—পিতামাতা, কন না কথা, মর্ম্মে ব্যথা দেন তার প্রবল।
নারকী নরেশ করে, পাপ পয়সা হ'লে পরে, পুণ্য হয় সংসারে, নরে কে না করে যশোগান—অর্থবশে অনায়াসে, সভায় বসে হ'য়ে মান্যমান; কুলে শীলে দীন হলেও, কুলীন বলে তারে সকল।
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণপ্রেয়সী রসবতী, রোষান্বিত হ'য়ে অতি, পতির পাশে ঘেঁসে না—সদাই বলে, বাঁচি মলে, পোড়া কপালে সুখ হ'লো না; পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল।
কত পুরুষ মেগের ভয়ে, গহনাগঞ্জনা দায়ে, রেতে থাকেন বাহিরে শুয়ে, চোরের মত হ'য়ে ভাই,—উঠে এসে গিন্নির পাশে যদি বলে একটু আগুন

চাই (গিন্নি তামাক খাব আগুণ চাই) চাইলে আগুণ, হ'য়ে আগুণ, বলে আমার পাপ কেন এলি।
সেই পুরুষের পয়সা হ'লে, অমনি গিন্নি ঘোমটা খুলে, কাছে এসে হেসে বলে, কর্ত্তারে জলখাবার দেও—পিত্তি প'ড়ে, হবে পীড়ে, যদি না খাও আমার মাথা খাও, কবি বলে, ভূমণ্ডলে পয়সায় পিরীত যেন কেবল।

বসন্ত। তেলেনা।

১১। (ধন)

ওরে মন! তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন।
ভেবে দেখ সব অকারণ॥
তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে সমন॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে,
রেডিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন।
শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ।
হ'লো আয়ু আয়ের ঘরে শন্তি কল্লে নাকো দরশন॥
অর্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, * * পরে তসর কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন।
কার জন্য কর মর কি কারণ।
তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ॥
শোন্‌রে মন ইষ্টপিট, আর ক'রো না ডিপজিট।
আর কিন না কলের ইট, আস্তাবলের কারণ।
দীন হীন দরিদ্রে কর বিতরণ।
যে ধনে হ'লো না পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন।
কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা,
ধরবে নানা খানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ।
তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ-হুতাশন।
হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ॥

কালেংড়া। আড়খেমটা।

১২। (কলেরজল)

বিপদ কল্লে কলের জলে, এ জলে অনেকে জব্দে,
গালে হাত ভাব্‌ছে বসে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে।

কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোর গোলযোগ, দানা পায় না আস্তাবলে।
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাম্‌কি' ক্লারও ঘরে;
একটি দিন না মাথা ধরে; সবাই আছে কুতূহলে।
'রাম নাম সত্য'বাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী,
খোট্টাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গলিজ মহলে।
ভয়ানক গর্‌মি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল,
নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটা না জ্বলে।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জ্বলে।
জানাচ্চে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে, হাত তুলে হাত তুলে কেবল কপালে।
হেলথ আফিসার এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে, দেখে কবিরত্ন বলে॥

কবির সময়ে মদ্যপানের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। মদ না খেলে বড় লোক হয় না, মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ হয় না, ভয় যায় না—ভরসা হয় না, শরীর ভাল থাকে না, লোকের এই সব ধারণা ছিল। প্যারী কবিরত্নের একটি গান অসংখ্য সুরাপান নিবারণী সভার কাজ করিয়াছে। মনে রাখিবেন, মনে করিলে তিনি মদের সুখ্যাতি করিয়া সুন্দর গান করিতে পারিতেন।

জংলা। একতালা।

১৩। (মদ)

খেওনা খেওনা ছুঁইওনা মদ বদ্ জিনিষ ভাইরে।
অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি, মতিমান নরে করে হীন মতি,
অল্পদিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি সর্ব্বনাশের চাঁইরে॥
বিনাশে পদ ঘটায় বিপদ, করে দুরাশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ পাতকের হ্রদ, মদ আপদের খাঁইরে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে, কলেবর ত্যাগ করে গো-ভাগাড়ে,
চিনি রিফাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষ্মীর বাড়ে ঠাঁইরে॥

যারে দংশায় সুরা কালসাপ, কলঙ্কসাগরে সেই দেয় ঝাঁপ,
নানা রোগভোগে পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাইরে।
নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল, বিষয়ে বিরক্ত কাজকর্ম্মে ভুল,
হিত উপদেশ যেন বাজে শূল, রেগে হতে হয় কাঁইরে॥
কথাতে বেতাল মুখে ভাঙ্গে লাল, চলে যায় বেঁকে লোকে বলে মাতাল,
পথে ঘাটে পড়ে খায় কত তাল, ছিছি এমন পাজি নেশা নাইরে॥

কবি পারমার্থিক সঙ্গীতে সিদ্ধহস্ত, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। শেষের সে দিনের দুইটি গান শুনাইয়া আমরা অদ্য বিদায় লইব।

মূলতান। যৎ।

১৪। (শেষপথ)

সে পথের কি কর্‌লি তা বল।
যে পথে তোয় যেতে হবে সে পথের সম্বল।
ছাড়্‌বেনাকো কোন মতে ক'ল্লে কোন ছল।
বাছ্‌বেনাকো কাদা কাঁটা জল কি জঙ্গল।
ধনী ব'লে ডরাবে না দেখে ধনবল।
বলী সম বলী হ'লে খাটবেনাকো বল।
সুজন সরল পক্ষে সে পথ সরল।
কুটিল কপট পক্ষে সে পথ গরল।
সে পথ লক্ষ-যোজন তারাই বলে, মনে যাদের মল।
পলকে পৌঁছিতে পারে মন যাদের নির্ম্মল।
পথের মাঝে বৈতরণী, সে নদীর জল অনল।
তায় নাই তরণী মাঝী যাবি একাকী কেবল,
যাবে সঙ্গে যমদূত ভয়ানক অদ্ভুত সকল।
তারা ধম্‌কে ধল্‌বে, গরম জলে সাঁতার দিয়ে চল।
নির্ব্বাণপ্রদীপে তৈল প্রদানে কি ফল।
কি হেতু তুই বাঁধ্‌বি সেতু বহে গেলে জল।
প্যারী বলে, শোন সে পথের আছে একটা কল।
এই বেলা কেবল খালি কালী কালী বল্॥

মূলতাল। একতালা।

১৫। (ভবনদী)

কালী বল মন আমার।
ভয়ানক ভবনদী নির্ভয়ে যদি হবে পার॥
সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরণী পরে,
পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার।
সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতিকার।
কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে,
কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার।
দয়াময়ীর দয়া যারে, সেই জন যেতে পারে,
পদতরী দেন তারে, কালী হ'য়ে কর্ণধার।
শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে,
কি চিন্তা মরণে রণে, শিববাক্য সার।
দ্বিজাধম প্যারী বলে, মা আমার আসন্নকালে,
জিহ্বা যেন বিল্বমূলে কালী বলে অনিবার॥

গ্রন্থ সমালোচনা।

খিচুড়ী। শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামি প্রণীত, ১৩০৮, মূল্য ৸৹ আনা। এখানি ব্যঙ্গকাব্য। ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলিলেও চলে। বিবাহবিভ্রাট কি তাজ্জবব্যাপার আর এক প্রকারের জিনিষ। ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ভারতোদ্ধার কাব্য বহুদিন পূর্ব্বে রামদাস শর্ম্মা যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যঙ্গ কাব্য বটে কিন্তু ঠিক এই শ্রেণীর নহে।

"পুণ্যদিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
ঘোম্‌টা খুলে কুলবালা ইংরাজে সম্ভাষে॥"

—ইহাকেও সমশ্রেণীর আসন দিতে পারা যায় না। তবে "আজব সহর কলিকাতা" যিনি লিখিয়াছেন তিনি এই শ্রেণীর কবিতা বুঝিতেন। এই

শ্রেণীর কবিতার আমরা পূর্ব্বে স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। পাঠক মহাশয়ের কি মনে নাই—"নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের কুলে?"

বা— "সকল বিদ্যার থৈ বুদ্ধি ভাজা খোলা।
বিধি বিড়ম্বনায় আজ কানে গোঁজা সোলা॥"

বলাই বাহুল্য ইহার সঙ্গে—"আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত"

বা—"বঁটাইয়া দিই যত পাপিষ্ঠ ইংরাজে" ইহার তুলনাই হইতে পারে না। বহুকাল পূর্ব্বে চণকচূর্ণের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তারপর প্রত্যহ সাদা ফেক্‌ফেকে ভাতগুলা খাইয়া আমাদের "ভাতাসে" ধরিয়াছে। এমন সময়—বিশেষত বর্ষার দুর্দ্দিনে, যখন লোকের নিজ নিজ দ্রুত কণ্ডুয়নে কোনরূপেই আশা মিটে না; যখন কেবল ভেকের মক মক রব শোনা যাইতেছে; যখন গসলা বৃষ্টির আবশ্যকতাই নাই, দু-ফোঁটা বৃষ্টি হইতে না হইতেই ভেকেরা ডাকিয়া অস্থির, তখন—খিচুড়ী যে Welcome তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজনের দায়ে পাছে জাতিচ্যুত হই, এই ভয়ে তফাৎ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলাম, পেয়াজ আছে কি না আর খাঁড়ি মসুরির কি না? তখন কে যেন কর্ণে কর্ণে বলিল, গোস্বামীর ব্যাপারে ও সব বৃথা ভয় কেন করিতেছ? আমি আর কিছু না বলিয়া মাত্র ঈষদ্ধাস্যে উত্তর দিয়া আচমন করিলাম। কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা না করিলে চুপ করিয়া থাইয়া চলিয়াই যাইতাম কিন্তু ইঙ্গিত করিলেও ত পূর্ণ বিপদ হইতে পারে। তাই স্পষ্টই বলি, এত তেজপাতা ফট্ ফট্ বাবু ভাল নয়। আর দেশী হলুদে কি হইত না, বিদেশী জাফরাণ দেওয়া কেন? আমরা কাজেই Welcome বলিতে বাধ্য হইয়াছি। সর্ব্বশেষ কথা গোঁসাইগোবিন্দ লোক কখন নবাবী ব্যাপার জানেন না, কি নবাবী চুলোয় যাক্ শাক্তের ব্যাপারও জানেন না, তাই খিচুড়ীটি আলুনী করিয়াছেন। যাঁরা খিচুড়ী-বিলেস তাঁরা ভিন্ন আর কেহ আঁকাগন্ধটুকু ধরিতে পারিবে না। মনে করিতেছেন নিন্দা করিতেছি—কখনই না, এই দামোদরে হাত বুলাইয়া দেখুন, আর উদ্গারের ধ্বনিতে কেহ না মনে করেন, বুরযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, তাই কেল্লায় তোপ হইতেছে। আমরা উঠিলাম, এখন মহাশয়েরা পাতা করিয়া বসুন—যিনি আস্বাদন করিতে পারিবেন না তিনি দুর্ভাগ্য। রান্নাঘরে উঁকি মারিতে হইবে না, চাকাইতেছি—

সমাজ পানে চাইলে পরে
কেঁপে ওঠে পা,
ভয়গুলো সব কাঁটা দিয়ে
ছেঁয়ে ফেলে গা।
হাতটা নেড়ে গ'র্জ্জে গ'র্জ্জে
করিয়ে বদন রক্তিমে,
বন্দ্যো বক্তা যতই কেন
করুন গিয়ে বক্তিমে!
যে দিকে তাকাই সেই দিকে ভাই
মরীচিকা সাম্‌নে পড়ে,
জলের আশায় ছুট্‌ছে হরিণ
দেখ্‌লে প্রাণটা ধড়াস্ করে!
বন্দ্যো বলেন ছেলেগুলো সব
ফিরিয়ে দেবে দেশের ধাঁজা—
আমরা বলি
হুকের উপর সখ্‌টা রেখে
উঠিয়ে দিচ্ছে গুলি গাঁজা,
উঠিয়ে দিচ্ছে মাতৃভক্তি,
শুধুই শিখ্‌ছে শক্তিপূজা।
আঁচিল দেখ্‌লে লাগিয়ে দিচ্ছে
হোমিওপ্যাথিক শুভ্র থুজা।

লজ্জা সরম হিন্দুর ধরম,
এরা ত সব প্রাচীন অতি,
এদেরি বক্ষে হানিয়া ছুরিকা
ফিরাইছে সব নারীর মতি।
মাধুরীঘেরা, স্বভাব-ধীরা
মৃদুভাষিণী কামিনী
সেমিজ পিন্ধি, মুখরা ভূত্বা,
চলু চঞ্চল-গামিনী।
শাশুড়ী সঙ্গে করিছে তর্ক,
নাড়িয়া নাড়িয়া হস্ত,
ঈষৎ কষায় শুদ্ধ ভাষায়,
বুড়িটা হ'তেছে ত্রস্ত।

এক মনে এরা পড়িছে Novel,
পড়িছে রোহিণী কাহিনী,
ভারত ত্যজিয়া নবীন বাবুর
"উত্তরা" হৃদয়মোহিনী।
দ্রৌপদীর ছিল পাঁচটি সোয়ামি
রাঁধিত সে পরিপাটী—
তাই
কি জানি কি হয় এই মনে করি'
এঁরা ডা'লেতে দেন না কাটি।
এদের
New edition বউগুলো সব
এক ছাঁচেতে ঢালা,
রূপের আগুনে কর্পূর দিয়ে
জন্থ কে করেছে আলা।
আবার
সোয়ামিগুলির আক্কেল দেখে
হাসি পাখী ডাকে খিল্‌খিলি—
এখানে
কবিতা বধূটি কবিরে বলেন—
বঁধুয়া
যুৎ পেয়ে ভাই মিল দিলি।

এরা
Acidity & Sugarএর ভয়ে
Divorce করেছে মিষ্ট,
আর
জেলি মাখাইয়া বিস্কিটে বলে
ইহা স্বাস্থ্যের করে ইষ্ট।
এদের
রুচির কথাটা মনেতে হইলে
রক্ত চলয়ে ফিন্‌কি,
এদের
রোচে নাকো এবে খাজা গজা পেড়া
মতিচুর আর নিম্‌কি।

এরা
চকলেট্ খায় তাকিয়ে তাকিয়ে
গোল্লায় করি তুচ্ছ,
দুটি সের কেহ বর্‌ফি খাইলে
তার হাসিয়া ঘোষেন কুচ্ছ।
তোমরা এ সব
ত্যাজ্য করেছ, ন্যায্য বুঝিয়ে
আমরা ইহাতে তুষ্ট;
তোমরা
চকলেট্ খাও কট্‌লেট গেল
বয়ং ভবিষ্যামঃ নহি রুষ্টঃ।
দুটি প্রাজ্ঞ ভাষার বনে
হেলে দুলে চ'ল্‌ছে,
একের গুণে Black Serajটা
ঝক্‌মকিয়ে জ্বলছে;
সাহেব গুলোর কালির দোষে
সিরাজ ছিল ঢাকা,
ঘ'সে মে'জে ক'ল্লে তারে
কোজাগরের রাকা,
ঢি ঢি ক'রে অক্ষয় ভায়ার
নাম্‌টি উঠ্‌ছে জাঁকিয়ে,
প্রভাহীন হয়ে নিখিলচন্দ্র
কেন আজ শুধু তাকিয়ে!
Obscure হ'লেম ব'লে
মনে জাগছে ভয়,
ও সব humbug Dear Nikhil
কুচ কাম্‌কো নয়।

কলম্বসের মত ছিল
হাতে দুটি রেখা
তারই বলে ভায়ার আমার
সিরাজখানি লেখা।
Literary Colombus ভাই
তুমিই বঙ্গদেশে

ধন্য তোমার Discovery
বল্‌তে হ'ল শেষে
তোমার পাশে আর একজন
হাতে ধ'রে Pen
উনিই বুঝি মনে নিচ্ছে
দীনেশচন্দ্র Sen
চক্ষু দুটি পটল চেরা
প্রতিভাতে আঁকা,
বল্লে পরে বেজার হবেন
পথ ধরেছেন বাঁকা।
Taineএর "ট"টায় টান দিয়েছেন
Earleএর পাকাপানা;
বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসটা
কারো ছিল না জানা।
তোমার দাপে কেচিৎ Braggart
দিয়াছেন গা ঢাকা
"কড়্‌চা তত্ত্ব" পড়িয়া মতি
হয়ে আছেন Tom ভ্যাকা
মতি কে? by the bye
ইহারই broder শিশির চন্দ,
গৌরবোলা ন্যায়িক সন্দ,
বহিছে মলয় মন্দ মন্দ
শিশির গুণ গাহি রে;
বৈষ্ণব কবি গ্রন্থ বাহির
করিল যতনে ভক্ত শিশির
বিরস হইল জগদানন্দ,
শিখা ঘুচাইল মধু গোবিন্দ
রজকিনী বলি চণ্ডীদাস
ফেলিল ঘন উষ্ণশ্বাস,
জ্ঞানদাস বলে ত্রাহিরে।
খসে গেল মম by the bye;
এখন দীনেশ তোমারে চাই
শিশির মোতিম নিছনি লইয়া
এস যাই ভাই দূরে পলাইয়া

Philosophical lengthy words
এক দমসে ঝাড়ি,
দত্ত হীরেন্ তোমার সঙ্গে
কাহে না দিল আড়ি ?
Intuiton anachronism
Cogitation বুলি
হেগল হ'তে যতন ক'রে
কাহে না নিল তুলি ?
নবীন বাবুর নব Boswell
Critic কুলাধিপ
কাব্য বনে শোভিছে জনু
যমুনা কূলে নীপ।
"কড়চা তত্ত্বে" মতি বাবুরে
কল্লে পাড়ু যবে
দ্রোণাচার্য্য নীরব কেন
বুঝ্তে নাল্লু সবে।
এক Boswell হীরেন্ বাবু,
তাঁরই আবার Boswell
ঘুরিয়ে বল্লে Carbuncle
খুলে বোল্লে Black jewel.
অন্ধকারে ডুব দিয়ে ভাই
Fact তুলেছ যত
দেড় বুড়ি তার imaginary
এক বুড়ি তার হত।
বাদামতোলা তরীর মত
আপ্নি হেলে দুলে
ভাব সাগরে চল্ছ ভায়া
পথ যেও না ভুলে।
মিষ্ট ক'রে স্পষ্ট বল্বে
চাইবে না কারো মুখপানে
রঙ্ দেখে ভাই ভুলনাকো
চল্তেছে মেকি সবখানে।
So-called পণ্ডিত পাঁচ জনা ভাই
একটুখানি প্রশংসাতে

অহঙ্কারের সালসা খেয়ে
ধত্তে চায় চাঁদ আপন হাতে।
বর্ষাটা ভাই শানিয়ে নিয়ে
কর গিয়ে boar শিকার
For the present করা যাচ্ছে
তোমার না হয় King maker.

হঠাৎ চেনাচুরের মত গন্ধ নাসারন্ধ্রে আসায় "অনুসন্ধান"* করা ও দেখা আবশ্যক মনে করিলাম। চাহিয়া দেখি একপার্শ্বে একটু ধরা খিচুড়ী।

*"অনুসন্ধান" ১৩০১ সালের ১লা আষাঢ় "চাঁদের হাট" ব্যঙ্গকাব্য দেখুন

বেণোয়ারির জারি-জুরি, বড়াল কবির ঢং;
সেন কামিনীর রুচির লোভা, দেবেন সেনের রং।
সুধুই যে রং, নহেক এমন, বেরং আছে ঢের;
'মিঠে-কড়ায়' 'হুইপ' দিতে পেয়েছিলাম টের।
'অশ্রুকণার' শোকপ্রতিভা, মানকুমারীর গান,
রবি কবির সোণার তরী—মর্ত্ত্যে সুধা-পান।
'সনেট' লেখক নৃত্যভায়া, আর কটকের মজুন্দার,
সমাজপতি, গুপ্তজ্ঞান, এঁরা ভাষার সমেজদার।
ঠাকুরবাড়ীর কুচোকাচা কবিরদলের বাটথারা,
তাদের কথা জানিনেক, তারা আমার হাতছাড়া।
ভাবে পাগল সবাই তারা, ধারেনাক ভাষার ধার,
মসলাদেওয়া তাদের লেখা, নিজেই বলে চমৎকার।
সাধারণীর অক্ষয় দাদা, 'ফিলোজফার' চন্দ্রনাথ,
ভানুসিংহের কের্দানিতে একেবারে চিৎপাৎ।
বান্ধবের সম্পাদকটী হয়ে আছেন 'ডেড্লেটার',
কলম তাঁর চল্লে পরে হতেন তিনি ঢের 'বেটার'।
এ কাব্যি পড়লে পরে, বলে বসতেন "উদীয়মান",
ব্যাকরণে নীরস হ'লেও, চিন্তনেতে এমার্সান!
সিংহের ভাঁয়া ব্যাঘ্র ঈশান, লম্ফ দেন ফাঁকতালে।
গ্যারিক্ গিরিশ মার্ল্লো হয়ে রঙ্গ করে ঝাঁপতালে।
ব্রাউনিংএর ডাক শুনিয়ে, বিহারী এলো এগিয়ে,
জন্মভূমির 'আর্টিকেলে' জগৎ দিল জেগিয়ে।
বার হয়েছে ঠাকুরদাস, 'সাতনরিটি' গলায় দিয়ে,
সোণারটোপর মাথায় দিয়ে, বন থেকে বেরুলো টিয়ে।

চানাচুর ভেজে' অক্ষয়চাঁদ
আগুনে দেখিলু গৌর,
কোমর বাঁধিয়া ভক্তিমার্গে
সবে ফেলে দিল দৌড়।

খিচুড়ীর উপর চেনাচুর—"আত্মগুণগরিমার" এ-ত গরম, সহ্য হইবে কি? তবে বলা যায় না, সলোমন যেন কি একটা বলিয়াছেন।

যোগিনী লেখক, মোহিনী লেখক, রমণী শুধু বাকী,
ক্ষীরোদ এখন প্রত্ন-তত্ত্বী, কোথায় তুলে রাখি!
রজনী গুপ্ত মনে করেন, তিনি 'ডক্টর' লালা,
মিলন আমার যুটলনাক, মনে পড়্লো কালা।
ভাষার চটক খুবই বটে, 'স্কুলবুকে' কিন্তু টান;
তা' না হলে, ইতিহাসে হতেন তিনি মূর্ত্তিমান:
বঙ্গবাসীর 'লেট এডিটার' ওদের জ্ঞানেন রায়,
ভূদেবেরে তর্ক করে 'ডিফিট' কত্তে চায়।
'পত্তাকাতে' কেরামৎটা পেয়েছিলাম টের;
আর লিখনা রায় মহাশয়, তোমায় এলেম ঢের!
একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, আর চারে বেদ,
জ্ঞানেনদাদা চান উঠাতে বাঙ্গলার জাতিভেদ।
হ-য়ের কোটায় হরিসাধন লিখিতেন একরকম।
'মার্সিনারি' হ'য়ে এখন, করেন রবির বক্‌বকম।
বিদ্যানের শেষ সিভিল'রমেশ সেকেণ্ড ক্লাস্ অবতার;
জেলেখাঁতাঁর আয়েসার পট কানায় বলে চমৎকার।
'ফুষ্টে' ভরা সংসারটা, তারি আবার ব্রাঞ্চ আপিস;
সাহিত্যতে বারহুচ্ছে, সেটাও দেখছি সব রাবিস।
'জিনিয়সের' আরিজুরি এঁরাই করেন বঙ্গে,
পাল্লে লিখ্তে আমার মত, হাত দুল্যাতেন রঙ্গে।
ঠাকুরবাড়ীর সিংহী রায়, ছেঁড়া পুঁথি খুঁজি,
কোপ মারেন ঝোপ বুঝে, দেখান বিদ্যের পুঁজি।
ডাকমহুলের পূর্ণচন্দ্র ভাবে ভাবের ভাণ্ডারী,
হালের পাশে 'সিট' লয়েছে, মনে ভেবে কাণ্ডারী।
কায়সাজি তার, দেখি কত, মিল পড়েছে সস্তখানা,
কৃষ্ণের গলায় দিলে খোঁচা; আমার আছে গুণ জানা।
ব্যাটবলের 'কিএজফি', বেদব্যাখ্যার ভঙ্গিমা,
শুধুই সেটা কটমট, নাইক তাতে রঙ্গিমা।

কাব্য-চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, কলিকাতা ডন্ প্রেস। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০৭; মূল্য ১৲। গ্রন্থখানি অনেক দিন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, নানা কারণে সমালোচনা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য গ্রন্থকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। "নিবেদনে" দেখিলাম—

যাহার অধ্যয়নে হৃদয় বিগলিত হয়, হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহাই রসাত্মক বাক্য, তাহাই কাব্য। সুতরাং, যাহা রসাত্মক গ্রন্থ তাহারই অধ্যায়ন-ফল আছে, যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা কাব্য নহে। যাহার অধ্যয়ন-ফলে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় মুগ্ধ হয়, তাহা নিকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহার রসে সমুদায় সমাজ-মুগ্ধ, তাহা অতি উৎকৃষ্ট কাব্য, বিলাতী

দাদার দাদা দ্বিজেন দাদা, লোকটা বটে সারাল,
জ্যাটামি তাঁর 'আর্য্যামিতে' বুদ্ধিখানি ধারাল।
দর্শনেতে বিদ্যে আছে কৃষ্ণকমল বুঝেছে,
কম্‌টি-তত্ত্ব লিখতে গিয়ে ধাক্কা বড় খেয়েছে।
স্বরব্যঞ্জন, আঙ্ক আস্ক, সিদ্ধি আর ফলা।
দামোদরের কথাটা তো হলনা'ক বলা।
বোকার দলে নবেল লিখে, নামটা কিনিয়াছে;
মর্য্যাদাটা কম্‌বে বলে, ঘেঁস্‌লামনা'ক কাছে।
অধিক বল্লে, 'হিউমারটা' যদি কমে যায়,
'রাইজিং পোয়েট' পড়ে যাবে ভীষণ দরিয়ায়।
বঙ্কিমের মিরেন্দাকে ছেঁচ্‌ড়ে টেনে তুলে;
ছেঁচ্‌ড়ামিটে দেখালে ঢের, কারদানিটে ভুলে।
মেয়েভুলান নভেল লিখে, যোগেন 'নভেলিষ্ট'।
মনে মনে বড়াই তাঁর—তিনিই 'রিয়েলিষ্ট'।
বের্ করেছেন 'কনে-বৌ' আর 'আমাদের ঝি',
পরিচয়টা আরও পাবেন, বেরুলে 'ঠাকুরঝি'।
ঘরের খবর এখন 'ভিড়িড়' দেন্ ন'লেইত প্রাণ চটে,
ভাষা নাহোক, ভাব দেখে তাঁর, 'জেলসিতে' বুক ফাটে
চন্দ্রনাথটা আমার মতন অহঙ্কারী একগোঁকা;
আদর তেমন হলোনাক, বঙ্গের পাঠক প্রায় বোকা।
পোড়্বে তারা, 'মডেলভগ্নী' বঙ্গবাসীর বিরাট-দান;
উপমাটা জুগিয়ে এল, সস্তা পয়সায় তাড়ি-পান।

সেক্সপিয়ারের ভাল ভাল ট্র্যাজিডি-দ্বারা সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা কাব্য। তাহাদের অধ্যয়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট। ইংরাজী স্বাধীন প্রেমঘটিত কাব্যাদি ও ট্যাজিডির অনুকরণে যে সকল কদর্য্য বাঙ্গালা উপন্যাস, কাব্য ও নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধ্যয়ন-ফলে আজি বঙ্গসমাজে তদনুরূপ স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা ও সাম্যভাবপূর্ণ আচার-ব্যবহারের অভিনয় এবং আত্মঘাতী ও পরঘাতী খুনীদলের সৃষ্টি হইতেছে। এই সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থে সেক্সপিয়ারের অতুলনীয় প্রতিভার সামগ্রী কিছুই নাই এবং অপরাপর ইংরাজী কাব্য-নাটকের গুণভাগও নাই, কেবল তাহাদের দোষ-ভাগ আছে মাত্র। এইরূপ সাহিত্য-পাঠে সমাজ হইতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের গুণ সকল ক্রমশই তিরোহিত হইতেছে, এবং

নবেল লেখায় রবীন্দ্রনাথ, তোমার কাছে হারমানে;
তোমার সে মধুরভাষায়, সবার কেমন প্রাণটানে।
গাঁয়েমানে না আপনি মোড়ল, আর যত সব চুনাপুঁটি,
তোদের লেখা চাইনে ভাই, করিসনাক ভিরকুটি।
দেবীর পত্রে মহেন্দ্র, বাড়িয়ে দিলে তোদের মান;
তিনি যেম্নি সিগ্নিফিকেণ্ট, তেম্নি তাঁর হানিমান।
বাঙ্গলাভাষায় বিদ্যে তোমার, পেরেছি ভাই যাস্তে;
আবোলতাবোল কত বক, এক খোলা ধানভাস্তে।
অত্রিমনু নখের কোণায়, যাজ্ঞ্যবল্কে ধনুর্ধর,
তোমার মত আর হয়নি শ্রীরঘুনন্দের পর!
জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না এই 'থিওরি' মেনে;
কল্পতরুর 'অথরটীকে' আন্‌লোম নাক টেনে।
সিসেভরা নয়ক মাথা, আছে বটে ইস্‌পাত;
ভাঁড়ামিটে না থাক্‌লে, করে বসতে বাজিমাত।
উমেদারীর জোরে হারাণ, মাথায় এঁটে জয়পত্র।
লিখেছে তো রাবিস খালি, তাও আবার দু'ছত্র।
মধুসূদনের 'বায়োগ্রাফার' সুরভির এডিটার;
পাহাড়ে এক বই লিখেছে, সব পৃষ্ঠাই অন্ধকার।
বন্ধুরা তাঁর হয় তো বলেন—এমন ধূমো নই,
বাঙ্গালার মাঝে কে লিখেছে, এর তুলনা কই?
এর তুলনা নাইক সই, এর তুলনা নাই,
তাঁতিমিনসে খুঁজে বেড়ায় তার দোয়া গাই।

তৎপরিবর্ত্তে বিলাতী ন্যায়পরতা ও সাম্যভাবের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। সুতরাং অধুনাতন বিলাতী-রুচিসম্পন্ন সাহিত্যের অধ্যয়ন-ফল অত্যন্ত গর্হিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের পুরাণাদির রসোদ্দীপনা অতি উৎকৃষ্ট। এই পুরাণাদির রসে সমুদায় বঙ্গসমাজ কেমন সাত্ত্বিকভাবে প্রচালিত ও সংগঠিত হইয়াছে, বঙ্গসমাজে ব্যাস বাল্মীকির কাব্যশক্তির প্রভাব কেমন প্রভূত, তাহা দেখাইবার জন্য আমি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। সেই প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাভারত-রামায়ণের সামাজিক ফল অতি উৎকৃষ্ট, এবং তজ্জন্য পুরাণ সমুদায় অতি উৎকৃষ্ট রসের আধার বলিয়া কাব্য নামের কতদূর উপযুক্ত গ্রন্থ। জগতে এই পৌরাণিক সাহিত্যের মত আর কোন্ কাব্যরাজির ফল তত উৎকৃষ্ট? এই জন্য বলি, বিলাতী রুচি-সম্পন্ন অনেক কাব্যের ফল আসুরী সৃষ্টি এবং পুরাণাদির সামাজিক ফল দৈবী-সম্পৎ (গীতা-১৬অ)। একের ফল সাত্ত্বিক, অপরের ফল রজ ও তমোগুণান্বিত।

পুঁথি ঘেটেছে, রাত জেগেছে, কালি নেড়েছে কত;
তবু কিছুই লেখেনিক, লিখবার ছিল যত।
বঁধু তোমায় বলিহারি, বলিহারি বঁধু;
ভাবুক জনে আপনি পাবে, মধুর মাঝে মধু।
পঞ্চবেদীর দুই মাইনস্, আর বন্দ্যো হরিদাস,
কতক লেখা ভাল লেখে, অনেক লেখাই ছাইপাঁশ।
এইত কজন, কুড়ুম্‌কাড়ুম্ করেন বঙ্গের আসরে,
এঁদের আবার জারিজুরি—দেখে হাসি পায়রে!
হদ্দ কর্‌লে বদ্ধবোকায়, এ দুঃখ আর কব কায়,
ব্যঙ্গকাব্য ভীষণ শল্য, সত্যি কথা লেখা দায়!
আমার মত ইঙ্গিতেতে ব্যঙ্গ করা সোজা নয়,
হেসেখুসে পড়বে সবাই, লাগবেনা'ক কার ভয়।
এ মস্কারার অর্থ নাইক ভেবে নেবে সবাই নিজে,
এ 'স্যাটায়ার' পড়্‌লে কারু উঠবেনাক' নয়ন ভিজে।

[আসল কথা।]

বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের
সিংহাসনের পদ খালি,
বস্‌তে আমার সাধ গিয়েছে,
তোমরা দেওগো হাততালি।

ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গসমাজকে কেমন প্রচালিত করিতেছেন, তাহা দেখাইয়া সর্ব্বশেষে তাঁহাদের পৌরাণিক কাব্য-মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সাধনা-পদ্ধতি কেমন নিহিত,—যে ধর্ম্মসাধনা বলে আর্য্যধামে মুনি-ঋষির সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই ধর্ম্মসাধনা-পদ্ধতি—হিন্দুর সেই সংযমপথ প্রদর্শন করিয়া আমি এই কাব্য-প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছি।

এই কথা বলিয়াই গ্রন্থকার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সূচী এই—কাব্য—জগতে (বাহ্যজগতে, অন্তর্জগতে), কাব্য—বনবাসে, কাব্য—ইতিহাসে, মহাকাব্যের পরিচয়, মহাকাব্যের সাদৃশ্য, মহাকাব্যের পার্থক্য, কাব্যকিঙ্করী (মন্থরা, কৈকেয়ী, লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতি), কাব্য—ভারতচন্দ্রে—রামপ্রসাদে—বঙ্গসমাজে, কাব্যে—ধর্ম্মসাধনা।

বলাবাহুল্য সকল বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং পাঠক পাঠিকাকে মনঃসংযোগে পাঠ করিতে অনুরোধ করি—পাঠ নিষ্ফল হইবে না। এই গ্রন্থের দোষ দেখাইতে আমরা চেষ্টা করিব না, তাহা চন্দ্রের কলঙ্ক। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে সাহারা মরুতে এখানি একটি মরুবন্ধ (ওয়েসিস)। বর্ত্তমানকালে সাহারা মরুতে নূতন নূতন ওয়েসিস আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাঠক মহাশয় এ সংবাদ বোধ হয় জ্ঞাত আছেন ও সেই ওয়েসিসের মধ্যে রোমানদিগের নির্ম্মিত বড় বড় দুর্গও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতনই আছে। গ্রন্থকার আমাদিগকে সেইরূপ পুরাতনে-নূতন দুর্গও দেখাইয়াছেন, "দেখিতে চাও, এ বঙ্গের সংসারধাম ধর্ম্মের পরম শিক্ষাস্থান কি নয়? সংসার কোন্ স্রোতে নীয়মান? বঙ্গীয়-সমাজ, কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ সমাজ, ধর্ম্মশিক্ষা ছাড়া, এ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা নয়, এ বিস্তারিত কার্য্যক্ষেত্রের ধর্ম্মশিক্ষা যে কার্য্যক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই নামিয়া সারি সারি, পাশাপাশি হত পদে, অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, বঙ্গীয় জনসমাজ সেই কার্য্যক্ষেত্রের মহান্ শিক্ষা-মন্দির। এই মন্দির গড়িয়া গিয়াছেন—বৈদিক ঋষিগণ হইতে ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণ।"

বশিষ্ঠ গঙ্গা ও জাফর খাঁ।

পৌষের পূর্ণিমায় মৃত্যুর পর প্রবন্ধে (৩১৮ পৃঃ) মহানাদের বশিষ্ঠ গঙ্গার সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমার কিছু বক্তব্য আছে। মহানাদ অঞ্চলে এ সম্বন্ধে প্রবাদমূলক যে গল্পটি প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করা উচিৎ। প্রবাদমূলে কোন সত্য আছে কি না এবং থাকিলে ইতিহাসের দাবী তাহার উপর কতটা চলে, ভবিষ্যৎ প্রবাদবিদ্ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক সে মীমাংসা করিবেন, আমরা আখ্যান বস্তু দিয়াই নিশ্চিন্ত হইব। গ্রেট বৃটনে প্রবাদের ও প্রবাদমূলক গল্পের বড় বড় বই আছে। স্যর ওয়াল্টার স্কট্ যখন যে প্রবাদটি বা গল্পটি বা প্রবাদ-মূলক গল্পটি পাইয়াছেন, তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে উপন্যাস লিখিয়াছেন বা পদ্য লিখিয়াছেন বা তাহার অন্য প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক সময়ে ঐতিহাসিক মাথা ঘামাইয়া যে তথ্য নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হন না, প্রবাদমূলক গল্প অনায়াসে তাহার মীমাংসা করিয়া দেয়। আমি একটি উদাহরণ দিব। জনপ্রবাদ বলে যে সিরাজউদ্দৌলাকে মীরজাফরের পুরাতন আবাস জাফরগঞ্জ দেউড়ীতে হত্যা করা হইয়াছিল। নদীর অপর পারে জাফরগঞ্জ দেউড়ীর ঠিক বিপরীত স্থলে মানসুরগঞ্জ বলিয়া একটি প্রাসাদ আছে। সেখানে মীরজাফরের পুত্র মীরণ বাস করিত। ইতিহাস লেখক অর্ম্মি বলেন যে মীরণ মানসুরগঞ্জ প্রাসাদেই সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করেন। জনপ্রবাদ যে মিথ্যা নয় পরে মুতাক্ষরীণ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকগণ বলিতেছেন সম্ভবত এই ঘটিয়াছিল যে মানসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজকে হত্যা করিয়া একরাত্রি রাখা হইয়াছিল, তারপর পরদিন প্রত্যুষে সিরাজের দেহ জাফরগঞ্জ দেউড়িতে আনিত হয় এবং তথা হইতে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় হস্তীপৃষ্ঠে চাপাইয়া নগরে ভ্রমণ করান হইয়াছিল এবং পরে খোসবাগে লইয়া গিয়া আলীবর্দ্দীর পার্শ্বে কবর দেওয়া হইয়াছিল।

আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নবাবী আমলে বাঙ্গালিরা সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইতেন, এই প্রবাদ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মুরশিদাবাদের তোপখানায় একটি কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে,

তাহার নাম "জেহানকোশা" বা জগৎ ধ্বংসকারী। এই কামান সাড়েসত্তর ফিট্ লম্বা, এবং এক স্থানে পাঁচ ফিট্ চওড়া, রঞ্জুকের ব্যাস দেড় ইঞ্চি এবং কামানের মুখের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং ওজন ২১২ মন।

সাজাহান বাদসাহের আমলে, ইস্‌লাম খাঁ যখন ঢাকা সহরে বাঙ্গালা বিহারের সুবাদার, হরবল্লভ দাসের উপদেশানুসারে ও অধীনে ঢাকার জনার্দ্দন কর্ম্মকার এই কামান ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন। ইহা অষ্ট ধাতুর কামান অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, শীসা, দস্তা, পারদ, এবং টিন নির্ম্মিত। এখন এই কামানের বৃত্তান্ত হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে হরবল্লভ দাস একজন দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন না অপিচ একজন সেনাপতি ছিলেন, কিংবা এ সব ব্যাপার বুঝিতেন এমন একজন সৈন্য-সংক্রান্ত লোক ছিলেন।

বুঝা গেল জনপ্রবাদমূলক গল্প ত্যাগ করিতে নাই। এখন আমার কথা।

মহানাদ গ্রামে যখন হিন্দুযোগীরাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে দ্বারবাসিনী গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান দম্পতী বাস করিতেন। অপুত্রক থাকায় মুসলমান এই মানৎ করিয়াছিল যে যদি পুত্র হয় তাহা হইলে আল্লার উদ্দেশে সে গরু কোরবানি দিবে। পুত্র হইলে সে গরু কোরবানি দিয়াছিল। একটা কুকুর এক খণ্ড অস্থি মুখে করিয়া বশিষ্ঠ গঙ্গার কিনারায় আনিলে, বশিষ্ঠগঙ্গা হইতে ধূম নির্গত হইতে আরম্ভ হইল ও "রাম্ রাম" শব্দ জলমধ্যে শুনা গেল। রাজার নিকট সংবাদ পঁহুছিলে, তিনি জ্যোতিষ সাহায্যে ব্যাপার কি অবগত হইলেন। এই বশিষ্ঠগঙ্গা দেবগণের স্থাপিত এবং দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া ইহার জলের সঞ্জীবনী শক্তি ছিল—মৃত-ব্যক্তি প্রাণ পাইত। বশিষ্ঠগঙ্গার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা শুনিয়া রাজা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তখন দেশে কেহ গোহত্যা করিতে পারিত না। মুসলমান বাদসাহগণও গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে গোধন রক্ষায় অনেক লাভ—কৃষিকার্য্যের জন্য, লোকের, বিশেষত শিশু বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকের, প্রাণ রক্ষার জন্য গোদুগ্ধের বিশেষ প্রয়োজন। প্রচলিত বিধি অমান্য করিয়া আবার হিন্দুরাজ্যে পবিত্র মহানাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিনা হুকুমে গোহত্যা করায় রাজা মুসলমান দম্পতীর সমুচিত শাস্তি দিলেন।

মুসলমানের শিশুসন্তানের প্রাণবধ আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। মুসলমান দম্পতী মৃতশিশুর শব লইয়া দিল্লীযাত্রা করিল। সেখানে বাদসাহের নিকট নালিশ হইল। বাদসাহ কিছু করিলেন না বরং মুসলমানকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন।

এই ঘটনার পর দিল্লীর বাহিরে আসিয়া মুসলমান দম্পতী একদল ফকীরকে দেখিলেন এবং তাহাদের নিকট নালিস করিলেন। ফকীরদলের কর্ত্তা পুনরায় বাদসাহের নিকট আবেদন করিলেন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর এই স্থির হইল যে ফকীরগণ ইচ্ছা করিলে মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে কিন্তু সরকার হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

তখন ফকীরদল পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন ফকীর মালদহ জেলার বড় পাণ্ডুয়ার প্রধান পীরের অনুমতি আনিতে গেল। প্রধান পীর অনুমতি দিলেন এবং মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অর্থ ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ায় শিবির করিয়া মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু মুসলমানদিগের বার বার পরাজয় হইল। মুসলমানেরা দেখিল যে আজ যে হিন্দুসেনাপতি যুদ্ধে হত হইল পরদিন সেই আবার যুদ্ধ করিতেছে। অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারিল যে বশিষ্ঠগঙ্গার সঞ্জীবনী শক্তি যায় নাই, আর সেই জলস্পর্শেই মৃত ব্যক্তিরা প্রাণ পাইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতেছে। তখন মালদহে আবার ফকীর প্রেরিত হইল। বড় পীর বলিলেন যে কোন উপায়ে বশিষ্ঠগঙ্গায় গোমাংস নিক্ষেপ করিতে হইবে নতুবা কিছু হইবে না। এদিকে যে মুসলমান গোমাংস নিক্ষেপ করিতে যায় সেই ধরা পড়িয়া শূলে যায়। তখন আবার মালদহে লোক গেল। পীর বলিলেন যে ফকীরডাঙ্গার ফকীর সাহায্য না করিলে কিছুই হইবে না, সে কামরূপী ইচ্ছা করিলে পশুপক্ষীর বেশ ধরিতে পারে, তাহার সাহায্য গ্রহণ কর। মগরা ও পাণ্ডুয়ার মধ্য স্থানে সের সাহের রাস্তার পাশে (এক্ষণে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড) হয়েড়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে ফকীরডাঙ্গা বলিয়া একটি স্থান আছে, সেইখানে তখন একজন ফকীর বাস করিতেন। পাণ্ডুয়ার ফকীরসম্প্রদায় সেই ফকীরকে গিয়া ধরিলেন। ফকীর অনেক সাধনার পর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "এ কার্য্য আমি করিব কিন্তু একার্য্যে আমার প্রাণ যাইবে। গোমাংস নিক্ষেপ করিব কিন্তু তাহাতে

আমার প্রাণ যাইবে, আমার দেহ যেখানে পতিত হইবে সেইখানে তোমরা কবর দিবে। আমি পক্ষীরূপে পলাইতে চেষ্টা করিব।"

যথাসময়ে ফকীর রাজমল্লিক যোগীবেশে মস্তকের জটায় গো-মাংস রাখিয়া অতি গোপনে মন্ত্রবল সাহায্যে গ্রামে প্রবেশ করিয়া বশিষ্ঠগঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠগঙ্গা হইতে সূচীভেদ্য ধূমস্তম্ভ উদ্গত হইল, রাম রাম শব্দে দিক্ পূর্ণ হইল আর ঘন ঘন ভূকম্প হইতে লাগিল। রাজা মুহূর্ত্ত মধ্যে গণক সাহায্যে ব্যাপার বুঝিয়া ভণ্ডযোগীকে সংহার করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ফকীর বেগতিক দেখিয়া হাঁড়গিলা পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড্ডীয়মান হইল। অমনি পক্ষী উদ্দেশে শত ধনু হইতে তীর উৎক্ষিপ্ত হইল। পক্ষী শরবিদ্ধ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ফকীরডাঙ্গার নিজ আবাস স্থানের পূর্ব্বদিকে পতিত হইল এবং সেই স্থানেই সমাহিত হইল। সেই কবর একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ পাদমূলে অবস্থিত এবং ইষ্টক নির্ম্মিত ও একটি প্রকাণ্ড কুঠারির দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমন্বিত। সেরসাহের রাজবর্ত্মের অভিজ্ঞ পথিক অদ্যাপি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঐ স্থানকে "রাজমল্লিকতলা" বলিয়া ঘোষণা করে। স্থানটি মগরা ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিম।

এইরূপে ফকীর রাজমল্লিক স্বীয় দেহ সংহারের সহিত বশিষ্ঠগঙ্গার ও তৎসঙ্গে মহানাদের হিন্দু রাজশক্তিরূপ সঞ্জীবনী শক্তির সংহার করিয়া সমাহিত হইল। মহানাদের হিন্দুরাজা সসৈন্যে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন ও মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুসলমানেরা মহানাদের লুণ্ঠন ও সর্ব্বহত্যাকার্য্য তিন দিনে সম্পন্ন করিয়া বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার জন্য ও ভবিষ্যৎ বংশীয়গণকে সগর্ব্বে জানাইবার জন্য পাণ্ডুয়ায় উচ্চ মন্দির ও বিজয় বারোদোয়ারি প্রস্তুত করিল। তৎপরে ফকীরদল ছিন্নভিন্ন হইয়া যে যেখানে পাইল চলিয়া গেল।

হিন্দুরা কিন্তু এই প্রবাদ গল্প বলেন না বা কেহ কেহ মাত্র বলেন। তাঁহাদের কথা এই মহানাদের একজন পরমধার্ম্মিক বিদেহ যোগিরাজ প্রত্যহ স্বীয় রাজ্য হইতে ৬ বারাণসীধামের বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মা অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিবার জন্য বাসনা করিলে সদাশিব মহাদেব

বিশ্বকর্ম্মাকে ইঙ্গিত করেন। মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে পাণ্ডুয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ফকীরদলের মধ্যে একব্যক্তি ইহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রিবেণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ত্রিবেণীতে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এখন যে স্থানে গাজির কুড়ুল অবস্থিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও একটা নিম্ববৃক্ষের তলায় বসিয়া দন্তধাবনকার্য্য করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে ৺গঙ্গার তীরে তরুপাদমূল আশ্রয় করিয়া এক দল হিন্দুসন্ন্যাসী আশ্রম করিয়াছিলেন ও গঙ্গার উদ্দেশে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা স্নানের পর শূন্যে বিনাবলম্বনে আর্দ্র বস্ত্র সকল শুষ্ক করিতে দিতেন। সেদিনও ঐরূপে কাপড় শুখাইতে দিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা কাপড়গুলি ঝুপঝাপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যাওয়ায়, তাঁহারা বিস্মিত হইলেন এবং সত্ত্বগুণাবলম্বী ক্ষমতাশালী কোন লোক আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে করিতে নিম্ববৃক্ষমূলে সেই মুসলমান ফকীরকে দেখিলেন। তখন উভয় দলে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

হিন্দু সন্ন্যাসী। মহাশয় আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন।

মুসলমান। আমার পরিচয় দিব না।

হি। পরিচয় না দেন, এস্থান পরিত্যাগ করুন, আমাদের তপের বিঘ্ন হইতেছে। আমরা এখানে আশ্রম করিয়া বাস করিতেছি।

মু। স্থানটি পরম রমণীয় বিশেষত এই ও নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়াছি এই স্থানে আশ্রম করিয়া তপস্যা করিব। আপনারা এই স্থান ত্যাগ করুন।

হি। আমরা স্থান ত্যাগ করিতে পারি না। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া আশ্রম করিয়াছি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইলে যাইতে পারিব না। গত্যন্তর মৃত্যু।

মু। কি ইচ্ছা, কি প্রতিজ্ঞা বলুন। আমি কিন্তু স্থান কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। (তখন হিন্দুসন্ন্যাসীগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিতে পারেন না)। অবশেষে একজন বলিলেন, আপনি স্থান পরিত্যাগ না করিলে আমাদের সমূহ বিপদ।

মু। (হাসিয়া বলিলেন) মানবের পক্ষে দেবদর্শন একান্ত দুর্লভ। তপস্যা প্রভাবে দিব্যচক্ষু না পাইলে কি করিয়া গঙ্গাদর্শন হইবে?

হিন্দুসন্ন্যাসীগণ গঙ্গার উপাসনা করিতেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন হয় ৺গঙ্গার দর্শনলাভ করিবেন নয় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। দুইয়ের একটা যতদিন না হয় ততদিন ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবেন না। এক্ষণে ফকীরের মুখে প্রাণের গুপ্ত কথা শুনিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ফকীর একজন মহাপুরুষ। তখন বিনয়ে করপুটে সকলে বলিলেন, আপনি কৃপা করিলে আমাদের বাসনা ফলবতী হইতে পারে। আপনি কৃপা করুন, আমরা এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব।

ফকীর সন্ন্যাসীদের প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সকলে জলের উপর দেখিলেন বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি। কিন্তু সন্ন্যাসীরদল তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। অনেক স্তবস্তুতির পর পূর্ণ-হস্ত দেখাইলেন। পরে দেবীর পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত কেশ দর্শন করাইলেন। ঘৃতসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় সন্ন্যাসীগণের দর্শন লালসা প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিলেন "একে ত মায়াকূপে আবদ্ধ তাহার উপর আবার মায়াস্বরূপ কেশরাশি দর্শন করিলাম—এ ঘোর বিপদের অবস্থা। কৃপা করিয়া যদি দেখাইলেন, তবে মায়ের পূর্ণ বিভূতি দর্শন করান।" ফকীর এইবারে মকরবাহিনী গঙ্গামূর্ত্তি সন্ন্যাসীর দলকে দর্শন করাইলেন। সন্ন্যাসীর দল কৃতার্থ হইল ও তৎক্ষণাৎ যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিয়া কৈলাসপুরী চলিয়া গেল।

মুসলমান ফকীর ঐ স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পর তিনি ঐ স্থানেই সমাহিত হইয়াছেন। স্থানটি হিন্দু ও মুসলমানের উভয় জাতিরই তীর্থস্থান। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ দিনে এই স্থানে মেলা হয় ও বহুলোকের সমাগম হইয়া থকে। এই স্থানটিতে ফকীর এক জন মুসলমানকে সেবাইতস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া যান, তিনি কবরে চেরাগ বাতি দেন, দুগ্ধ দেন ও আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই করেন। ফকীর যে মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার সপ্তম পুরুষ এক্ষণে বর্ত্তমান। তাঁহার নাম গোলাম রহমন।*

*গোলাম রহমনের মুখে আমি এই প্রবাদমূলক কথা শুনিয়াছি।

পাঠক মহাশয় এই ফকীরকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? ইনি দফার খাঁ। ইঁহারই স্থাপিত কুঠার কবরের পূর্ব্বধারে অবস্থিত। আলগা হল হল করিতেছে অথচ টানিয়া বাহির করিবার যো নাই। এই কুঠারের নাম দরাফ গাজির কুড়ুল বা সংক্ষেপে গাজির কুঁড়ুল। এদেশে এই কুড়ুল উপলক্ষে একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। লোকে বলে "যেন গাজির কুড়ুল—নড়েচড়ে পড়ে না"। এই দরাফ খাঁ মুসলমানই স্তবে ভগবতী গঙ্গামাতাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন ও তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বম্ মহত্ত্বম্॥

হে সুরধুনি মুনিকন্যে তুমি পুণ্যবান্ ব্যক্তিকেই তারণ কর কিন্তু সে তাহার নিজ পুণ্য দ্বারাই তরিয়া যায়, তাহাতে তোমার মাহাত্ম্য কি? যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে পরিত্রাণ কর তাহা হইলে সেই যে তোমার মহত্ত্ব সেই মহত্ত্বই প্রশস্ত মহত্ত্ব।

দরাফ খাঁর বাল্যজীবন ত্রিবেণী সন্নিকটে কোঁচাটি গ্রামে অতিবাহিত হইয়াছিল। বাল্যে তিনি এক ব্রাহ্মণের বাড়ী রাখাল ছিলেন, গরু চরাইতেন। একদিন বৈশাখের অপরাহ্নে গরু বাড়ী আনিবার সময় ভয়ানক মেঘ ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। গরুকে রাখাল রাখিতে পারিল না, বড়ি ছিঁড়িয়া চোঁচাদৌড়ে গরু ছুটিল। রাখাল অগত্যা বৃষ্টিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষতলেই অবস্থান করিতে লাগিল। বালকের দেহ নিষ্পাপ এবং সেদিন সে অসুখবশত অনাহারে ছিল। সেদিন তাহার শরীরটা সূক্ষ্ম ছিল। বালক শুনিল বৃক্ষোপরি দুইজনে কথা কহিতেছে। একজন, বলিতেছে "এসনা আর দেরি কেন করিতেছ—এটা স্ত্রীলোকের গলা। অপর (পুরুষগলা) বলিতেছে "একটু দাঁড়াও না আর একটা সঙ্গী আসিতেছে, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।"

রহমনের পূর্ব্বপুরুষ হইতে এই গল্প চলিয়া আসিতেছে। আমি যখন গোলামরহমনের মুখে এই গল্পটি শুনি তখন আমার সঙ্গে হুগলির জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

১ম স্বর। কে আবার সঙ্গী আসিবে?

২য় স্বর। অমুক ভট্টাচার্য্যের চাকর এখনই মরিয়া ভূত হইবে। এই যে রাখালের হাত হইতে বৃষ ছুটিল, এই বৃষকে গোয়ালে আবদ্ধ করিতে যাইবে। গোহালে একটা সর্প দেখিয়া বৃষ কিছুতেই ঢুকিতে চাহিবে না। চাকর সে কথা না জানিয়া জোর করিবে শেষে বৃষ কুপিত হইয়া শৃঙ্গপ্রহারে চাকরের প্রাণনাশ করিবে, সে এখনই মরিয়া ভূত হইবে। তাই বলি একটু অপেক্ষা কর, একটা সঙ্গী মিলিবে।

১ম স্বর। তবে অপেক্ষা করি।

রাখাল এই কথা শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল ঝড়বৃষ্টি মানিল না। গিয়া দেখে মনিবব্রাহ্মণের বাটীতে ভারি গোল। লোক জমিয়া গিয়াছে—তখন বৃষ্টিও একটু নরম পড়িয়াছে। চাকরটির মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, লোকে বলিতেছে, ষাঁড়টা গুঁতাইয়া মারিয়াছে। কিন্তু কেহ কারণ বলিতে পারিল না। বালক কাহাকেও কিছু না বলিয়া সাবধানে গোহালে প্রবেশ করিয়া দেখিল ডাবার একপার্শ্বে একটা কুণ্ডলিত ফণী—বুঝিল একথা কেহই জানে না। তখন বালক আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—কি ভাবিল, সেই-ই জানে। আবার পূর্ব্বপরিচিত বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পরে শুনিল

১ম। তোমার সব কথাই সত্যি।

২য়। একটা যে গোল হইল। তা আমি কি করিব?

১ম। কি গোল—কই এখনও ত ভূত হইয়া আসিল না?

২য়। মরিল ত দেখিলে—কিন্তু ভূত হইল কই? বৃষের শৃঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লাগিয়াছিল—বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা গঙ্গামৃত্তিকা খনন করিয়াছিল। সেই গঙ্গামৃত্তিকা চাকরের দেহে লাগায় সে উদ্ধার হইয়া গেল—ভূত আর কই হইল? সকলই অদৃষ্ট।

মুসলমান বালক নিম্নে থাকিয়া গঙ্গামৃত্তিকার গুণের কথা ভূতযোনীর মুখে শুনিল। বুঝিল গঙ্গার সাধনা কি বস্তু ও তাহার ফল কি?

যে স্থানে হিন্দু সন্ন্যাসীর দল আশ্রম করিয়াছিল, সেইখানে এক বৃক্ষতলে থাকিয়া বালক ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিল এবং যথাকালে এক ব্রাহ্মণের কৃপায় মন্ত্রলাভ করিয়া দেবী সুরধুনীর দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ

হইয়াছিল। পাঠক যবন হরিদাসের কথা মনে আছে কি? সর্ব্বস্থানে সকল সময়েই ভক্তির জয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসও বলিয়াছেন, কলিতে কেবল ভক্তি চাই—নারদীয় ভক্তি।

প্রাচীন সাধন-সঙ্গীত।

এতদিন আমাদের বিশ্বাস ছিল, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনই সাধন-সঙ্গীতের আদি ও শেষ কবি। বাস্তবিক তাঁহার মত এত সুন্দর ও এত অধিক সাধন-সঙ্গীত আর কেহ রচনা করিয়া যান নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা বেওয়ারিশ সম্পত্তি বলিয়া ইহার প্রাচীন বিরাট কলেবর বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে; সে বিষয়ে দ্বিধামাত্রও হইতে পারে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র বাঙ্গালী বুধমণ্ডলীর স্নেহদৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে, এত যুগযুগান্তরের কঠোর নির্যাতনে আমাদের কত অমূল্য সম্পত্তি চিরতরে বিস্মৃতির অতল কুক্ষিগত হইয়াছে, আজ কে নির্ণয় করিবে?

শাক্ত সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অপেক্ষা প্রাচীন। শাক্তগণ হইতে বৈষ্ণবগণ অনেক মত পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। শাক্তগণ নির্জ্জনে ভজনসাধনপ্রিয়, বৈষ্ণবগণ সঙ্গীতসহযোগে সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয়।

একদিন বঙ্গসাহিত্যের সকল জিনিষের একই অবস্থা ছিল—সকলই হস্তলিপিতে নিবদ্ধ ছিল। এখনও ইহার কত কি অমূল্য পদার্থ-নিচয় কাষ্ঠ-চাপে আবদ্ধ থাকিয়া দিন দিন ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে! বৈষ্ণব সাহিত্যামোদিগণ সাহিত্যপ্রেমের বশীভূত হইয়া এই দশাপন্ন রত্নরাজির উদ্ধার করিয়াই ত আজ বঙ্গীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের মহিমাচ্ছটায় নগণ্য বঙ্গ-সাহিত্য জগতের চিরসঞ্চিত ধ্বান্তরাশি অপসারিত করিয়া দিয়াছেন! পক্ষান্তরে, সাধনসঙ্গীতের অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্যও বঙ্গসাহিত্যের সৌন্দর্য্য অল্প বৃদ্ধি করে নাই। 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন পদার্থ কেহ যদি মানেন, তিনিই অসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন যে, সাধনসঙ্গীতগুলি ধর্ম্মপিপাসুর মনে এমন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয় যে, তাহা সাহিত্যের অন্যত্র একান্ত দুর্ল্লভ। রামপ্রসাদের ধর্ম্মসঙ্গীত পড়িয়া মোহিত না হয়, জগতে এমন কুলিশকঠোরহৃদয় লোকও আছে নাকি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই

শ্রেণীর সঙ্গীত (অনেক রচিত হইয়া থাকিলেও) আমাদের বেশী নাই। প্রাচীন সাহিত্যালোচনার অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বৈষ্ণব পদাবলীর মত প্রাচীনকালের অনেক সাধনসঙ্গীতও পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে প্রাচীন পুঁথি কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই সকল পুঁথির ভিতর যদৃচ্ছাক্রমে লিখিত এমন সঙ্গীত অনেক পাওয়া যাইবে। প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিতে করিতে আমাদের চক্ষে নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতগুলি পতিত হইয়াছে। এমন একদিন আসিতে পারে, যখন আমাদের পরবর্ত্তীরা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই সকল পদার্থান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু হায়! "বয়োগতে কিং বনিতাভিলাষেণ"! এখন এই গুলি নষ্ট হইয়া গেলে পরে চেষ্টা করিলেও কি হইবে? এই দেশের প্রাচীন লোকদের মুখে মুখেও এমন কত সঙ্গীত আছে, ইয়ত্তা হয় না! এই বিষয়ে সাহিত্যসেবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সঙ্গীতগুলি রক্ষা করার উদ্দেশে 'পূর্ণিমায়' প্রকাশ করিলাম।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমরা কোন কবিরই কোন পরিচয় পাইতে পারি নাই। আর একটি কথা প্রাচীন সাহিত্যসেবী মাত্রেই জানেন যে, একটি মাত্র হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকালের কোন একটা কিছু বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করা কত কঠিন! সেইকালের হস্তলিপিগুলি এতই ভ্রান্তিসঙ্কুল! সেই জন্যই এই সঙ্গীত সকল স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ (এমন কি অবোধ্যও) রহিয়া গেল। তবে আশা আছে যে, ভবিষ্যতে এই অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ সঙ্গীগুলিও সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। রামপ্রসাদ ভনিতাযুক্ত সঙ্গীতের রামপ্রসাদ, কোন্ রামপ্রসাদ নির্ণয় করা কঠিন। উক্ত সাধক কবির প্রকাশিত সঙ্গীতের মধ্যে এই গীতগুলি পাওয়া যায় না। সঙ্গীতগুলি বহুকালের পুরাতন পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। আমরা যথাদৃষ্ট লিখিয়া দিলাম।

মালশী।

বিষম সমরে সাজে কালীআ।
এড়িআ শমনের দায়, শরণ লৈলুম রাঙ্গা পাএ,
ধনু হাতে মুণ্ডমালা ধরিআ॥

গলে শোভা মুণ্ডহার, বিজুলীতে ছটা মার,
সঙ্গে শিবাগণ চলে সাজিআ।
করে করে দিআ তালি, রণ মাঝে নাচে কালী;
নাচে ঝালী নবরঙ্গ সাজিআ॥
করাল বদন দিআ, রুধির পড়িছে বাইআ,
নাসিকার বেসরে ঝলমলিআ।
পদভরে চমকৃতি, টলমল বসুমতী,
দেবগণ কম্পে থর থরিআ॥
তাহাতে তম্ভিত* পুনি, স্তব করে সুরমুনি,
তাহানে অবধান নহি জানিআ।
ঘন ঘন দিয়া তালি, রণ মাঝে নাচে কালী,
নাচে কালী বাম করে ধরিআ॥
রামজীবনে ভণে, ঐ কালীর চরণে,
সেবক উদ্ধার কর জানিআ॥

কি দিআছ কি আছে মাগো পূজিতাম তোহ্মারে? ধুয়া।
মন দি' পূজিতে নারি পবনে বহে স্বর।
তনু দি' পূজিতে নারি পাপে জর জর॥
দুগ্ধ দি' পূজিতে নারি বাছুরে আগে খাএ।
পুষ্প দি' পূজিতে নারি ভ্রমরে ছুইআ যাএ॥
দূর্ব্বা আদি তিল কুশ ধরিতে না পারি।
কি গুণ মহিমা মাএর বুঝিতে না পারি॥
শ্রীরামপ্রসাদে কহে আহ্মার কি হবে উপায়।
অন্তকালে রামের (নামের?) গুণ দিবা ত যোগাই॥

আহ্মার অন্তর কালরূপ জাগাএ দিবানিশি। ধুয়া।
ছাড়িয়া সংসার-জ্বালা, তুআ পদ করিয়াছি পদ্মমালা,
মনকে অভিমান করি ভজিবে কালীর চরণ বসি॥
অসুর বধিয়া হেলে, নরশির মালা গলে,
প্রবাল মুকুতা হার, বাম করেতে তীক্ষ্ণ অসি॥

---

*তম্ভিত=স্তম্ভিত?

শ্রীরামপ্রসাদে বোলে, পড়িআ কালীর পদতলে,
না করিআছি দানধর্ম্ম, না গেআছি প্রয়াগ কাশী ॥
আমার অন্তর কালরূপ জাগাএ দিবানিশি ॥

জানিলাম মাগো নামের মহিমা। ধুয়া।
নামে মরি নামে তরি, বুঝি মাএর নামের কিবা গুণ।
নিবেদিলাম ··· ··· আন্ধি বিধি নিদারুণ ॥
রামেরে সদয় কালী রাবণেরে বাম।
সেতু বান্ধিআ, তোল্কা পূজিআ, লঙ্কা পাইছে রাম ॥
কংসেরে বধ হেতু কৃষ্ণ অবতার।
শিবা রূপে কৃষ্ণেরে কালিন্দী কৈলা পার ॥
মুনিগণে স্তব করে অরণ্য ভিতরে।
দাস কৃষ্ণরাম ভণে থাকি কারাগারে ॥

করুণাম এ নিবেদন করম্ তুআ পাএ।
ভবেতে জন্মিআ পদ না ভজিআ (কাল) যাএ।
হেলাএ হেলাএ বৃথাএ জন্ম যাএ ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি, অবিরত জলে ভাসি,
ভাসিতে ভাসিতে না পাই ওর।
কিঞ্চিত নয়ানে যদি, কৃপা কর গুণনিধি,
তবে জানি দয়ার ঠাকুর ॥
পতিত-পাবনী নাম, জগতে যে অনুপাম,
বেদে পুরাণে যারে গাএ।
দিআছ তাড়না, ভবের যন্ত্রণা,
বোল পাপীর কি হবে উপায় ॥
দ্বিজ রঘুনাথ ভণে, জপ স্তব নহি জানে,
গুরু অতিথের সেবা নাই।
চিত্ত করিআছি দড়, আশা করিআছি বড়,
হরি-বোল বোলে প্রাণি যাএ ॥

দুঃখেরি সময়ে ডাকিলে না শুন কেনে। ধুয়া।
ভরসা করিলাম যারে, নির্দ্দয়ী করিলা তারে,
সদাএ উলঙ্গ রণে, না চিন আপনা, ভরসা কেমনে ॥

আগমে শুনিআছি কথা, মা বোলেন জগতের মাতা,
দেখি দীনে, দিনে ঘঠিলে, সময়ে ডাকিলে, না শুন কেনে ॥
মম সম দুরাচার, ত্রিজগতে নাহি আর,
মা যদি না তরাইলে তরিবাম কেমনে। নসিরাম ভণে ॥

কাল হইআ কেনে আইলা রণমাঝে।
রত্ন মুকুট বিকট লেগট*, জটাজুট পিষ্টে দোলে গো।
ঝাঝরি মোহনী ··· অভয়ানগরে বাজেরে,
সাজেরে ওকি দেব সায়রে গো ॥
সাপিনী নাগিনী ডাকিনী যোগিনী,
ভৈরব বেতাল সাজে গো।
যেমতে আপনি, তেমতে সকলি,
হাঁকরি ফুকরি ডাকিআ বোলেরে, চলরে ওকি রণ বিরাজে গো ॥
হস্তী ঘোড়া রথারথী, লাখে লাখে ধরি গিলে গো।
অপার অসুর ভরিআ উদর,
হেলিআ ঢলিআ পরে, বোলেরে ওকি আর নি আছে গো ॥
গোবিন্দ রামের গতি নাহি আর।
অভয়ার চরণ শরণ বিনে গো।
অপার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
জানিআ হৃদে ··· ··· হরে,
নরে তাহা কি বলিতে পারে গো ॥

রণে নাচিআছে শ্যামা পাগল বেশে।
সে যে আউদল(১) কেশে ॥ ধুয়া।
গলেতে মুণ্ডমালা, গমন চঞ্চলা,
চরণে নপুর বাজে।
কটিতে কিঙ্কিনী সাজে ॥ ১।

---

*লেগট = অর্থ কি? (১) আউদল = আলুথালু।

ডাকিনী যোগিনী, সদা চীৎকার ধ্বনি,
মাতৃগণ লৈয়া সঙ্গে। দৈত্য কাটে মনোরঙ্গে॥ ২।
দশ বাহু হৈয়া, মুখ বিস্তারিয়া,
রুধির উদরে ভরে। শিবাগণে নাদ করে॥ ৩।
বধিআ দৈত্যগণ, হৈয়া আনন্দ মন,
রক্ত খাএ মন বিরাজে। দেবগণে পদে পূজে॥ ৪।
দেবে করে পূজা, হৈলা মা দশভুজা,
সুর মুনি পদে ভজে।
রাজ্য পাইল দেবরাজে॥ ৫।
শ্রীরামলোচন, লইল শরণ,
উদ্ধারিআ ঋণ হোতে।
ত্রাণ কর্য্যা নে শ্রীপদেতে॥ ৬।

ওমা উগ্রচণ্ডি কি লাগি কৈলা এথ সমরে।
হেট আখি দেখি কম্পে চারি দিগে চাহে।
নাচন্ত ভৈরবী শ্যামা দিআ করতালি।
বাজিআছে রণে শিঙ্গা খেণে মানরে লঙ্কা (?)। ১।
গগনে ঠেকিয়াছে মুকুট রুধিরে তরঙ্গ।
যাইআ হৈয়া কৈলা রণ সদাএ উলঙ্গ॥
একি পাগল ভেশে, মা রণে যুগল কেশে। ২।
বিমতি সাগরে গঙ্গা রুধিরে বিহীন।
বুক বাহি পড়িআছে ধারা সদাএ রাত্রদিন॥
একি চোকী ধারা, মা রণে দিগম্বরা,
কোটরা ভরিআ যোগিনী যোগাএ সুরা॥ ৩।
জয়দেব দাসে কহে, ভজনেতে হীন।
মা বলিআ ডাকিএ আমারা সদাএ রাত্র দিন॥
শমন ভয় পাইয়া, আমারা ডাকি মা বলিয়া,
নেয় মা তরাইয়া॥ ৪

শ্রীআবদুল করিম।

আকাঙ্ক্ষা।

কেন না হইলে তুমি—কাননের ফুল—
ওহে প্রেমধন।
কানন কুসুম হ'লে, অনুরাগে আনি তুলে,
গাঁথি মনোমত মালা, অতি সুচিকণ,
আনন্দে দিতেম গলে, জুড়াত জীবন,
মুগ্ধ হ'ত সর্ব্বজন—শোভায় অতুল—
কেন না হইলে তুমি, কাননের ফুল, ওহে প্রাণধন।
কেন না হইলে তুমি—চাঁদের কিরণ—
ওহে প্রেমধন।
তাহ'লে আনন্দ মনে, বসি মুক্ত বাতায়নে,
জুড়াতেম হৃদিজ্বালা করিয়া সেবন,
তোমার সে মধুময় শীতল কিরণ,
সহিতে হ'ত না আর বিরহ দাহন
কেন না হইলে তুমি, চাঁদের কিরণ, ওহে প্রাণধন।
কেন না হইলে তুমি—বিমল জীবন—
ওহে প্রেমধন।
তাহা হ'লে ইচ্ছামত, করিতাম অবিরত,
তব প্রেম-সিন্ধুনীর আনন্দে ভক্ষণ,
সহিবারে তৃষা-ক্লেশ হ'ত না কখন,
থাকিতাম প্রেম-নীরে হইয়া মগন
কেন না হইলে তুমি, বিমল জীবন, ওহে প্রাণধন।
কেন না হইলে তুমি—কোমল শয়ন—
ওহে প্রাণধন।
শয়ন হইলে পরে, পরিশ্রান্ত কলেবরে,
তোমার কোমল অঙ্গে করিয়া শয়ন,
করিতাম শরীরের শ্রান্তি নিবারণ।
ক্লান্তি ভরে শ্রান্তি মম হ'তনা এখন,
কেন না হইলে তুমি কোমল শয়ন, ওহে প্রাণধন।

কেন না হইলে তুমি—অগুরু চন্দন—
ওহে প্রাণধন।
যদি হে চন্দন হ'তে, শিলাতলে বিধিমতে,
ঘসিতে ঘসিতে করি বাহির চন্দন,
করিতাম সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্বদা লেপন,
সৌরভ গৌরবে মুদে হ'ত ত্রিভুবন,
কেন না হইলে তুমি, অগুরু চন্দন, ওহে প্রেমধন

কেন না হইলে তুমি—মলয় পবন—
ওহে প্রেমধন।
তাহ'লে বসন্তকালে, বিবিধ কুসুমজালে,
ভূষিতে, ধরণী যবে, করি আগমন,
অনুক্ষণ করিতাম তোমার সেবন,
চিরতরে না হইত বিরহ-দাহন
কেন না হইলে তুমি, মলয় পবন, ওহে প্রাণধন।

কেন না হইলে তুমি—নব জলধর—
ওহে প্রাণধন।
তোমাতরে প্রিয়তম, তৃষিত চাতক সম,
থাকিতাম নিরখিয়া আকাশের পানে,
বর্ষায় পূরিত আশা প্রেম-বারি-পানে,
চিরতরে দুঃখী মম হ'তনা অন্তর,
কেন না হইলে তুমি, নব জলধর, ওহে প্রেমধন।

মৃত্যুর পর।

(৩০)

বর্ত্তমানকালে এই পুরাণগুলি প্রচলিত আছে। অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্ম, গরুড়, দেবীভাগবত, নারদীয়, পদ্ম, বহ্নি, বায়ু বা শিব, বামন, বরাহ, বিষ্ণু, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রাহ্ম ভাগবত, ভবিষ্য, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, স্কন্দ।

কথিত আছে, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করেন। স্কন্দ পুরাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তবে উৎকলখণ্ড, কাশিখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, রেবাখণ্ড প্রভৃতি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। 'বহ্নি' ও 'অগ্নি' এক মনে করিয়া পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ গণনা করা অসঙ্গত নয়। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পূর্ব্বে একরূপ ছিল, এখন নূতন হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে কতকগুলি উপপুরাণ প্রচলিত আছে। সেগুলি এই—

আদিত্য	নৃসিংহ বা নরসিংহ	মুদ্গল
উশনস	নন্দি বা নন্দা	মাহেশ্বর
কাপিল	পরাশর	মানব
কালিকা	বারুণ	শাম্ব
কল্কি	বাশিষ্ঠ	সনৎকুমার
দুর্ব্বাসস	ভার্গব	সৌর।

দেবীভাগবতে ও রেবাখণ্ডে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম পাইবেন এবং কিছু বিভিন্নতাও দেখিবেন। উইলসন সাহেব যে পুরাণের তালিকা করিয়াছেন তাহা "মেকেঞ্জি কলেকসন" ১ম বালম পঞ্চাশ পৃষ্ঠা (১৮২৮) পাইবেন। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, পুরাণ ও উপপুরাণ অতি প্রাচীন নহে, নিতান্ত আধুনিক ও তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক, ইহা দেখাইতেই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এইগুলির নাম করিয়াছেন—১ সনৎকুমার, ২ নরসিংহ বা নৃসিংহ, ৩ নারদীয় বা বৃহন্নারদীয়, ৪ শিব, ৫ দুর্ব্বাসা, ৬ কাপিল, ৭ মানব, ৮ উশনস, ৯ বারুণ, ১০ কালিকা, ১১ শাম্ব, ১২ নন্দি বা নন্দা, ১৩ সৌর, ১৪ পারাশর, ১৫ আদিত্য, ১৬ মাহেশ্বর, ১৭ ভার্গব বা ভাগবত, ১৮ বাশিষ্ঠ, ১৯ ভবিষ্য, ২০ ব্রহ্মাণ্ড, ২১ কৌর্ম্ম। এই কয়খানিরই বিশেষ করিয়া নাম করিয়াছেন।

পরে বলিয়াছেন "ইহা ভিন্ন ২২ আদি, ২৩ মুদ্গল, ২৪ কল্কি, ২৫ ভবিষ্যোত্তর ও ২৬ বৃহদ্ধর্ম্ম নামে আর কয়েকখানি উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়।" কিন্তু দেখিতেছি, শিব, ভবিষ্য ব্রহ্মাণ্ড, নারদীয় এই কয়খানির নাম পুরাণের মধ্যেও উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভাগবত ও কূর্ম্মও আছে। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য আমরা সব কথাই উল্লেখ করিলাম।

কতকগুলি পুরাণ "মহাপুরাণ" বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে। যথা; কৌর্ম্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত ও ভবিষ্য। এতদ্ভিন্ন পদ্মপুরাণে পুরাণ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু প্রধান পুরাণগুলি সাত্ত্বিক, শিব প্রধান পুরাণগুলি তামসিক, ও ব্রাহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন এইগুলি রাজস পুরাণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। "মাহাত্ম্য" নামে কতকগুলি গ্রন্থাংশ বিশেষ বিশেষ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত—ইন্দ্রাবতারক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ঐরাবতক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কদম্ববন, কমলালয়, কার্ত্তিক, কুমারক্ষেত্র, কান্তেশ্বর, কলসক্ষেত্র, কৃষ্ণ, গোকর্ণ, চিদম্বরমাহাত্ম্য।

অগ্নিপুরাণের অন্তর্গত—অর্জ্জুনপুর, কাবেরী।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—অদিপুর, অগ্নীশ্বর, অঞ্জনাদ্রি, অনন্তশয়ন, কাঠারাগিরি, তুঙ্গভদ্রামাহাত্ম্য।

"পুরাণ" শব্দটি বহু পুরাতন। বেদেও আছে। বেদ আলোচনা করিয়া আমরা এই সকল শাস্ত্রের নাম প্রাপ্ত হই;—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, কল্পসূত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, নারাশংসী, আখ্যান, ইতিহাসবেদ, পুরাণবেদ, অসুরবেদ, পিশাচবেদ, সর্পবেদ। কিন্তু অনেক শাস্ত্রের নামই প্রাপ্ত হই আর কিছু পাই না। ইতিহাসবেদ, পুরাণবেদ কি ছিল, কিছু জানি না। গোপথব্রাহ্মণে (১।১০), অসুরবেদ, পিশাচবেদ, সর্পবেদের উল্লেখ আছে কিন্তু শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত কেহ দেখেন নাই। সেইরূপ শতপথ-ব্রাহ্মণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ণ ও আশ্বলায়নসূত্রে "পুরাণবেদে"র উল্লেখ আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের নবম দিবসে অধ্বর্য্যু তাহা পাঠ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৪।৩।১৩ দেখুন "* * * পুরাণবেদ, এই সেই বেদ, এই বলিয়া "পুরাণ" কীর্ত্তন করেন।" তারপর আমরা ইতিহাসের সহিত পুরাণের

নাম প্রাপ্ত হই। শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৬।১০।৬; অথর্ব্ব সংহিতা ১৫।৬; তৈত্তিরিয় আরণ্যক ২।৯; বৃহদারণ্যক ২।৪।১০; ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭ম প্রপাঠক; দেখুন। মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায় ২৩২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে ব্রাহ্মণদিগকে বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র আখ্যান ইতিহাস পুরাণ ও খিল (শ্রীসূক্ত, শিব সঙ্কল্প ইত্যাদি শাস্ত্রের নাম) শ্রবণ করাইবে। রামায়ণে সুমন্ত্র পুরাণবিদ্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বেদে যে পুরাণ ও ইতিহাসের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ উদ্ধার সায়নাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই করিয়াছেন। সায়নাচার্য্যের মতে বেদের দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনার নাম ইতিহাস আর সৃষ্টি ক্রিয়ার বিবরণের নাম পুরাণ। শঙ্করাচার্য্যের মতে উর্ব্বশী পুরোরবার কথোপকথনাদি রূপ ব্রাহ্মণভাগের নাম ইতিহাস আর সৃষ্টিক্রিয়ার বিবরণের নাম পুরাণ। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন "পুরাণ বেদ" যেমন লুপ্ত তেমনি বেদের সাময়িক "পুরাণ" ও লুপ্ত।

বর্ত্তমানকালে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ।

স্বর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্॥

অর্থাৎ সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ ও মন্বন্তর বিবরণ এবং বিশেষ বিশেষ বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের চরিত্র বর্ণনা বিষয়গুলিই (এই ৫টি) পুরাণের প্রতিপাদ্য। ঈশ্বর কর্ত্তৃক পঞ্চ মহাভূত, (পৃথিবী, জল ইত্যাদি) ও গুণ (রূপ রসাদি) ও ইন্দ্রিয়াদির যে সৃষ্টি তাহারই নাম সর্গ। প্রতিসর্গ হইতেছে বিশেষ সৃষ্টি বা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে চরাচর সৃষ্টি। প্রতিসর্গকে বিসর্গও বলে। ভাগবত ২।১০।৪ দেখুন। আর একটি নাম পৌরুষসৃষ্টি। মহাপুরাণ দশাধিক লক্ষণযুক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩২ অধ্যায় ও ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

বিষ্ণুপুরাণে আবার "পুরাণ সংহিতা"র উল্লেখ আছে। বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি লইয়া "পুরাণ সংহিতা" রচনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং দেখিয়া যাহা লেখা যায়, তাহা "আখ্যান"; পরম্পরাগত কথা শুনিয়া যাহা লেখা যায় তাহা "উপাখ্যান"; বিশেষ প্রকার গীতের নাম "গাথা", প্রধানতঃ কিন্তু পিতৃপিতামহ বিষয়ক ও পৃথিবী বিষয়ক; আর শ্রাদ্ধ কল্পাদি নির্ণয়ের নাম "কল্পশুদ্ধি"। বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ ৬ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক

হইতে আরম্ভ)। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে, বেদব্যাস একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, বেদব্যাস ছয় খানি পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। অপর এক স্থানে আছে ব্যাস চারিখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন।" এই কথা অবলম্বন করিয়া এক দল বলেন যে বেদব্যাসের অষ্টাদশ পুরাণ রচনার কথা মিথ্যা। অক্ষয়কুমার দত্ত বলিয়াছেন "ফলত এখনকার অষ্টাদশ পুরাণের এক পুরাণও যে বেদব্যাসের রচিত নয়, তাহা পশ্চাৎ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে।" আমরা কিন্তু এসব তর্ক বুঝিতে পারি না। প্রথম কথা হইতেছে, পুরাণ আর পুরাণসংহিতা কি এক? পুরাণের লক্ষণ দেখিয়াছেন, পুরাণসংহিতারও ত লক্ষণ পাইয়াছেন, এক কি করিয়া বলিবেন? অক্ষয় বাবুই বলেন "পুরাণ সংহিতা" কিরূপ ছিল তাহা এতদিন পরে নিরূপণ করা অসাধ্য। যদি এক না হইল, তবে আর গোলযোগ কোথা? প্রথম যখন তিনি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তখন সেই কথা ঘোষিত হইয়াছে, তারপর চারিখানি রচনার পরে চারিখানির রচনার কথা ঘোষিত হয়; আবার ছয়খানির পর ছয়খানির কথা প্রচারিত হইয়াছে। যিনি ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্যাসের সমসাময়িক যে হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। "পুরাণ" যদি "পুরাণ সংহিতা" হইতে পৃথক না হয়, তাহা হইলেও কথা বুঝিবার গোল হয় না। চিরকাল প্রচলিত কথা কি এক ফুৎকারে উড়াইতে পারা যায়? আমরাও অনেক দেখিলাম। চিরকালের কথা রামায়ণ আগে মহাভারত পরে রচিত হয়, তখন উল্টাইয়া গেল, দেখিলাম মহাভারত আগে হইলেন। আবার এখন দেখিতেছি যে না তা নয়, রামায়ণই আগে—মহাভারত পরে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের চক্‌চকানিতে ঝলসিয়া গিয়া অনেকে মস্তিষ্ক হারাইয়াছিলেন, স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পান নাই। এখন স্বাধীন চিন্তার দিন আসিয়াছে, আর একে একে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের ভুল ধরা পড়িতেছে। সিরাজউদ্দৌলা এখন আর নরপিশাচ নহেন, বাল্যবিবাহ এখন আর মন্দ নহে, জাতিভেদ এখন ভাল, স্ত্রীস্বাধীনতা মন্দ। আর্য্য ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার সবই ভাল, এখন এই সব মত ধীরে ধীরে প্রকটিত হইতেছে।

পরীক্ষিতের সন্দেহ।

আমরা হিন্দু কিন্তু বাল্যাবস্থা হইতে, কোনরূপ ধর্ম্মপিপাসা সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষা না থাকায় হিন্দুধর্ম্মের রহস্য জানিতে অক্ষম হইয়া নিজ অমূল্য ধনে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আমরা স্বয়ং বুঝিতে পারি না এবং স্বদেশী অথবা বিদেশী অপর লোকে ভগবান-চরিত্রে লাম্পট্য প্রভৃতি দোষারোপ করিলে তাহার প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হইয়া অবাক্ হইয়া থাকি নচেৎ মিথ্যা বিতণ্ডার আড়ম্বর করিয়া গোঁড়ামি প্রকাশ করি। মহাত্মা শুকদেব কর্ত্তৃক রাজা পরীক্ষিতের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি ভগবান চরিত্রের অন্যান্য অংশ বর্ণন করা হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় তিন শ্রেণী লোকের সম্বন্ধ ছিল দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের চরিত্র ও কার্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে "ব্রহ্মণ! ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্তই জগদীশ্বর ভগবান অবনীতে অবতীর্ণ হয়েন। ব্রহ্মণ! তিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষক হইয়া কি প্রকারে পরদার সম্ভোগরূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? যদুপতি আপ্তকাম; তথাপি তাঁহার এরূপ নিন্দনীয় আচরণের অভিপ্রায় কি? আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন।" ১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ২। গোপীগণ, ৩। গোপীগণের স্বামিগণ এই তিন শ্রেণীর লোক রাসলীলায় লিপ্ত ছিলেন। ঐ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভগবান শুকদেব বলিয়াছেন যে "ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য। আচরণও কখন কখন সত্য।" এ কথার অর্থ রাজা পরীক্ষিৎ বুঝিলেও বুঝিতে পারেন কিন্তু আমাদিগের জড়বুদ্ধিতে আমরা বুঝিলাম না। ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শুকদেব যাহা যাহা বলিয়াছিলেন এবং রাসলীলায় গোপীগণের প্রশ্ন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তর হইতে অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে। শুকদেব কহিলেন "রাজন্! ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মাতিক্রম ও সাহস দেখা গিয়াছে। তেজস্বীদিগের তাহাতে দোষ হয় না। অগ্নি যেমন সকলই ভোজন করিয়া থাকেন, তেমনি ঈশ্বরে কোন বিষয়ে দোষস্পর্শ সম্ভবে না। যাঁহারা ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা কখনও তাদৃশ আচরণ করিবেন না; রুদ্র ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ বিষপান করিলেই মরিয়া যাইবেন। ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য আচরণও

কখন কখন সত্য। অতএব তাঁহারা যাহা বলেন,—যাঁহাদিগের বুদ্ধি আছে, তাঁহারা তাহাই করিবেন। প্রভো! এই সকল ব্যক্তির অহঙ্কার নাই, মঙ্গলানুষ্ঠান হইতে এই ধরাধামে ইহাদিগের কোন্ অর্থের সম্ভাবনা নাই; অমঙ্গল আচরণ হইতে অনর্থেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যিনি তির্য্যক্, মর্ত্ত্য ও দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীবের ঈশ্বর, যিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি,—তাঁহার কুশলাকুশল সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার চরণারবিন্দের সেবক পরিতৃপ্ত ভক্তগণ এবং জ্ঞানিগণও যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ দূর করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন, আর কখনও সংসারে বদ্ধ হয়েন না; তিনি স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন; তাঁহার বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? যিনি গোপীদিগের, গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; তিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। জীবের মঙ্গলসাধন করিবার নিমিত্ত তিনি মনুষ্যমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঐরূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন; জীব ঐসকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিবে। রাজন্! ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে নাই; কারণ, তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে করিত, তাহাদিগের স্ব স্ব পত্নী, তাহাদিগেরই পার্শ্বে অবস্থিত আছে।" গোপীগণ বনে বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করত কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তি একজন ভজনা করিলে পর, তাহাকে ভজনা করেন? কোন্ ব্যক্তি ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তিই বা উভয়ের কাহাকেও ভজনা করেন না?" শ্রীভগবান কহিলেন, হে সখীগণ! যাঁহারা স্বার্থসাধন করিতে সচেষ্ট, তাঁহারাই পরস্পর ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহার্দ্দ নাই; স্বার্থই তাহার উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু যাহারা ভজনা করে না, যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগকে ভজনা করেন, পিতামাতার ন্যায় তাঁহারা দুই প্রকার—১। দয়ালু; ২। স্নেহময়। উক্ত ভজনা দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিরা নিষ্কৃষ্টধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিরা সৌহৃদ্য লাভ করিয়া থাকে। এস্থলে অনিন্দিত ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ দুইই আছে। যাঁহারা আত্মবান, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ বা গুরুদ্রোহী, তাঁহারা—যাহারা ভজনা না করে, তাহাদের কথা দূরে থাকুক, যাহারা ভজনা করে, তাহাদিগকেও ভজনা করেন না। হে সখীগণ! আমি কিন্তু, যাঁহারা আমাকে ভজনা

করেন, তাঁহাদিগকেও ভজনা করি না। "কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবেন। যেমন নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া, যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়। হে অবলা সকল! এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া লোক ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়াছ; তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে; এই জন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম; অথচ তোমরা না দেখিতে পাও, এইরূপে তোমাদিগকেই ভজনা করিয়াছিলাম। অতএব, হে প্রিয়া সকল! প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা তোমাদিগের উচিত নহে। তোমরা দৃঢ়তর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে। এই মিলনের কিছুতেই নিন্দা করা যাইতে পারে না। আমি দেবতার পরমায়ু পাইলেও তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। অতএব তোমাদিগের সুশীলতার দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম; প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না।"

শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত হিন্দুর অতি আদরের ধন। যে যে স্থলে ভগবানের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য বিশেষরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সেই ঘটনাবলি ভগবান ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঐ দুই গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হওয়া হিন্দুমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু হিন্দুর নিকট তাহা তাদৃশ আদর না পাওয়ায় অপর লোকেরও তাহার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা নাই। মহাভারত সাংসারিক লোকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ইহার মর্ম্ম না জানায় অনেক সময়ে আমাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়া থাকে। মহাভারতে কৃষ্ণচরিত্রের একাংশমাত্র বর্ণিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সমুদয় কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের পর দেবর্ষি ভগবান নারদ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া, ব্যাসদেব যতিধর্ম্মাবলম্বি উদাসীন্ সাধুগণের উপকারার্থ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন।

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা পরীক্ষিত কি বুঝিয়াছিলেন? অথবা গোপীগণের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে গোপীগণ কি বুঝিয়াছিলেন?—এ সকল কথার মিমাংসা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহা হইতে আমরা কি বুঝিলাম? ইহাই বিবেচনার বিষয়। ভগবানের নাম

করিলে মানুষ পাপমুক্ত হইয়া থাকে সুতরাং ভগবানে কোনও দোষস্পর্শ সম্ভবে না। গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও মুনিগণ যাহা করিতে পারেন নাই, মা বিষ্ণুভক্তিপ্রদা কাত্যায়নীর প্রসাদে গোপিনীগণ,—মুনিগণের অসাধ্য হইলেও, তাহাই করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে দোষস্পর্শ সম্ভাবনা দূরে থাকুক, প্রশংসার বিষয় বলিয়াই মনে হয়। গোপীগণের স্বামিগণ রাসের সময়েও আপনাপন পত্নীগণকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া ভগবানের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই এবং তাহাদিগের পত্নীগণ অপরাধিনী না হওয়ায় তাহাদের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। ইহাতেও কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং রাসলীলা নির্দ্দোষ এবং গোপীগণ প্রশংসাভাজন। ভগবান না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মত মানুষ হইলে উক্ত তিন শ্রেণী লোকের সম্বন্ধেই রাসলীলা দোষের কারণ হইত, ও সেই জন্য ভগবান শুকদেব মানুষকে সাবধান ও নিষেধ করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিত এইরূপ বুঝিয়াছিলেন কি না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই মোটামুটি মর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি কি না তাহাই পাঠক মহাশয়ের বিবেচনার কথা।

গোপীগণের প্রশ্ন, তাহার উদ্দেশ্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। বস্ত্রহরণের পূর্ব্ব হইতেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন ও তাঁহার ভগবানত্বে বিশ্বাস করিতেন। এক্ষণে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে "আত্মারাম ও আপ্তকাম" বলিলেন। নিজ ভগবানত্বের পরিচয় দেওয়াই কি তাঁহার উদ্দেশ্য? জানি না গোপীগণ কি বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা কি বুঝি ইহাই বিবেচনার বিষয়? সটীক মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে এই অংশের অর্থ বিশেষরূপে গ্রহণ করা যায় কি না তাহা বলিতে পারি না কিন্তু বঙ্গানুবাদ দেখিয়া অর্থবোধ হওয়া বড়ই কঠিন। যদিও বিশদরূপে "অর্থবোধ" হয় না তত্রাচ তাহার যে আভাসমাত্র অনুমানে পাওয়া যায়, তাহাতেই ইহাকে যারপর নাই হিন্দুর আদরের বিষয় বলিয়া মনে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সময়ান্তরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত বাম করে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা মানুষের অসাধ্য তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। সেইরূপ আরও

অনেকানেক সময়ে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহাতে মানুষের বল বা বুদ্ধির কুলান হয় না। ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন "ঈশ্বরদিগের বাক্য সত্য এবং আচরণও কখন কখন সত্য" সুতরাং যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন যে রাসলীলায় তাঁহার সহিত তাহাদিগের "এই মিলনের কিছুতেই নিন্দা করা যাইতে পারে না"। "আচরণও কখন কখন সত্য" ইহার মর্ম্ম এই পর্য্যন্ত অনুমান হইতে পারে যে ভগবান-চরিত্র সকল সময়ে মনুষ্যবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা যায় না "A God understood is no God". তবে পাঠকমহোদয়গণের নিকট আমার এই পর্য্যন্ত অনুরোধ যে ঐ ঐ অংশ বার বার পড়িয়া যিনি যেরূপ অর্থ করিতে সমর্থ হয়েন নিজ নিজ পক্ষে সেইরূপ অর্থ করিয়া লইবেন। তাহারা ঐ ঐ অংশ বার বার পড়িলেই আমি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিব।

গ্রন্থ সমালোচনা।

নেড়া হরিদাস। মডেলভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-চরিতামৃত প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা, ৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে অরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

'নেড়া হরিদাস' পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, বাঁধাই ভাল। নেড়া হরিদাস নামে একজন ভণ্ড বৈষ্ণবসমাজে মর্কট-বৈরাগ্য দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিল। লেখকে ভুলিয়া গিয়াছিল যে পূর্ব্বে সে তহবিল ভাঙ্গিয়া জেল খাটিয়াছিল, অথবা মনে থাকিলেও সে কথা সাহস করিয়া কেহ বলিতে পারিত না, কেন না নেড়া হরিদাসের অর্থবল, লোকবল, বুদ্ধিবল সকলই ছিল আর সে কোন অপকর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হইত না। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই হরিদাসের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সস্ত্রীক কাশী গমন করিয়াছিল। হরিদাস কাশীতে টাকা পাঠান বন্ধ করিলে ব্রাহ্মণ দেশে

টাকা আদায় করিতে আসিয়া হরিদাসের নিকট লাঞ্ছিত হইল ও হরিদাসের জেরার কৌশলে নিজেই জুয়াচোর হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়াছিল, শ্রীমতী বৃন্দা। বৃন্দার অনেক টাকা জমীদারীর আয় কিন্তু দেওয়ানজীর সহিত প্রসক্তি বলিয়া তাহার কলাকাপবাদ ছিল। এই বৃন্দা, দেওয়ানজী বৃন্দাবনে গিয়া মরিয়াগিয়াছেন, এখন আমি তোমাকেই মনপ্রাণ জীবনযৌবন, বিষয়বৈভব সব অর্পণ করিব আর বিষয় দানের জন্য পাকা লেখাপড়া করিয়া দিব, দিয়া আমি বৃন্দাবনবাসিনী হইব—এই কথা নেড়াকে বুঝাইয়াদিল। কিন্তু এটি বৃন্দার ফাঁদ। নেড়া ক্রমে ক্রমে এই ফাঁদে পড়িল। তাহার ফল এই হইল যে ব্রাহ্মণের দুই হাজার টাকা আদায় হইল ও ব্রাহ্মণ টাকা পুন প্রাপ্ত হইলেন। বৃন্দা শেষদশা ধর্ম্মালোচনায় কাটাইলেন। হরিদাস জেলপিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও পরে দেওয়ানজীর অন্নদাস হইয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া গেল।

নেড়া হরিদাসের এই গল্প। নেড়া হরিদাসের গল্পের পরিচয় দিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ফ্যাসানের বশে তাহা দিতে হইল। এরূপ পরিচয় দানে গ্রন্থ-হত্যা সংঘটন হয়, আর কিছু হোক না হোক। যাহাহোক পাঠক দেখিলেন, গল্পটি নূতন নহে। তবে ছাটিয়া কাটিয়া ডালপালা দিয়া নূতন করা হইয়াছে। তাহাতে গ্রন্থের যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে তাহা মনে করি না।

মানুষ নিজে রোগ চিনিলে রোগের ঔষধ খায়। যখন নিজে চিনিতে না পারে তখন কবিরাজ ডাকিতে হয়। তিনি রোগ চিনিয়া ঔষধ দেন। বঙ্গ সমাজের যে রোগ তাহা ধরা পড়ে নাই। দুই একজন কবিরাজ রোগ ধরিয়াছেন। একজন কবিরাজ গয়ারাম হলাহলানন্দ স্বামীকে চিনাইয়া দিয়াছেন, তিনি অবতার লেখক; আর একজন বৈদ্য এই "নেড়া হরিদাস" লেখক। ইহারা রোগই ধরিয়াছেন। ঔষধের ব্যবস্থা হইবে কি না, ঔষধ-সেবন হইবে কি না, ব্যাধি প্রশমিত হইবে কি না, আধি উৎপাটিত হইবে কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে আজিকার দিনে নাকি রোগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তার মহাশয় রোগের নাম বলেন, Bengal is that division of India, তাই ডাক্তারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আর ভক্ত সাহেবী কবিরাজ মহাশয় নাকি জ্বরে আমাশয়ের ঔষধ দেন, তাই

সেরূপ কবিরাজেও আমাদের রুচি নাই। এই দুর্দ্দিনে প্রকৃত সমাজরোগ-নির্ণয়কারী কবিরাজ পাইয়াছি বলিয়া আমরা এই গ্রন্থ পাঠে পূর্ণ আনন্দ লাভ করিয়াছি। জগতে সত্যের আদর চিরদিন আছে ও থাকিবে। এই গ্রন্থে অনেক সত্য কথা আছে, ভরসা করি সত্যদর্শনে লোকের জ্ঞান ও আনন্দের উদ্রেক হইবে।

কলিকাতার মাটীর গুণে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রোটন হয় কিন্তু শ্রীহট্টের কমলা হয় না। আমাদের দোষ এই যে আমরা গুরুর চরিত্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই—তাহাতে সব মাটী হয়, দেশ ছারেখারে যায়। জলমগ্নজীবকে যিনি উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আর জড়াইয়া ধরিয়া ডুবাইয়া দিও না। এ সাধারণ কথার কেন উল্লেখ করিতেছি, অভিজ্ঞ ইঙ্গিত মাত্রেই বুঝিবেন। হাফেজ বলিয়াছেন, উপদেশ যদি দেওয়ালেও অঙ্কিত থাকে, গ্রহণ করিও, মঙ্গল হইবে।

নেড়া হরিদাসের অপর পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না। যদি তিল তিল সৌন্দর্য্য সঙ্কলন করিয়া তিলোত্তমা গড়িতে হয়, তাহা পাঠক পাঠিকাই করিবেন। তবে আমাদের চক্ষে নেড়া হরিদাসের দোষ এই যে ইহার কষায়তে দয়া আছে। এ দয়া—এ কৈফিয়ৎ অপাত্রে বিন্যস্ত। আরও যিনি নেড়া হরিদাসে কেবলই পাপের চিত্র দেখিবেন, তিনি ভ্রান্ত। ইহা আর্ট-ষ্টুডিওর ছবি, যাহা শৃঙ্গসহ বৃষমুণ্ড দেখিতেছেন, তাহাই শুণ্ডসহ হস্তীমুণ্ড, হস্তীমূর্খের মত বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বাঙ্গালায় যদি এ গ্রন্থের আদর না হয়, তাহা হইলে নিতান্তই বুঝিব, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনের এখনও বিলম্ব আছে।

লেখাবলী। শ্রীরাধানাথ রায় বিরচিত, হেয়ার প্রেস, ৪৬নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "তেইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই পত্রিকা-গুলি লিখিয়া আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। তিনি পত্রিকাগুলি পাঠ করিয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এডুকেশন গেজেটে পাঁচটী পত্রিকা মুদ্রিত করাইয়া আর কতকগুলি লিখিতে এবং সমস্তগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমায়

উপদেশ দিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার সেই উপদেশ অংশত কার্য্যে পরিণত হইল।"

গ্রন্থে ছয়টি পত্রিকা আছে—(১) রামচন্দ্রের প্রতি জানকী, (২) অর্জ্জুনের প্রতি সুভদ্রা, (৩) কচের প্রতি দেবযানী, (৪) পুণ্ডরীকের প্রতি মহাশ্বেতা, (৫) মদনের প্রতি মায়াবতী, (৬) কুমারনাথের প্রতি কমলকামিনী।

বঙ্গদেশ আজি সৌখীন কবিতা-প্লাবিত। মৃদু বংশীধ্বনির দিনে গুরু কর্ণেট ফুৎকার লোকের ভাল লাগিবে কি না বলা যায় না। আমাদের কিন্তু ভাল লাগিয়াছে। স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব আছে এবং স্থলবিশেষে অশ্রুসংবরণ কঠিন হইয়া উঠে। অবকাশরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের আশা করিলে কবিসঙ্গ বিফল হইবে না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচন।

বামাবোধিনী, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। "কালী ও কলম" উল্লেখযোগ্য। ৩২ প্রকার কালীর বিবরণ দিয়াছেন। "জয়দেবের লেখনী হইতে সর্ব্বপ্রথম যে গীতগোবিন্দ প্রসূত হয় তাহার কালী অদ্ভুত! তুলসীপত্র, কদম্বপত্র, পদ্মপত্র, বিল্বপত্র এবং জবাকুসুমের রস একত্র মিশাইয়া গন্ধক সিদ্ধ জলে পাক করতঃ রৌদ্রে রাখিতে হইত, তদনন্তর দুই এক বিন্দু কদম্ব-নির্য্যাস মিশ্রিত করিলে ঘোর লালবর্ণের এবং অতি সুগন্ধি মসী প্রস্তুত হইত"। ইথিওপিয়া দেশের এক রমণী প্রথমে কালী কলমের সৃষ্টি করেন, লেখক বলিতেছেন। মিশরের সভ্যতা ভারত হইতে। আমাদের বিশ্বাস ভারতেই প্রথমে কালী কলমের সৃষ্টি হয়। "গর্ভস্থ মেয়েকে কি ছেলে করা যায়?" লেখক বলেন, যায়। বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদের মত তাই। আমরা বিশ্বাস করি না।

ভাস্কর, আশ্বিন। ভাস্করের সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। "কৃষ্ণাবতার" তত্ত্ববোধিনী হইতে পুনর্মুদ্রিত, লেখক অবতার মানেন না। রামায়ণ মহাভারত প্রক্ষিপ্ত বলেন, কৃষ্ণের "জীবনী" খুঁজেন ইত্যাদি। শিল্প শিক্ষার ভূমিকা মাত্র। ঔষধ খাবার সময় যেন উট না মনে পড়ে, সেই গল্পটা আছে। আর কবিতার গুচ্ছ সে ত আছেই!

মহাজন বন্ধু, অতিরিক্ত সংখ্যা ও আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ। অতিরিক্ত সংখ্যায় তাম্বুলিকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়, সহজ কথায় তামলি জাতির বিবরণ। ঐ জাতি সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। বল্লাল সেন ইহাদেরও কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য ইহাও জাতিভেদ আন্দোলনের ফল। আমরা মহাজন বন্ধু পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। শান্তিপুরে কাপড়, রঙ্গপুরে চিনির কল, গোবরডাঙ্গার চিনির কল, নোট, টাকশাল, তাতা, শর্করা বিজ্ঞান, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, পত্রখানি কিরূপ ভাবে চালিত হইতেছে। স্থানাভাবে প্রবন্ধ তুলিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হইতেছে, মহাজন বন্ধু দেশের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিবেন।

স্বাস্থ্য, ভাদ্র। বেশ চলিতেছে, 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞান' উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু-পত্রিকা, ভাদ্র, আশ্বিন। এবারকার সূচী—শ্রীসূর্য্য-স্তোত্রম্, বৈদান্তিক-মতের সমালোচনা, শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক, ভ-গোল পরিচয়, আমাদের ধর্ম্মের মূল কি?, আহার, পুনর্জন্মতত্ত্ব, শ্রীশঙ্কর-স্তোত্রং। ধর্ম্মের মূল বলেন, শ্রুতিস্মৃতি। আহার প্রবন্ধ শেষ হইলে একটি অভাব মোচন হইবে।

আরতি, শ্রাবণ। বেশ উজ্জ্বল। জীবাণুবাদ বেশ। অপর প্রবন্ধগুলিও মন্দ নহে। সুখের বিষয় এবারকার আরতিতে পদ্য নাই, তাই বলিয়া কবিতা নাই এমন নহে। "সতীর স্পর্শে" শ্রীনাথ বাবু শ্রীবৎস চিন্তার কথা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তৃক সাধুর তরণী স্পর্শের কথা, ভাবের ঘোরে, পুরাতন কথা, নূতন করিয়া বলিয়াছেন। ইহাই গদ্যে কবিতা।

উৎসাহ, ৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ হইতে শ্রাবণ দুই সংখ্যায় সাহিত্য ইতিহাস দুই পদে ভর দিয়া উৎসাহ পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন কিন্তু সরলতা যষ্টির মত নহে, একটু কুব্জ। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন। পরের কাম খাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। সে যাহা হৌক 'বিলচলন' ও 'পক্ষীর দেশ ভ্রমণ' ইহাতে উৎসাহ মেটে কি? "খড়ের আগুণ" ত অনেক দেখিলাম, একটু শালকাঠের আগুণ দেখিতে পাইব না কি?

আলোচনা, ১৩০৮ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ছয় মাসের পাইয়াছি। আলোচনা দশখানা কাগজের একখানা। সংবাদ আছে বিবিধ প্রসঙ্গ

আছে। গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, রামকৃষ্ণ কথামৃত, রহস্য, ক্রমশ প্রবন্ধ সবই আছে। উচ্চ আশা নাই কিন্তু উৎসাহ আছে। অধিক কি, সম্পাদক কি সহকারী সম্পাদক কি ম্যানেজার জানি না, মিনর্ভা থিয়েটর দেখিতে গিয়াছিলেন আর কিশোরীলাল জৈনী তাম্বুলবিহার এক কৌটা দিয়াছেন, তাহাও শুনিলাম। পদ্যের উপন্যাসের ছড়াছড়ি কিন্তু সূচী নাই। যশোহর চেঙ্গটিয়া আশ্রমের বক্তৃতা হইতে রুষীয় নভেল পর্য্যন্ত সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। আলোচনায় আবার বলি, বারনার্ড পেলিসির উৎসাহ আছে।

সাহিত্য-সংহিতা, "ভারতে দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণোপায়" "প্রাচীন ভারতে লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি" উল্লেখযোগ্য। "জাতীয় সাহিত্য" শেষ না হইলে কিছু বলা উচিত নয়, লেখক বলিতেছেন। তাহাই হোক। "সাংখ্য-দর্শন" সেইরূপই ঘনঘটাচ্ছন্ন। নমুনা—"এই স্মৃতি দ্বারা যে, শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা নহে। তবে কি না, পুরুষের যে বন্ধ, মুক্তি, নিরোধাদি প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই; তাহাই কথিত হইয়াছে, এবং নিমিত্ত কারণের প্রাধান্য বিবক্ষাপূর্ব্বক চিদাকাশে প্রপঞ্চ বিলাপন দ্বারা এক তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।" লেখকের বাহাদুরী আছে। এরূপ লেখাকে সম্পাদক-বর্জ্জন কহে। ইহা, কাঁঠালের আমসত্ত্বের জ্যেষ্ঠখুল্লতাত। আদালতের ভাষায় "বনাম", সঙ্গীতের ভাষায় ইহা কেবল অস্থায়ী।

উদ্বোধন, আশ্বিন ও কার্ত্তিক চারিখানি। উদ্বোধক বাহ্য চাকচিক্য বেশ করিয়াছেন, তাই বুঝি বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারও করিতেছেন। তাই আমরা "কৃষিব্যাঙ্ক" ও "বৈজ্ঞানিক কথা"র সংস্থান বুঝিতে পারিলাম। যাহাহৌক, উদ্বোধনে নূতন ভাষার সৃষ্টি, ভাবের সৃষ্টি, প্রণালীর সৃষ্টি ও পত্রাঙ্কের গোলযোগ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে। উদ্বোধনের পরিচালকগণ বেলুড়ের মঠে যখন বাউনী বাঁধিবেন, তখন যেন এগুলিকে না ভুলেন। একটু নমুনা দেখিবেন? যথাতথা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারি, কিন্তু উপায় নাই। উদ্বোধন এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—

উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন।—এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উদ্বোধনের কোনও প্রবন্ধ বা তদংশ, উদ্বোধনের স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে কোনও সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বা অন্য কেহ যদি উদ্ধৃত,

অনুবাদিত বা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। ইতি

উদ্বোধন-স্বত্বাধিকারী।

বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। সূচী—মুক্তমালা, তরলবায়ু, দাবার জন্মকথা, আরাধ্যা, সারসত্যের আলোচনা, চোখের বালি, গ্রন্থ সমালোচনা, বাঙ্গালার ইতিহাস, সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত, পল্লীপার্ব্বণ, বশীকরণ (সংক্ষিপ্ত নাট্য)।

'মুক্তামালা' একটি ছোট গল্প, বিলাসপুরের রাজা প্রতাপ সিংহের মহিষী চন্দ্রাবতী এক ছড়া মুক্তার মালার জন্য রাগ করেন ও মান করেন। তিনি আকবর বাদসাহের মহিষী যোধাবাইয়ের মালার মত একছড়া মালা চাহিয়াছিলেন, শেষে যোধাবাই নিজের মালাই রাণীকে দিয়াছিলেন। 'তরল-বায়ু' অধ্যাপক ডিওয়ার বায়ু তরল করিয়াছেন, আর মার্কিন শিল্পী ট্রিপলার বায়ু তরল করিবার একটি যন্ত্র গঠন করিয়াছেন। 'দাবার জন্মকথা' তিব্বতে যে লামার অধীন দাবা আছে, তাহা নহে, শতরঞ্জ খেলার কথা। রাণী নন্দোদরী এই খেলার সৃষ্টি করেন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে এই খেলা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুর নিকট পারসিকেরা এই খেলা শিখিয়াছিল। আমরা একটি সংবাদ জানি, সে দিন বিলাতে একজন লোক একেবারে ১৬০ জন লোকের সহিত দাবা খেলিয়াছেন। ১৬০ জন লোক টেবিলে ছক পাতিয়া বসিয়া আছেন, আর তিনি একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে প্রত্যেক ছকটিতে চাল দিয়া যাইতেছেন। 'আরাধ্যা' কবিতা। কবি বলিতেছেন—

অভাব সহস্র ল'য়ে, জীবন যে যায় ব'য়ে,
দুঃখ নাহি গণি!
কাটে দিন অর্দ্ধাশনে, স্পর্দ্ধা দেবি, রাখি মনে,
—রেখেছ এমনি!

'সারসত্যের আলোচনা' জীবাত্মার, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার কথা। 'চোখের বালি' উপন্যাস চলিতেছে। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (নবাবী আমল) একখানি ইতিহাসের সমালোচনা। গ্রন্থকার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রাণ খুলিয়া সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত' ও 'পল্লীপার্ব্বণ' নামেই বুঝা

যাইতেছে। কিন্তু 'বশীকরণ' না পড়িলে বুঝিবেন না। লেখকের মতি গতি কোন্ পথে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, পণ্ডিত ব্যক্তিও অনুশীলন ত্যাগ করিলে একদিন মূর্খের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

বান্ধব, ১৩০৮ ফাল্গুন, ৬১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ টাকা।

লোকারণ্যে যে বান্ধবকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, পরে সাহিত্যারণ্যে যাহাকে আবার হারাইয়াছিলাম, তাহাকে আবার পুনঃপ্রচারে পুনর্দর্শন পাইলাম। হৃদয়ভাব স্তম্ভিত এখন বাক্য স্ফূর্ত্তি সম্ভব নহে। তাই বান্ধব নিজে কি বলেন শ্রবণ করুন।

"তবে বান্ধবের পুনঃ প্রচারের জন্য তেমন একটা প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন নিয়তি,—প্রয়োজন জীবনের পৃথগ্‌ভূত নির্দ্দেশ। জীবনের প্রকৃত গতি ও পরিণতি বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও, কিবা বনভূমির বট, অশ্বত্থ, বকুল এবং কুন্দ কুসুম্ভ করবীর প্রভৃতি বড় ছোট বৃক্ষরাজি, কিবা মহানগরীর মহারাজাধিরাজ এবং মুটে মজুর প্রভৃতি বড় ছোট মনুষ্যনিচয়, সকলেরই জীবনীশক্তির পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন ও পৃথগ্‌ভূত উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বান্ধবের যদি সেইরূপ একটি স্বনির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে বান্ধব এতকালের পর, সম্পাদকের এই বৃদ্ধকালে, আবার এই ভাবে, পাঠকের নিকট উপস্থিত হইতে সাহসী হইত না। সেই বিশেষ প্রয়োজন অথবা সেই বিশেষ উদ্দেশ্য কি, তাহা বিবরিয়া বুঝাইবার জন্য পত্র পাওয়া বৃথা। যাঁহারা, নমহৃদয়তার স্বাভাবিক আকর্ষণে অথবা প্রীতিস্নেহের অনুশাসনে, বান্ধবকে তাঁহাদিগের অবসর মুহূর্ত্তের অন্যতম অংশী হইতে অধিকার দিবেন, তাঁহারা আপনা হইতেই তাহা বুঝিতে পাইবেন।"

এবারকার "বিষয়" এইগুলি—অবতরণিকা, কিশোর গৌরাঙ্গ, বিজ্ঞান গায়ত্রী (বৈদ্য), ছায়াদর্শন, শ্রীহর্ষ। আমরা দুই এক সংখ্যা না দেখিয়া কিছু বলি না, তাহা সকলেই জানেন। তবে বান্ধবের আবির্ভাবের কথাটা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।